২৪ বর্ষ

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,

সহকারি-সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইং—২৮শে জুন ১৯১৭।

বাং—১৪ই আষাঢ় ১৩২৪।

শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	বঙ্গবাসিনী	৯৭	৭।	শিক্ষাষ্টকং	১২৩
২।	মিলনে আবাহন	৯৯	৮।	অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ	১২৮
৩।	সদৃশ চিকিৎসা	১০৬	৯।	কামরূপ ভ্রমণ	১৩৬
৪।	বার্দ্ধবিলাস	১১০	১০।	আলোচনা	১৪২
৫।	বিবাহ	১১৪	১১।	সংবাদ ও মন্তব্য	১৪৪
৬।	শাপে বর	১২২			

বর্ত্তমান-সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, ডাঃ নীলাম্বর দত্ত, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, শ্রীমহেশচন্দ্র কবিভূষণ, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা, সহকারি সম্পাদক, সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৪ বর্ষ, ২৪শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩২৪ সাল। ১৮৩৯ শকাব্দ।

বঙ্গবাহিনী।

১। ধাইছে যাহারা অভয়-চিত্তে বঙ্গবাহিনী করিতে সৃষ্টি,
মস্তকে তাঁ'দের স্বর্গ হইতে করিছে দেবতা পুষ্প-বৃষ্টি ;
করিল তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
ত্যজিল পুণ্য-সংসার-ছায়া।
ধাইছে তাহারা সমররঙ্গে
করিয়া সন্ধি মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা, বিপদ্ খণ্ডি,
আপন পুত্রে চামুণ্ডা চণ্ডী।

২। বীরের ধর্ম্মে লইয়া দীক্ষা করিল নূতন পুরণ গাথা,—
সকল কণ্ঠে পূর্ব্বে ধ্বনিত "বীর-প্রসবিনী ভারতমাতা" ;
গাইছে আবার মনের হর্ষ
বীরবরণীয় ভারতবর্ষ।

ধাইছে তাহারা সমররঙ্গে
করিয়া সন্ধি মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা, বিপদ্ খণ্ডি,
আপন পুত্রে চামুণ্ডা চণ্ডী।

৩। বিস্মিত হৃদয়ে বৃটনবাসী দেখিবে যখন আপন নেত্রে,
বঙ্গবীরের বুদ্ধি-শৌর্য্য করিছে কম্পিত সমর-ক্ষেত্রে,
রাখিতে তখন মানীর মান
"উচ্চ অয়ন" করিবে দান।
ধাইছে তাহারা সমররঙ্গে
করিয়া সন্ধি মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা বিপদ্ খণ্ডি,
আপন পুত্রে চামুণ্ডা চণ্ডী।

৪। আবালবৃদ্ধ বনিতা আদি যতেক মুগ্ধ স্বদেশবাসী,
অন্তর-অন্তরে করুণ কণ্ঠে যাচিছে নিত্য মঙ্গলরাশি ;
জিনিয়া সমরে অরাতিপুঞ্জে,
আসিবে আবার শান্তি কুঞ্জে।
ধাইছে তাহারা সমররঙ্গে
করিয়া সন্ধি মৃত্যু সঙ্গে ;
করিবে রক্ষা বিপদ্ খণ্ডি
আপন পুত্রে চামুণ্ডা চণ্ডী।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।



মিলনে আবাহন।

একবিন্দু বৃষ্টির জল অর্দ্ধপথে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শুকাইয়া যায়, একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ বাতাসের ভর সহিতে না সহিতে ছিঁড়িয়া পড়ে, কিন্তু আবার সেই জলবিন্দু ধারাকারে ধরাতল ভাসাইয়া দেয়, স্থাবর-জঙ্গম সকল বস্তুই রক্ষা করে, সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা আনিয়া দেয়—আর আবার সেই ক্ষুদ্র তৃণসমষ্টি রজ্জুরূপে মদমত্ত হস্তীকে বাঁধিয়া রাখে, খরস্রোতের উপর সেতুবন্ধন রচনা করে, প্রবল ঝটিকার মুখে বড় বড় পোতগুলিকে স্থির করিয়া রাখে। আমরা প্রত্যেকে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র—আমরাই মনে করিলে এত বড় হইতে পারি, এই ক্ষুদ্র ব্যষ্টিকে এমনই সমষ্টিরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি, যাহা বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম। আর ইহারই শক্তি পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিতে পারে, পাষাণ ফাটিয়া উৎস ছুটাইতে পারে,—অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমিতলকে শস্যশালী সমতল করিয়া দিতে পারে। এই যে উপরে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা, ওই যে দূরে অতলস্পর্শ মহাসাগর, এই যে সম্মুখে স্নিগ্ধছায়া বিকটভীষণা ভূমি—সবই সমষ্টি। এ বিশ্ব পরমাণুর† সমষ্টি মাত্র। সমষ্টি ব্যতীত বিশ্বে স্থায়ী অস্তিত্ব কাহারও নাই—থাকিলেও তাহার তত শক্তি নাই। কোন জাতি, কোন সম্প্রদায় বা কোন সমাজ, কখনও ব্যষ্টিকে লইয়া গঠিত হয় নাই, হইতেও পারেও না।

আমরা সেই শক্তির বল, সেই শক্তির মাহাত্ম্য ও সেই শক্তির কার্য্যকারিতা দেখাইব বলিয়া সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি। অবান্তর মতভেদ থাকিলেও, ব্যষ্টিগত বাদ বিসম্বাদ থাকিলেও আমরা আজ সকলে এক সার্ব্বভৌম মহান্ লক্ষ্যে পৌঁছিবার ব্রত লইয়াছি। এ সমষ্টি দেহের, প্রাণের, ভাবের, কল্পনার, বলের ও কার্য্যের সমষ্টি। ইহাতে জাতিভেদ নাই,

---

* কলিকাতা "থিয়সফিহলে" "দেবালয়ের" অধিবেশনে সুযোগ্য লেখক মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হয়।

হিঃ পঃ সঃ।

† বিশ্ব বস্তুতঃ কিন্তু পরমাণু-সমষ্টি নহে। পরমাণু অদৃশ্য, তাহার সমষ্টিও অদৃশ্য হওয়া উচিত। পরমাণুবাদীরা দর্শনযোগ্য ত্রসরেণু হইতে বিশ্ব বিরচনা স্বীকার করিয়া থাকেন।

হিঃ পঃ সঃ।

আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতির সাঙ্কর্য্যও নাই। সকল জাতির—সকল বর্ণের, সকল সম্প্রদায়ের এ মিলনভূমি। ব্যক্তিগত প্রাধান্য বা ব্যষ্টিগত সঙ্কীর্ণতার এ স্থান নহে।

এই সমষ্টির, এই ঐক্যের, এই সমবায়ের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিবার জন্য আমাদের এ প্রবল আকাঙ্খা, প্রাণপণ যত্ন। তাই আমরা বড় উৎসাহে আজি অগ্রে লোকমতের মালমসলা-সংগ্রহ-ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছি। ভিত্তি-স্থাপন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিপুণ ইঞ্জিনিয়ার, বুদ্ধিমান্ রাজমিস্ত্রী, শক্তিমান্ শ্রমজীবী চাই। আমরা না হয় যোগাড়ের কার্য্য করিব। আমরা সকলকে আহ্বান করিতেছি, সকলেই আসুন। ধনী দরিদ্র, প্রবল দুর্ব্বল, ব্রাহ্মণ শূদ্র—সকলেই এই প্রাসাদ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করুন। হিংস্র কৌটিল্য, জঘন্য স্বার্থপরতা, বিষাক্ত কাপট্য দূরে রাখিয়া ঔদার্য্য, সারল্য, সমদর্শিতা ও ভালবাসা লইয়া সকলে মিলিত হউন।

এ প্রাসাদ বিলাসের নহে, পূজার। এ প্রাসাদ দেবতারই মন্দির। অধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়ী মাতা এথায় অলক্ষ্যে বিরাজিত। আসুন মায়ের পূজা করি। দেবতার পূজা ও সেবা করিতে হইলে ব্যক্তিগত রাগ, দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, পক্ষপাত ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। দেবতার পূজা ও সেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে জীব-সেবা লোকারাধনা ও জাতীয়হিতের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের কার্য্য অতি মহৎ। আমরা দেশের মধ্যে একটি আদর্শ সজীব প্রাণ ও নবীন ভাব জাগাইতে চাই—অধঃপতিত সমাজকে অভ্যুদয়ের শিখরে উঠাইতে চাই। কুরুচি, ক্ষুদ্রজ্ঞান, আত্মম্ভরিতা ও যথেচ্ছাচারিতা লইয়া দেবতার পূজা দূরে থা'ক, মন্দিরে প্রবেশও চলিবে না; জাতির সেবা জাতীর উন্নতি করা হইবে না। এ আমাদের সেবা, এ আমাদের পূজা, এ আমাদের মহাকর্ত্তব্য-পালন। নিজের নিজের ব্যক্তিত্বকে ছোট করিয়া না দেখিলে কোন মহৎকার্য্যই সিদ্ধ হয় না, কোন অনুষ্ঠানই নিষ্কাম ও কল্যাণ-কর হইতে পারে না।

সমবেত আমাদের মধ্যে বর্ণের বৈষম্যের মত মনোভাবের পার্থক্য থাকা যেমন প্রাকৃতিক, তোমার মত, আমার মত ও সকলকার মতের বৈচিত্র্য থাকাও তদ্রূপ স্বাভাবিক। পক্ষ, সপক্ষ ও বিপক্ষ, উদাসীন, অনুকূল ও প্রতিকূল, নিশ্চেষ্ট, উদার ও বিদ্বিষ্ট—সকলেই আসুন। সকলকার তর্ক-বিতর্কের সংঘর্ষে, সকলকার ভাব-বৈচিত্রের সমবায়ে গঠিত না হইলে কোন মহতী সভা, ব্যাপক

সমাজ, প্রবল উদ্যম সফল হইতে পারে না। সমষ্টি গড়িবার সাধনা কি ব্যর্থ হইবে? আকাশের গায়ে মুহূর্ত্ত-কালব্যাপী ক্ষীণ ছটা দেখাইয়া এ বিজলী কি মিলাইয়াই যাইবে?

আমাদের এই সমবেত মিলনী-সভা যদি ঠিক্ ন্যায়পথে চালিত হয়, তবে ইহা হইতে বিংশশতাব্দীর নূতন রকমের এমন একটী সমাজ-শক্তি অবশ্যই গড়িয়া উঠিবে, যে সমাজ-শক্তি, ধনী দরিদ্রের, প্রবল দুর্ব্বলের, বড় ছোটোর মধ্যে একটি সম্ভবমত ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আনিয়া দিবে—উন্নত অবনত, মহৎ তুচ্ছ, উচ্চ নীচের মধ্যে একটি ভালবাসার বন্ধন রচনা করিবে—পাপকে হেয় রূপে দাঁড় করাইয়া পুণ্যের বিমল শ্রী ফুটাইয়া তুলিবে—সেই শক্তি আমরা চাই। স্বতন্ত্র, উন্নত, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ এ শক্তির বিকাশ আকাশকুসুম নহে; ইহা সাধনারই ফল।

আমরা কি করিব, কি করিলে আমাদের জাতির ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হইবে, কি উপায় অবলম্বনে আমাদের মত অধঃপতিত জাতির মধ্যে ধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দেখা দিবে—তাহারই ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে। আমরা চাই, ব্রাহ্মণবালক আবার বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনার কোমলসুরে সারা-দেশ মুখরিত করুক—স্বজাতিপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন ধর্ম্ম আমাদের কল্যাণ সাধন করুক। ইহার জন্য ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করিলে চলিবে না; অনভিজ্ঞের উপহাস ও নিন্দায় বিচলিত হইলেও সুফললাভ হইবে না। স্বার্থের জন্য নহে, ধর্ম্মের জন্য—সবই করা চাই। জাতির হিতের জন্য সবই সহ্য করা চাই। ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসাব রাখার আবশ্যক নাই, কাহারও ভ্রুকুটী-ভয়ে ভীত, কাহারও প্রশংসাবাদলাভে লালায়িত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নাই।

যে দেশের পর্ণকুটীর হইতে সর্ব্বসারাৎসার সঞ্জীবনমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া সারা পৃথিবীকে নবীন আলোক, নূতন জ্ঞান, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দিতে পারে,—সে দেশের সে পর্ণকুটীরের মাহাত্ম্য বড় অল্প নয়। যে তপোবনের জ্ঞানরত্ন-প্রদীপের উজ্জ্বল প্রভা তাবৎ নরনারীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে—সে তপোবনের গৌরব বড় সামান্য নয়। যে দেশের পল্লী হইতে মেঘমন্দ্রে চারিদিক স্তব্ধ করিয়া মহাশান্তি গীত হয়, যে জাতির মধ্য হইতে ব্যাস, বাল্মিকী, বশিষ্ঠ, পরাশর, বৃহস্পতি, নারদ গড়িয়া উঠে, সে জাতি নির্জ্জীব নয়। এই আমাদের ভিতর হইতেই কত মহাত্মা, কত জ্ঞানী, কত ভক্তের আবির্ভাব

দেখা গিয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ যে জাতির শিক্ষক, চৈতন্য চণ্ডীদাস যে জাতির বন্ধু, রঘুনন্দন কৃষ্ণদাস যেখানকার নিয়মপ্রণেতা—সে জাতি কখনই ধ্বংসোন্মুখ হইতে পারে না। রামপ্রসাদ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, রামমোহন, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামনাথ, চন্দ্রকান্ত এখনও যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ কখনই নিশ্চিহ্ন হইতে পারে না। চৈতন্য নিত্যানন্দের জন্মভূমি, শঙ্কর উদয়নের লীলাক্ষেত্র—এ ধর্ম্মের পীঠ, এ পুণ্যের তীর্থস্থলী। এই সব মহাত্মাদের প্রাতঃস্মরণীয় জীবনের প্রভাতরল জ্যোতি আজও আমাদের নদীর জলে প্রবাহিত হয়, তরু গুল্মে ছড়াইয়া থাকে, ধূলিকণার মধ্যে অবস্থিতি করে। বশিষ্ঠ পরাশর গৌতম ভরদ্বাজের, শাণ্ডিল্য সনকের, কশ্যপ গৌতমের পবিত্র রক্ত আমাদের ধমনীতে সঞ্চারিত হইতেছে—আমরা কখনই ধ্বংস-মুখে যাইতে পারি না। বেদ, উপনিষৎ সাহিত্য পুরাণ দর্শন তন্ত্র আমাদিগকে চালিত করিতেছে—আমরা কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট পতিত জাতি হইতে পারি না। রোগে জর্জ্জরিত, অন্নাভাবে প্রপীড়িত, অনাচারে কলঙ্কিত জাতির তাবৎ পদার্থই অতীতের পুণ্যস্মৃতিতে জড়িত, পুণ্যগন্ধে সুরভিত হইয়া আছে।

চাহিয়া দেখ—কালের নিয়মে, দুর্ভাগ্যের দোষে, আগন্তুক বৈষম্যের মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য কল্পিত সাম্যের তরবারি উত্থিত হইয়াছে, অপরদিকে আবার সেই সাম্যের গতিরোধ করিয়া ঐ ঘোরতর বৈষম্য আপনার পদে স্থির থাকিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সাম্য ও বৈষম্যের সংঘর্ষেই প্রকৃত মহাসাম্যের উদ্ভব। এই মহাসাম্যের সমন্বয়মন্ত্রই মৃতসঞ্জীবনীর মত সমস্ত নির্জ্জীবপ্রায় জগৎকে নবীন জীবন দান করিবে। এই মহাসাম্যের উদয়েই দেশের অভ্যুদয়, ধর্ম্মের রক্ষা, জগতের কল্যাণ। এই মহাসাম্য কি? সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মমত মানিয়া চলিয়া স্বধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যা'ক্। আবার উচ্চ নীচ, প্রবল দুর্ব্বল, ধনী দরিদ্র, সকলে মিলিত হইয়া জাতির ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করুক। বড় ছোটকে ভাই বলিয়া কোলে টানিয়া লউক, ছোট বড়র কাছে সসম্ভ্রমে প্রণত হউক। নিষ্কাম কর্ম্মীর মত "কল্যাণ করিব" এই ইচ্ছায় সকলে অবহিত থাকুন। আমরা চাই—আমাদের মধ্যে প্রকৃত উদার্য্য, প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণতা ও অকপট ঐক্য ফুটিয়া উঠুক। আমরা চাই—প্রকৃত সমদর্শিতা স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন ও স্বজাতিপ্রীতি। সকলধর্ম্মাবলী সকলসম্প্রদায়—আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া স্ব স্ব জাতির, বর্ণের, সম্প্রদায়ের ও ধর্ম্মের বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপ-

নার পায়ে ভর দিয়া উঠুক—অথবা আমার প্রত্যেকে এক লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার জন্য মনে প্রাণে মিশিয়া কার্য্য করুক। সকলেই কার্য্য করুক। সকলেই কৃষ্ণের জীব, সকলকার হৃদয়েই নারায়ণ বাস করেন, সকলেরই প্রাণ সুখদুঃখে তুল্যরূপই হৃষ্ট ও ব্যথিত হয়—ইহা মনে করিয়া সকলকে ভালবাসিতে হইবে—ঈর্ষা দ্বেষ, ঘৃণা, রাগ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের নগরের ও পল্লীর কি অভাব, আমাদের প্রাণে মনে কিসের দৈন্য, আমাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে কেন অনমুরাগ, আমাদের জাতির কি ত্রুটি, আমাদের উপর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কি কি দুঃখকষ্ট—তাহা বেশ করিয়া বুঝিয়া তাহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তবে আমাদের অভিপ্রেত মহাসাম্য ফুটিয়া উঠিবে।

এস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহের মত দাঁড়াই, এস—আধ্যাত্মিক উন্নতি, জাতির সমৃদ্ধি, ভাবশুদ্ধির আবির্ভাব ও সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগি। এস, জাতির উপকারার্থ সকল দুঃখকষ্ট, বাধা বিপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া পর্ব্বতের মত অটল থাকি। এস—পাপ, দোষ, তৃণের মত ভাসাইয়া দিয়া, প্রখরনদীস্রোতের মত অবিরামগতিতে ছুটিয়া চলি। দেখিতে হইবে—কোনরূপ রাগদ্বেষ, কোনরূপ পক্ষপাত, কুঅভিসন্ধি, কোনপ্রকার ব্যক্তিগত প্রাধান্য-স্থাপন বা প্রাধান্য-লোপ এই মহাকার্য্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবেও বিরাজ না করে! লক্ষ্য রাখিতে হইবে—এই পবিত্র মিলনীভূমি ব্যক্তির উপর ব্যক্তির আক্রোশ বা মনোমালিন্যে কলুষিত হইয়া না পড়ে! এ পবিত্র প্রাসাদ, এ দেবতার মন্দির, এ সমবেত মিলনক্ষেত্র যে সকলকারই সেবার সামগ্রী। এ আশ্রম সর্ব্বসাধারণের উপকারের বস্তু।

আমাদের এই মিলনকুসুমের উদ্দেশ্য আপনাকে প্রকাশিত করা নয়, বিকাশিত করা; আপনাকে জাহির করা যায়, লুটিয়ে দেওয়া; প্রভুত্ব করা নয়, সেবা করা। দেখিবেন—জন্মতরুর মূলে মৃত্তিকাশয়নে ঝরিয়া পড়াই যেন ইহার পরিণাম না হয়! লক্ষ্য রাখিবেন—বিবাদ-বিসম্বাদের লেলিহান অগ্নিশিখায় যেন ইহা অকালে দগ্ধ হইয়া না যায়? অবহিত থাকিবেন—নিজেদের মধ্যে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করার ফলে ইহার বিকসিত দলগুলি অকালে ছিন্নবিছিন্ন না হইয়া পড়ে। যে প্রবাহিণী আজ কল্লোলমালা বুকে করিয়া জনহিতের সাগরলক্ষ্যে ছুটিয়াছে, যেন তাহা চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানগুলিকে উর্ব্বর ও সরস করিয়া তুলে। ভগবন্! তাহা যেন আপনার কূল ভাসাইয়া দিয়া

না চলে, সমস্ত দেশকে ডুবাইয়া দিবার কারণ না হয়! হউক্ ভাল কাজ, থাকুক মহৎ উদ্দেশ্য—ঠিক্‌মত চালনা করিতে না পারিলে তাহার মহৎ উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়—মন্দ ফলও সে প্রসব করিয়া থাকে। ঔষধও বিষে পরিণত হইতে পারে।

জাতির হিতের জন্য আমাদিগকে কখন কুসুমের মত কোমল, কখন বা বজ্রের মত কঠোর হইতে হইবে। কখন অনুকূল উপায়, কখন বা প্রতিকূল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করা, হিতকর কার্য্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ও স্বার্থপরতার বশে চলা, আমাদের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইবে না। আবার ইহাও অবিসংবাদিত সত্য যে, অনুকূলশক্তির স্থিতি, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের জন্য প্রতিকূলশক্তির প্রয়োজন আছে। সৃষ্টিক্রিয়ার সম্যক্ অভ্যুদয় বজায় রাখার জন্য প্রতিকূলশক্তির উত্থানের আবশ্যকতা চিরদিনই দেখা যায়। অনুকূল ও প্রতিকূলশক্তির সংঘর্ষ-ফলেই সৃষ্টির রক্ষা সাধিত হয়।

প্রতিকূল-শক্তি না থাকিলে অনুকূল-শক্তি আপাততঃ বেশ নির্ব্বিঘ্ন, শান্ত ও কার্য্যক্ষম থাকে, কিন্তু সৃষ্টির নিয়মে অনুকূল শক্তি ক্রমশঃ এমনই স্ফীত হইয়া উঠিতে পারে যে, তখন উহা অতিরিক্ত মেদমাংসবৃদ্ধির মত ভারগ্রস্ত হইয়া উঠে—তখন আর উহার তেমন কার্য্যকারিতা দেখা যায় না। আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা আসিয়া উহাকে পঙ্গু করিয়া তুলে।

বাধা না পাইলে বা বাধা পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে কোন বস্তুর সর্ব্বাঙ্গীন স্থায়িত্ব সম্ভবপর হয় না। বাধা আপাততঃ বিকাশের ব্যাঘাতক মাত্র, কিন্তু ঐ বাধাই পরিণামে বিকাশকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিয়া তুলে। এই দৃঢ় ও স্থায়ী বিকাশের রেখাই কালের কষ্টিপাথরে সমান উজ্জ্বল হইয়া থাকে। বহুদিন যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাদ বিসম্বাদ, বাধা প্রতিযোগিতা না থাকিলে, জাতি প্রথম শান্তি ও সন্তোষ-সুখ অনুভব করে সত্য, কিন্তু পরিশেষে ঐ শান্তি ও সন্তোষই জাতিকে দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট ও কতকটা নিজ্জীব করিয়া তুলে। বিরহই প্রণয়ের প্রগাঢ়তা আনয়ন করে। অভিমান, প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর বিরোধী মনোভাবে ঐক্য ও সামঞ্জস্য আনিয়া দেয়। সহানুভূতিপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে আপনাদের হিতাহিত নির্দ্ধারিত করা ও আরব্ধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সমালোচনা করা দোষের নহে। কোনও জাতির সার্ব্বজনীন কল্যাণময় অভ্যুদয় কখনও একদিনে একজনের চেষ্টায় গড়িয়া উঠে নাই। এ অভ্যুদয় করিতে হইলে চাই সকলের অশ্রান্ত-সাধনা,

চাই সকলের একপ্রাণতা, চাই সকলের নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠান। তর্কবিতর্ক, আপত্তি উপদ্রব, সুখ্যাতি অখ্যাতি অনেক দেখা দিবে, তজ্জন্য নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। স্থির-ধীর-ভাবে আমাদিগকে সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

আমরা সকলেই রজোভাবে অনুপ্রাণিত। রজোরাগের ভিতর দিয়া যে সত্ত্বের প্রকাশ—তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। খাঁটী সত্ত্ব আমরা কোথায় পাইব? শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া আমরা পূজা করি, ঢাকঢোলের শব্দের মধ্য দিয়া আমরা প্রতিমার আবাহন বিসর্জ্জন করি।

শুনিয়াছি, নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ সমবেত হইয়া দেশের হিতচিন্তা করিতেন—সংশয়ভঞ্জন করিয়া ধর্ম্মের অসন্দিগ্ধপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতেন। ঋষিগণের "সংসৎ" পরিশেষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বাদবিতণ্ডাত্মক বিচারসভায় পরিণত হইল। সেই সংসৎ, সেই সভাই আজকালি বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসভা, দেবালয়, থিয়জফিসভা, সৎসঙ্গ, সত্যংসঙ্গ, গীতাসভা, বর্ণাশ্রমধর্ম্মসভা, সনাতনধর্ম্মমণ্ডল প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছে। সূর্য্যদেব আলো দিতেন—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে গভীরা রজনী—ঘনমেঘে দশ দিক্ আকাশ জল স্থল সমাচ্ছন্ন! তাই বলিয়া কি আমরা সেই অন্ধকারেই বসিয়া থাকিব? আমাদের সাধ্যমত আমরা কি প্রদীপও জ্বালিব না?

রাজা, মহারাজা, জমীদার মধ্যবিত্ত সকলেই সহায় হউন। পণ্ডিত, বিষয়ী, দীন, দরিদ্র, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, জৈন—সকলকেই আমরা আহ্বান করিতেছি। সকলকে লইয়াই আমাদের কার্য্য। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য, ঐশী শক্তি চিরদিনই সজাগ। আমরাই সুপ্ত, আমরা জাগিলেই সেই শক্তিও সজাগ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। যদি এ শক্তি না জাগে, এ ব্রত-প্রতিষ্ঠা যদি না হয়, তবে সে দোষ সকলকারই। ধর্ম্মের আন্দোলন, আধ্যাত্মিক উন্নতির আকুলপ্রয়াস, কখনই বৈফল্যপ্রসূ হয় না। এই আন্দোলন যদি জাতির মধ্যে ও সমাজের মধ্যে একটি স্পন্দন ছুটাইতে পারে, সমবেত জনসঙ্ঘের প্রাণে একটি আঘাতও দিতে পারে—সেও ভাল। এই বাতাসই যত কিছু দোষ, ধূলিমুষ্টির মত উড়াইয়া দিবে, বাহ্যভাবে আচ্ছন্ন মনপ্রাণকে আন্তরভাবে অনুপ্রাণিত করিবে।

আমরা চাই—ধর্ম্মে বিশ্বাস, পুণ্যের অনুষ্ঠান, পাপের পরিহার। আমরা চাই—জাতির কল্যাণ, সদাচারের অভ্যুদয়, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা চাই—প্রকৃত মানবত্ব। এই মানবত্বের অধিকারী হইতে হইলে অগ্রে আমাদিগকে

সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। বাক্যে সংযম, আহারে বিহারে সংযম, শীতে গ্রীষ্মে সহিষ্ণুতা, যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যপালন—এ সবই সংযম। সুখদুঃখে সহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয়ের ও চিত্তের সংযম—বড় রকমের সংযম। বড় রকমের সংযম অনেক দিনের সাধনার সাধ্য। ছোট ছোট সংযম শিক্ষা না করিলে বড় রকমের সংযমের অধিকারী হওয়া যায় না। অন্তরশুদ্ধি বহুদিনের চেষ্টার পরিণাম। অগ্রে বাহ্যশুদ্ধির দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। বাহ্যশুদ্ধি সাধিত হইলে তখন অতিসহজেই অন্তরশুদ্ধি দেখা দিবে। তাহা বলিয়া এই বাহ্যশুদ্ধি-কেই "চরম লক্ষ্য" ভাবিলে চলিবে না। ছোট খাট সংযম লইয়া সারা জীবন কাটাইয়া দিলেও চলিবে না।

আমাদের এই উচ্চ আশা, প্রাণভরা স্বপ্ন, সংমিলিত সাধনা কি "পুণ্যে সার্থক" "কল্যাণে চরিতার্থ" হইবে না? পরমেশ্বরের করুণা কি বৃষ্টিধারার মত অনুর্ব্বর শুষ্ক ক্ষেত্রকে উর্ব্বর ও সরস করিয়া তুলিবে না?

আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি; আসুন—একমনে একপ্রাণে একলক্ষ্যে সকল অগ্রসর হউন। ব্যষ্টিগত পার্থক্য থাকিলেও সমষ্টিগত ঐক্যের সেবা করিয়া আসুন সকলে কার্য্য করি। তবেই আজ আমাদের এই আহ্বান কার্য্যকর, এই আবাহন সার্থক হইবে।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

সদৃশ-চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তবে কি পীড়া জানিবার কোন উপায় নাই? বস্তুতঃ প্রকৃত পীড়া জানা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব; কারণ, দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জীবনী-শক্তিকে আমরা কখনই দেখিতে পাই না ও পাইব না। সুতরাং ঐ অদৃশ্য পদার্থের পীড়া কি, তাহা কি জানিবার উপায় আছে? যে প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই অদৃশ্য পীড়ার নিকট উপস্থিত হইতে পারি তাহা এই:—

(১) প্রথমতঃ যে কারণে পীড়ার উৎপত্তি হয় তাহার অনুসন্ধান।

(২) দ্বিতীয়তঃ সেই পীড়ার কারণ জন্য বিধান-বিকার (Physiological-lesion) অর্থাৎ শরীর এবং শারীরিক যন্ত্র যে যে উপাদানে নির্ম্মিত, পীড়ার কারণ দ্বারা তাহাদের যে অপচয় হয়, তাহার নির্ণয়।

(৩) তৃতীয়তঃ এই পীড়ার জন্য স্থানীয় বা সার্ব্বাঙ্গিক যে কোন বিকার উপস্থিত হয় তাহার নিবারণের জন্য প্রকৃতি যে সমস্ত চেষ্টা অর্থাৎ লক্ষণ-সমষ্টি প্রকাশ করেন, তাহার নিরূপণ।

এই লক্ষণ ধরিয়া আমরা বিধান-বিকারের নিকট উপস্থিত হই এবং বিধান-বিকার অবলম্বন করিয়া আমরা জীবনীশক্তির (Vitalforce) নিকট উপস্থিত হই। ইনি যেরূপ চলেন, ঠিক্ সেইরূপ চালিলেই ইঁহার চিকিৎসা হইল; কারণ পীড়া ইঁহারই, অন্যের নহে। ইঁহার সম্বন্ধে ইনি যাহা জানেন তাহাই ঠিক্। ইঁহার পিপাসা হইয়াছে—জল চান; অজীর্ণ হইয়াছে, বমন এবং অতিসার দ্বারা শরীর হইতে উদরস্থ দুষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা পান। যদি ইনি ইঁহার শত্রুকে পরাস্ত করিতে অক্ষম হন, তবে ইঁহার সাহায্যের আবশ্যক। কি প্রকারে আমরা ইঁহাকে সেই সাহায্য দিতে পারি? ইহার একটী মাত্র উপায় আছে, যথা:— সুস্থ শরীরে যে ঔষধ সেবন করিলে আমাদের শরীরে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, পীড়িতাবস্থাপন্ন ব্যক্তিতেও যদি সেই সেই লক্ষণ দেখা যায়, তবে প্রকৃতি যেরূপ সাহায্য চাহিতেছেন তাহা ঠিক্ হইল। যে জাতীয় বিষ প্রকৃতির ভিতর প্রবেশ করায় যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তদদ্বারাই বুঝিতে পারিলাম, প্রকৃতি কিরূপ সাহায্য চাহিতেছেন। কোন প্রবিষ্ট বিষের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রকৃতির চেষ্টাকেই যখন পীড়া বলিয়া বৃথা অনুমান করা হয়, তখন ঔষধ এবং পীড়া উভয়েই এক অর্থাৎ ঔষধ এবং পীড়ায় কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং ঔধধ জানা হইলেই পীড়া জানা হইল। এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, ঔষধ জড় পদার্থ, জড়ের দ্বারা চেতনপদার্থের চিকিৎসা কি প্রকারে সম্ভবে? কিন্তু মনে করিতে হইবে, কেবল জীবাত্মারই চিকিৎসা হয়। জীবাত্মা উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট, উহা জড় এবং চেতনের সমষ্টি। ঔষধও উভয়ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ জড় ও চেতনের সমষ্টি। (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের ১৬ সূত্র দেখ)। এরূপ আপত্তি হইতে পারে, ঔষধ আপনা আপনি চলিতে পারে না কেন? উত্তর— পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরমাত্মার অভাবে জীবাত্মাও শক্তিহীন হইয়া ঔষধের ন্যায় জড় হয় অর্থাৎ—জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, ঔষধ এবং পীড়া উভয়েই এক।

লক্ষণানুসারে উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইলেই পীড়া জানা হইল। এই নির্ব্বাচন যে প্রণালীতে করিতে হয় তাহা সদৃশ-চিকিৎসা-প্রণালী অর্থাৎ "সমঃ সমং শময়তি" এই মন্ত্রের লক্ষ্য।

এক্ষণে প্রকৃত চিকিৎসা কি এবং ঔষধের পীড়া আরোগ্য করিবার কোন শক্তি আছে কিনা তাহাই দেখা যাউক্।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি শত্রুর অর্থাৎ পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে সমস্ত লক্ষণসমষ্টি প্রকাশ করেন, তাহা, তাঁহার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রকৃতি যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়েন, তখন সাহায্য না পাইলে তাহার হস্তে ইনি নিধনপ্রাপ্ত হন; সুতরাং এই লক্ষণসমষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়ান উচিত নহে। এইরূপ বিরুদ্ধতা দ্বারা প্রকৃতির অপকারই হইয়া থাকে। কারণ, ইনি আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিতে পারায় শত্রুর হস্তে শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হন। এক্ষেত্রে যে প্রকারে ইহাকে সাহায্য দিতে হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সে বিষয়টি এইঃ—

(১) প্রথম—ঔষধের পীড়া জন্মাইবার অসাধারণ শক্তি আছে, কিন্তু আরোগ্য করিবার কিছুমাত্র শক্তি নাই।

(২) দ্বিতীয়—* একই সময়ে একই শরীরে (প্রকৃতিতে) একটীর অধিক সদৃশ পীড়া অবস্থিতি করিতে পারে না। ("অর্গাননৃ" অর্থাৎ সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানসূত্রের ৩৬, ৩৭, ৩৮ সূত্র দেখ)। অনেকেই হয়ত এমত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ঔষধের যদি পীড়া আরাম করিবার শক্তি না থাকিল, তবে উহা দ্বারা কি প্রকারে চিকিৎসা চলিতে পারে? উত্তরে বক্তব্য, ঔষধের পীড়া আরাম করিবার শক্তি না থাকুক, পীড়া জন্মাইবার যথেষ্টশক্তি আছে। যে কোন ঔষধই হউক না কেন, পীড়িত শরীরে প্রবেশ করিয়া মূল পীড়াকে আরাম না করুক দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে পারে, যেহেতু ঔষধজনিত পীড়া অতিক্ষমতাশালিনী।

পীড়া আরাম করিবার জন্য যথেচ্ছভাবে কোন বিষ দেওয়ায় দুরারোগ্য ঔষধ-জনিত পীড়া দ্বারা রোগীর প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সদৃশচিকিৎসামতে ঔষধের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধপ্রয়োগ করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। ঔষধ মাত্রই জীবনীশক্তির পরম শত্রু, এইজন্য সদৃশ ঔষধের মাত্রা কল্পনাতীত কম করা হইয়াছে। স্থূলকথা, যেরূপ অল্পমাত্র ঔষধ-প্রয়োগে সুস্থ শরীরের কোন হানি না হয় অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি নিজশক্তি দ্বারা শরীর হইতে

* একাধিক অসদৃশ-পীড়া একই সময়ে একই শরীরে অবস্থিতি করিতে পারে (সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান-সূত্র দেখ।

বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সক্ষম, পীড়িতাবস্থায় সেইরূপ অল্পমাত্রায় ঔষধ দিলেই প্রকৃতির সাহায্য করা হইল। এইরূপ করাতে আমরা দেখিলাম, প্রকৃতি সুস্থ হইয়া উঠিলেন, বাস্তবিক তাহা নহে, ঔষধজনিত ঐ পীড়ার সমধর্ম্ম-বিশিষ্ট আর একটী পীড়া দ্বারা প্রকৃতি ভিতরে অধিকতর প্রবলবেগের সহিত আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মূল পীড়া, ঔষধজনিত পীড়া দ্বারা যেমন নষ্ট হইল, তৎক্ষণাৎ জীবনীশক্তি আবার আপনার শক্তি-প্রভাবে, প্রবিষ্ট বিষের সহিত পীড়ার কারণ শরীরস্থ সদৃশধর্ম্মবিশিষ্ট বিষকে শরীর হইতে দূর করিয়া দিলেন—রোগী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত অর্থাৎ সুস্থ হইলেন। (কারণ—একই সময়ে একই শরীরে একটীর অধিক সদৃশ পীড়া অবস্থিতি করিতে পারে না।)

অনেকেরই এরূপ বিশ্বাস যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা এত কম যে, ইহাতে কোন ক্রিয়াই প্রকাশ করিতে পারে না। তাঁহাদের এরূপ বলিবার কারণ এই যে, অল্পমাত্র ঔষধ-সেবন যে কি অমৃততুল্য ফল প্রসব করে, তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য কয়েকটী বৈজ্ঞানিক অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে।

এই যে একটী প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষ দেখিতেছ, ইহা একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে উৎপন্ন। যদি ঐ ক্ষুদ্রবীজ-মধ্যে ঐ বৃক্ষটী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি না করিত, তবে ঐ বৃক্ষটীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইত। বস্তুতঃ ঐ বৃক্ষটীর ভিতর একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ কেন, অসংখ্যকোটি বটবৃক্ষ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কারণ, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তাহা আছে, যাহা নাই তাহা নাই এবং যাহা নাই তাহা কখনই হইতে পারে না,—বিজ্ঞান ইহা ভিন্ন আর কি বলিবে? সুতরাং ঐ বৃক্ষটী বীজ-মধ্যে না থাকিলে কোথা হইতে আসিল? শূন্য হইতে, না—তাহা কখনই হইতে পারে না। এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, ঐ বীজটীর শক্তি, সমুদয় বৃক্ষটীর শক্তি হইতে এত অধিক যে, তাহা আমরা আমাদের কল্পনা-শক্তি দ্বারা স্থির করিতে অক্ষম। আমরা বীজটীর যতই কেন পরিবর্ত্তন দেখি না, যে বীজ সেই বীজই থাকে। যথার্থতঃ আমরা মাতৃ-গর্ভে যেরূপ ক্ষুদ্রতম অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, এখনও ঠিক্ সেইরূপই আছি। শরীরটী বড় হইয়াছে বলিয়া, আত্মাটীও বড় হইয়াছে—এরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। আত্মা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু; যেরূপ সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করে সেইরূপই থাকে, অথচ ইহার শক্তি অসাধারণ।

এই জীবাত্মারই চিকিৎসা হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম-বস্তুর চিকিৎসা অতিসূক্ষ্মবস্তু দ্বারা করাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। ঔষধ-মাত্রই এই সূক্ষ্ম আত্মার পরম শত্রু। যখন ঔষধের পীড়া জন্মাইবার অসাধারণ শক্তি আছে, তখন অতিমাত্রায় প্রযুক্ত ঔষধে ইহাকে যে নষ্ট করে, তজ্জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক নাই। কারণ, আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি, কতশত লোক যে অমৃত, শিমুলক্ষার, এবং আফিং ইত্যাদি বিষ অতিমাত্রায় সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; সুতরাং ইহাদের দ্বারা চিকিৎসা করা কি সামান্য বিপদের বিষয়? চিকিৎসা আর কিছু নহে, কেবল শত্রু দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করা মাত্র। হোমিওপ্যাথিক-মতে যে কল্পনাতীত কমমাত্রার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, তাহাতে ঔষধজনিত অধিকতর ক্ষমতাশালী মূলপীড়ার সদৃশ আর একটী পীড়া জন্মাইয়াই মূল পীড়াকে নষ্ট করা হইয়া থাকে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে যে পরিমাণ বিষ শরীরে প্রবেশ করান হয়, তাহা প্রকৃতি আপনা হইতেই শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতে সক্ষম। এমন কি, এই ক্ষুদ্রতমমাত্রায়ও কোন কোন রোগীকে কষ্ট ভোগ করিতে হয় এবং প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা সেই কষ্ট নিবারণ না করিলে তাহাতেও রোগীর বিপদের আশঙ্কা হইতে পারে। বস্তুতঃ অল্পমাত্র ঔষধ কেনই বা কার্য্যকারী হইবে না? বসন্তের যে বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হয়, সে কতটুকু? আমাদের বিবেচনায়, এক সূচ্যগ্রে যাহা ধরে তাহার সহস্র-ভাগের একভাগ দিয়া টীকা দিলেও কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। ঐ টুকু বীজ দ্বারা পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য, সমুদায় মনুষ্য কেন, পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সকলেরই টীকা দেওয়া যাইতে পারে। অতএব হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা যদিও অতীব সূক্ষ্ম, তবু ইহার শক্তি যে বসন্তের বীজ অথবা পূর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষের ক্ষুদ্রতম বীজের ন্যায় কার্য্যক্ষম, তাহা কি অবিশ্বাস করিবার যো আছে?

আমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যাঁহারা বলেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উচ্চক্রম এত অধিক অংশে বিভক্ত হয় যে ভাগ করিতে করিতে ঔষধ কিছুই থাকে না। আমরা অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করি, কোন একটি অণুমাত্র পদার্থকে তিনি এই জীবনে ভাগ করিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারেন কি? যতই কেন ভাগ করুন না—ভাগশেষ থাকিয়া যাইবেই, অর্থাৎ ভাগ কখনই শেষ করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

শ্রীনীলাম্বর হুই।

বার-বিন্যাস।

(হোরাবিজ্ঞান।)

"রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি" এই সপ্তবার-বিন্যাসের ইতিহাস জানিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কৌতুহল জন্মে। এই কৌতুহলের তৃপ্তি-সাধন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র, বিজ্ঞানের আলোকে সুসভ্য দেশ হইতে ধীরে ২ বিতাড়িত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে—এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু ইহসংসারের ইতিহাসে ইহার পদচিহ্ন চিরদিন অবিলুপ্ত থাকিবে, তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। জগতে যতদিন জ্যোতিষশাস্ত্রের সমাদর থাকিবে, ততদিন তাহার প্রসূতির সম্মান থাকিবেই থাকিবে।

প্রাচীন জ্যোতিষী ২৮ দিনে চান্দ্রমাস গণনা করিতেন। তিনি সৌর জগতে সাতটী গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

একটী ভাব তাঁহার মনে ছিল, সে ভাব এই:—চান্দ্রমাস ৪ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগে ৭ দিন বা একসপ্তাহ পড়ে। সপ্তগ্রহের নামে সপ্তাহের সাত দিনের নাম-করণ করিলে মন্দ হয় না।

প্রাচীন জ্যোতিষী মনে করিতেন যে—যে গ্রহ যত শীঘ্র রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে দেখা যায়, সেই গ্রহ পৃথিবীর তত নিকটে হইবে—উতগ্লুত।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ফলিতজ্যোতিষের প্রাচীন গ্রহবিন্যাস এইরূপ ছিল:—(১) শনি (২) বৃহস্পতি (৩) মঙ্গল (৪) রবি (৫) শুক্র (৬) বুধ এবং (৭) সোম।

শনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে এবং সোম সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে—পৃথিবীর সন্নিহিত উপগ্রহ।

হোরাবিজ্ঞানের সূত্রমতে (১) সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায়-ক্রমে এক এক হোরা (ঘণ্টা) ভোগ করে। যে গ্রহ যে হোরা ভোগ করে, সেই গ্রহ সেই হোরায় বলীয়ান্ হয়। (২) যে গ্রহ যে দিনের ১ম হোরায় বলীয়ান্ হয়, সে সেই দিনের অধিদেবতা হইবে এবং সেই অধিদেবতা গ্রহের নামে সেই দিনের নাম-কল্পণ হইয়ে। এই সূত্র অবলম্বনে সুচতুর জ্যোতিষী

কোন এক দিনের প্রথমহোরায় কোন এক গ্রহ বলীয়ান্ থাকা সিদ্ধান্ত করিলেন। মনে কর, এই গ্রহ (১) শনি। *

জ্যোতিষী গুণিতে লাগিলেন :—অদ্য প্রথম হোরায় (১) শনি বলীয়ান্ আছে। অদ্য শনির বার বা শনিবার।

শনিবারের ২৪ হোরার মধ্যে প্রথম ২১ হোরা, (১) শনি হইতে (৭) সোম—এই সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায়ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে। অদ্যকার অবশিষ্ট শেষ তিন হোরা (১) শনি (২) বৃহস্পতি এবং (৩) মঙ্গল এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে।

তৎপর-দিনের ১ম হোরা কাজেকাজেই (৩) মঙ্গলের পরবর্ত্তী (৪) রবি-গ্রহের প্রাপ্য হইবে। প্রথম হোরায় রবি বলীয়ান্ হইবে, সুতরাং পরদিন রবির বার বা রবিবার হইবে। শনিবারের পর রবিবার পড়িল।

রবিবারের ১ম ২১ হোরা, (৪) রবি হইতে (৩) মঙ্গল এই সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায়ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে। রবিবারের অবশিষ্ট শেষ তিন হোরা (৪) রবি (৫) শুক্র এবং (৬) বুধ এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে। তৎপর-দিনের ১ম হোরা কাজেকাজেই (৬) বুধের পরবর্ত্তী (৭) সোম-গ্রহের প্রাপ্য হইবে। ১ম হোরায় সোম বলীয়ান্ হইবে; সুতরাং পরদিন সোমের বার বা সোমবার হইবে। রবিবারের পর সোমবার পড়িল।

সোমবারের প্রথম ২১ হোরা, (৭) সোম হইতে (৬) বুধ এই সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায়ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে। সোমবারের অবশিষ্ট শেষ তিন হোরা (৭) সোম (১) শনি এবং (২) বৃহস্পতি এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে। তৎপর-দিনের ১ম হোরা (২) বৃহস্পতির পরবর্ত্তী (৩) মঙ্গল-গ্রহের প্রাপ্য হইবে। প্রথম হোরায় মঙ্গল বলীয়ান্ হইল, সুতরাং পরদিন মঙ্গলের বার বা মঙ্গলবার হইবে। সোমবারের পর মঙ্গলবার পড়িল।

মঙ্গলবারের প্রথম ২১ হোরা, (৩) মঙ্গল হইতে (২) বৃহস্পতি এই সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায়ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে।

* অন্য যে কোন গ্রহ ধরিয়া লইলেও গণনা ঠিক্ হইবে—কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না। লেখক।

মঙ্গলবারের অবশিষ্ট শেষ তিন হোরা (৩) মঙ্গল (৪) রবি এবং ৫ শুক্র এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে। তৎপর-দিনের ১ম হোরা (৫) শুক্র-গ্রহের পরবর্ত্তী (৬) বুধ গ্রহের প্রাপ্য হইবে। প্রথম হোরায় বুধগ্রহ বলীয়ান্ হইল, সুতরাং এই দিন বুধের বার বা বুধবার হইল। মঙ্গলবারের পর বুধবার পড়িল।

বুধবারের প্রথম ২১ হোরা, (৬) বুধ হইতে (৫) শুক্র এই সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায় ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে। বুধবারের অবশিষ্ট শেষ তিন হোরা (৬) বুধ (৭) সোম এবং (১) শনি এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে। তৎপর দিনের ১ম হোরা (১) শনি-গ্রহের পরবর্ত্তী (২) বৃহস্পতিগ্রহের প্রাপ্য হইবে। প্রথম হোরায় বৃহস্পতি গ্রহ বলীয়ান্ হইল, সুতরাং এইদিন বৃহস্পতির বার বা বৃহস্পতিবার হইল। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার পড়িল।

বৃহস্পতিবারের প্রথম ২১ হোরা, (২) বৃহস্পতি হইতে (১) শনি এই সপ্তগ্রহ একে একে পর্য্যায় ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে। বৃহস্পতিবারের অবশিষ্ট তিন হোরা (২) বৃহস্পতি (৩) মঙ্গল এবং (৪) রবি এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে। তৎপর-দিনের ১ম হোরা (৪) রবির পরবর্ত্তী (৫) শুক্র গ্রহের প্রাপ্য হইবে। এই দিনের প্রথম হোরায় শুক্র বলীয়ান্ হইল, সুতরাং এইদিন শুক্রের বার বা শুক্র-বার হইল। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার পড়িল।

শুক্রবারে প্রথম ২১ হোরা, (৫) শুক্র হইতে (৪) রবি এই সপ্ত গ্রহ একে একে পর্য্যায়ক্রমে তিন পালায় "এক এক হোরা হিসাবে" ভোগ করিবে।

শুক্রবারের অবশিষ্ট শেষ তিন হোরা (৫) শুক্র (৬) বুধ এবং (৭) সোম এই তিন গ্রহ একে একে ভোগ করিবে। তৎপর-দিনের ১ম হোরা (৭) সোমগ্রহের পরবর্ত্তী (১) শনি গ্রহের প্রাপ্য হইবে। প্রথম হোরায় শনি বলীয়ান্ হইল, সুতরাং এইদিন শনির বার বা শনিবার হইল। শুক্রবারের পর শনিবার পড়িল।

ধন্য জ্যোতিষী, তোমাকে ভালবাসি না বটে, কিন্তু তোমার ঋণ সভ্য জগৎ শুধিতে পারিবে না—একথা শতমুখে বলিব।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্।

বিবাহ।

বিবাহের উদ্দেশ্য—পুত্রোৎপাদন।

শাস্ত্র বলেন—'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা'। ভার্য্যা-গ্রহণ বা বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন। পুত্রোৎপাদন ভিন্ন সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা পায় না, পিতৃঋণ পরিশোধিত হয় না, পিতৃগণের জলপিণ্ড-সংস্থান হয়না, এইজন্যই শাস্ত্র পুত্রার্থে বিবাহ করিতে আদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি মনু বলেন—

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

স্ত্রী হইতে লোকে অপত্য, ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য, সেবাশুশ্রূষা, উত্তম রতিসম্ভোগ এবং নিজের ও পিতৃগণের স্বর্গগমন লাভ করে। দেখা যাইতেছে, অপত্য বা সন্তানই পত্নীর প্রধান দান। শুশ্রূষা বা রতিসম্ভোগ আনুষঙ্গিক ফল। ধর্ম্মকর্ম্মেও পুত্রের প্রয়োজন। গৃহস্থ-জীবনের সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হইয়া করিবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ,—শাস্ত্র বলেন 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ', কিন্তু বেদোক্ত যজ্ঞাদিকর্ম্মে অধিকারী হইতে গেলে পুত্রোৎপাদন দরকার। বৈদিক যজ্ঞাদির মূল অগ্ন্যাধান, অগ্ন্যাধান না করিয়া যজ্ঞকার্য্য করা অসম্ভব। অগ্ন্যাধানে পুত্রবান্ লোকই অধিকারী। বেদ বলেন "জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীত"—যাহার পুত্র জন্মিয়াছে, অথচ কেশ কৃষ্ণবর্ণ আছে, (অর্থাৎ চুল পাকে নাই) সেই অগ্ন্যাধানে অধিকারী। সুতরাং অপুত্রকের বেদোক্ত যজ্ঞাদিকার্য্যে অধিকার নাই—ইহা বলা যায়। শাস্ত্র এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

সমাপ্য বিধিবদ্ বেদান্ পুত্রান্ উৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

প্রথমতঃ বেদ-অধ্যয়ন শেষ করিয়া সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিবাহ করিবে; পরে সন্তান উৎপাদন করিবে; অনন্তর অগ্ন্যাধান সমাধান করিয়া, সস্ত্রীক বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে; পরে বিষয়-কামনার পরিপাক হইলে মোক্ষার্থে মনোযোগ করিবে—ইহাই হইল সাধারণ অধিকারীর পক্ষে ব্যবস্থা।

নিজের ও পিতৃপুরুষগণের স্বর্গলাভ, অপত্যকৃত শ্রাদ্ধাদির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে—শাস্ত্র একথা বারংবার বলিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন—

পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে
অথ পৌত্রস্য পুত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপম্।

মানুষ পুত্রের দ্বারা লোক জয় করে, পৌত্রের দ্বারা আনন্ত্য প্রাপ্ত হয়, আর পৌত্রের পুত্রের দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। পুত্রাদিরা পিত্রাদির উদ্দেশে যে বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি করে, তাহাও পিত্রাদির প্রেতলোকপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলোকগমন-কামনায়ই করে। পুত্রাদিকৃত ষোড়শশ্রাদ্ধের দ্বারা প্রেতত্ববিমুক্তি হয় এবং স্বর্গাদিলোক-লাভ হয়—ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সুতরাং অপত্যই যে বিবাহের বা ভার্য্যাগ্রহণের লক্ষ্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যদি বলা যায়, রতিলাভ বা ইন্দ্রিসুখভোগই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ ইন্দ্রিয়চর্য্যার সহিত বিবাহের কোনও সম্পর্ক নাই। ইন্দ্রিয়চর্য্যা যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হইত, তবে শাস্ত্রকারগণ মাত্র ইন্দ্রিয়চর্য্যার উপযুক্ত পাত্রীকেই বিবাহ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বলেন নাই। মহর্ষি মনু বলেন—'প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ' অপত্য উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীর সৃষ্টি, গ্রাম্যধর্ম্মের আচরণের জন্য নহে। মহর্ষি মনু 'নিষ্পুরুষ কুল' অর্থাৎ যে বংশের নারীগণ কন্যাসন্তান প্রসব করে, পুত্র প্রসব করে না, সেই বংশের কন্যা বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যা যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হইত, তবে এরূপ আদেশের প্রয়োজন থাকিত না।

অধিবেদন।

মহর্ষি মনু যে অধিবেদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতেও "বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন" একথা প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যথা—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী।

বন্ধ্যা স্ত্রীর স্বামী, পত্নীর প্রথম ঋতুকাল হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারে। যে স্ত্রীর সন্তান বাঁচে না তাহার স্বামী, ঐরূপ ১০ বৎসর পরে অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। যে স্ত্রী কন্যাসন্তানই প্রসব করে, পুত্র প্রসব করে না, তাহার স্বামী, ঐরূপ ১১ বৎসর অপেক্ষা করিয়া আবার বিবাহ করিতে পারিবে। অপ্রিয়বাদিনী পত্নীর (যদি পুত্রবতী না হয়) পতি, কালবিলম্ব না করিয়াই দারান্তর গ্রহণ করিতে পারিবে।

মহর্ষির এই উপদেশের মধ্যে বিবাহের লক্ষ্য যে পুত্রোৎপাদন তাহা ব্যক্ত আছে। বন্ধ্যা, মৃতপ্রজা ও কন্যাপ্রসবিনী—ইহার কোনও নারীই ইন্দ্রিয়চর্য্যার

অনুপযুক্ত নহে। এই সকল স্ত্রী হইতে বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন সিদ্ধ হয় না বলিয়াই মহর্ষি পুনরায় বিবাহের উপদেশ দিয়াছেন।

অপ্রিয়বাদিনী পত্নীও যদি পুত্রবতী হয়, তাহাহইলে পতি পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না, ইহা শাস্ত্রের আদেশ। মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন "ধর্ম্ম-প্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত অন্যতরাপায়ে তু কুর্ব্বীত।" যে পত্নী ধর্ম্মশীলা ও পুত্রবতী, সে অপ্রিয়বাদিনী হইলেও তৎসত্বে অন্য বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি অপ্রিয়বাদিনী পত্নী অধার্ম্মিকা হয় ও পুত্রবতী হয়, তবে তাহাকে ব্যবহারে বর্জ্জন করিবে, কিন্তু অন্যবিবাহ করিবে না। আর যদি সে পুত্রবতী না হয় এবং ধার্ম্মিকা হয়, তাহার অনুমতি লইয়া (তাহাকে তুষ্ট করিয়া) পুনরায় পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবে। অপ্রিয়বাদিনী অপুত্রা হইলেই পুত্রার্থী পতি পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। এখানে আমরা দেখিতেছি, বিবাহের সহিত পুত্রোৎপাদনেরই সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়চর্য্যার নহে।

সুসন্তান-লাভই বিবাহের উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রের অনুশাসন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বিবাহের উদ্দেশ্য সুপুত্রোৎপাদন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অনিন্দিত-স্ত্রী-বিবাহাৎ অনিন্দ্যা ভবতি প্রজা,
তথানিন্দ্যাবিবাহেন নিন্দিতা ভবতি প্রজা।

অনিন্দিতা স্ত্রী বিবাহ করিলে অনিন্দিত সন্তান জন্মে, নিন্দিত স্ত্রী বিবাহ করিলে নিন্দিত সন্তান জন্মে। একথার মধ্যে এই উপদেশ আছে যে, অনিন্দিতা স্ত্রী বিবাহ করা কর্ত্তব্য, কারণ উত্তম-সন্তান-লাভই অভিপ্রেত।

যদি কেহ বলেন যে, শাস্ত্রে যাহাই থাকুক না কেন, বিবাহ ব্যতীতও যখন পুত্রোৎপাদন অসম্ভব নহে, তখন, বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন—একথা স্বীকার করা যায় না। প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিতে পারা যায় যে, পরিণীতা পত্নী ভিন্ন অন্যত্র সুসন্তান-লাভের প্রত্যাশা নাই। পরনারীস্পর্শ মহাপাপ। ইহা শুধু শাস্ত্র-দৃষ্টিতে নয়, লোকদৃষ্টিতেও মহাপাপ। নৈতিক আদর্শ হইতে স্খলিত পতিত দুশ্চরিত্র নরনারী সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করে—সমাজের সংযম ও পবিত্রতার উজ্জ্বল আদর্শকে অংশতঃ কলুষিত করে—আধ্যাত্মিক কল্যাণের মঙ্গলময় প্রশস্ত পথ কণ্টকিত ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলে—ব্যভিচারের পঙ্কিল-স্রোতে সমাজের সুখ-শান্তি ভাসাইয়া দিয়া নিজের—দেশের—দশের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনিষ্টের সহায় হয়। যে রমণী বহু পুরুষ কর্ত্তৃক

উপভুক্তা হয়, তাহার গর্ব্ভজাত সন্তান ভাল হইতে পারে না। যাহারা পরবনিতা ও বারবনিতায় সন্তানোৎপাদনের প্রত্যাশায় সঙ্গত হয়, তাহারা হিতকর অপত্য-লাভে বঞ্চিত হয়—আত্মগ্লানিতে, মর্ম্মপীড়ায়, অনুতাপে, শত বৃশ্চিক দংশন-যন্ত্রণা অনুভব করে,—লজ্জাকর দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত, অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আমরণ দুর্ব্বহ লোকনিন্দিত জীবনভার বহন করিয়া থাকে। ব্যভিচারিণী নারীর গর্ব্ভজাত সন্তানের হৃদয় উন্নত ও সদ্গুণান্বিত হইতে পারে না। দেখা যায়, সেরূপ সন্তান দ্বারা দেশে পাপ-প্রবাহই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেরূপ সন্তান, পবিত্রতার ঘোর শত্রুই হইয়া থাকে। তাদৃশ সন্তান হইতে যথার্থ মানবসৃষ্টিপ্রবাহ-রক্ষা হইতে পারে না, কারণ তাহা হইতে উত্তরোত্তর অধিকতর অধঃপতিত সন্তানের আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনায় মানব-সমাজ ক্রমে পশুত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। ঐ ভাবে সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষার চেষ্টা, প্রকারান্তরে সৃষ্টিনাশেরই আয়োজন। সুতরাং ঐরূপ সন্তান 'অপত্য'-পদবাচ্য নহে। তাদৃশ সন্তান ঐহিক উপকারে আসে না। পারত্রিক-কল্যাণ জলপিণ্ড লাভ, জারজ সন্তানের বা বেশ্যাপুত্রের নিকট সম্ভবই নয়। এরূপ পাপ-ব্যবহারে কেবল ঘৃণিত সন্তানের উদ্ভব হয়।

উত্তম সন্তান লাভ করিতে হইলে, এমন নারীর সহিত সঙ্গত হইতে হইবে, যাহার শীল, সংযম, স্বভাব, আশা, আকাঙ্খা নিজের অনুরূপ। পরনারী ও বারনারীতে ইহা কদাচ সম্ভাবিত নয়। কাজেই সুসন্তানলাভের আশা থাকিলে, সর্ব্বপ্রকারে নিজের অনুরূপ বিবাহিতা পত্নীতেই শাস্ত্রীয়-নিয়ম-পালনপূর্ব্বক সঙ্গত হওয়া কর্ত্তব্য। এ যাবৎ আলোচনায় বুঝা যায়, সুসন্তান-লাভের আশা করিতে হইলে বিবাহ ভিন্ন ন্যায্য গত্যন্তর নাই।

পুত্রোৎপাদনের জন্যই অভিগমন কর্ত্তব্য, অন্যথা নহে।

ইন্দ্রিয়চর্য্যা বিবাহের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু বিবাহ, ইন্দ্রিয়সেবার মধ্য দিয়াই সন্তান উৎপাদনে সহায় হইয়া থাকে। যদি বিবাহিত নরনারী গ্রাম্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকে, যদি তাহারা চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া কালাতিপাত করে, তবে সে ক্ষেত্রে সন্তানলাভের প্রত্যাশা নাই, সুতরাং বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনের মধ্যে একটী সংযোগ-সেতুর প্রয়োজন আছে, সেটী অভিগমন—স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন।

অভিগমন যথার্থ লক্ষ্য নয়, কিন্তু উহা ব্যতীত বিবাহের উদ্দেশ্য অপত্যোৎপাদন নিষ্পন্ন হইতে পারে না—এ জন্যই শাস্ত্রকারগণ অপত্যলাভার্থে

অভিগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেখানে একেবারেই সন্তানোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই, সেরূপ স্থলে তাঁহারা অভিগমনের আদেশ দেন নাই। শাস্ত্রে আছে "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" অর্থাৎ পত্নীর ঋতুকালে পতি তাহার সহিত সম্মিলিত হইবেন। ঋতুকালই গর্ভাধানের যোগ্য কাল। প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সময়ে নারীদেহে গর্ভগ্রহণের যোগ্যতা উদিত হয় ও পুংসংসর্গলাভের প্রবণতাও উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে পুরুষ-দেহেও যদি বীজ-বপনের যোগ্যতা ও স্ত্রীসংসর্গ-লাভের প্রবণতা জন্মে, তাহা হইলে ঐ সময়ে (ঋতুকালে) উভয়ের শারীরিক ও মানসিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিগমন করিলে অনুরূপ সন্তান জন্মিতে পারে। উভয়ের শরীর ও মনের ভাব একরূপ না হইলে সে সময়ে উপগমনে অনুরূপ সন্তান জন্মে না।

শাস্ত্রের আদেশ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। পশ্বাদি জীবেরা ঋতুকালেই উপগমন করে এবং যথাকালে সন্তানলাভ করে। দেহের গন্ধ ও স্বরের অবস্থা হইতে ঋতুলক্ষণ অবগত হইয়াই বৃষ, গাভীর সহিত সঙ্গত হয়। গাভীও ঋতুকালে বিলক্ষণ কণ্ঠস্বরের বিজ্ঞাপনে বৃষকে আহ্বান করিয়া নিজের সন্তান-কামনার পরিচয় দেয়। ফলে (রোগাদি কারণ ব্যতীত) তাহাদের সম্মিলন প্রায়ই সুফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহারা ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে সঙ্গতও হয় না। মানুষ যদি ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়ে সংযত থাকিয়া কেবলমাত্র ঋতুকালেই সন্তান-লাভার্থ পত্নীতে উপগত হয়, তাহা হইলে সুসন্তানলাভে (প্রায়ই) বাধা হয় না।

মানুষ অস্বাভাবিক উপায়ে (ইন্দ্রিয়ক্ষোভকর আলোচনা, নারীচিন্তা, নারীর সহিত মেশামিশি, চিত্তহারল্যাকর-গ্রন্থপাঠ ও উত্তেজক-খাদ্যভোজনাদি দ্বারা) নিজের স্বাভাবিক সংযমশক্তির সঙ্কোচ সাধন করিয়া অভিগমনের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া তোলে; কাজেই যে সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে যথার্থ প্রবণতা উপস্থিত হয় সে সময়টী সে নিরূপণই করিতে পারে না, আর পারিলেও তাহার সদ্ব্যবহারে সমর্থ হয় না। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-সেবায় মানুষ নিজের শরীরসার নষ্ট করিয়া অভ্যাসের দাসত্বে কষ্টকর জীবন যাপন করে, কাজেই সংযমের সুখ ও সুফল লাভ করিতে পারে না। আত্মদোষেই রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বল স্বল্প-জীবী অকর্ম্মণ্য সন্তান লাভ করিতে হয় ও রোগ-শোকে দুঃখদারিদ্র্যে কাতর হইতে হয়। সংযম—শাস্ত্রীয়-নিয়ম পালন করিলে এ সব ক্লেশ কমই হয়। সংযত হইলে—শাস্ত্রীয় নিয়ম (ঋতুগমন) পালন করিয়া চলিলে, পুরু-ষের শুক্রদোষ-সম্বন্ধীয় রোগ ও স্ত্রীলোকের রজোদোষ ঘটিত রোগ, এমন

কি, মৃতবৎসতাদোষ পর্য্যন্ত সারিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রীয় নিয়ম * মানিয়া উপগমন করিলেই সুসন্তান লাভ করা যায়। সকল মঙ্গলের মূল সংযম—নিয়মপালন।

যাঁহারা সংযত, তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সময়-বিশেষে নারীর যেমন রজোযোগ বা গর্ভগ্রহণযোগ্যতা উপস্থিত হয়, সংযত পুরুষেরও ঐরূপ সময়বিশেষে অমোঘ বীজবপনের যোগ্যতা উপস্থিত হয়। অসংযত হওয়ায় বর্ত্তমানে নারীগণের মধ্যে অনেকেরই রজোদোষ বা রজোবিকৃতি ঘটিয়াছে; পুরুষগণের মধ্যেও সেইরূপ স্বাভাবিক যোগ্যতার অত্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শাস্ত্রীয়-নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে এই অনিবার্য্য দণ্ড। শাস্ত্রকর্ত্তারা ঋতুকালে উপগমনের বিধি দিয়াছেন—পশুরা অদ্যাপি তাহা প্রতিপালন করিতেছে; কিন্তু হায়! মনুষ্যগণ এ বিষয়ে পশুগণের অপেক্ষাও নিম্নস্তরে উপস্থিত হইয়াছেন।

উপগমন-বিধানের লক্ষ্য—সংযম-শিক্ষা।

ঋতুগমন-বিধানের আলোচনা করিতে গেলে দেখাযায়, শাস্ত্রকারগণ সমগ্র ঋতুকালকে উপগমনের উপযুক্ত মনে করেন নাই। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শস্মৃতাঃ" রজোযোগদিন হইতে ১৬ রাত্রি (অহোরাত্র) ঋতুকাল।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশীচ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ।

সেই ষোড়শরাত্রির মধ্যে প্রথম ৪ রাত্রিতে এবং একাদশ-রাত্রি ও ত্রয়োদশরাত্রিতে উপগমন কর্ত্তব্য নহে। অবশিষ্ট দশরাত্রির যে কোনও রাত্রিতে (চন্দ্রতারাশুদ্ধি সত্ত্বে) উপগমন কর্ত্তব্য। এই দশরাত্রির মধ্যেও পর্ব্ব থাকিলে তাহাতে উপগমন বিধেয় নহে। মনু বলিয়াছেন "পর্ব্ববর্জ্জম্।" অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, আমাবস্যা, পূর্ণিমা, ও সংক্রান্তির নাম পর্ব্ব। এতদ্ব্যতীত ব্রত, উপবাস, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির পূর্ব্বদিনে যে সংযম করিতে হয়, সে দিনে এবং ব্রতাদি যে দিনে করা হয় সে দিনেও উপগমন নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খাইলে ও নিজে কাহারও শ্রাদ্ধ করিলে সেদিনও উপগমন করিবে না। শাস্ত্রে আরও বহুনিষেধের কথা আছে। শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা প্রভৃতির দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার

* ঋতুকাল এবং অন্যকাল উভয় সময়েই ইচ্ছাসত্বে উপগমন সম্ভব; এ অবস্থায় ঋতুকালেই অভিগমন কর্ত্তব্য (অন্যকালে নহে) এইরূপ নির্দ্ধারণই 'নিয়ম'।

কথা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে। এই সকল নিষেধ-নিয়ম পালন করিয়া চলিলে সংসর্গ অল্পই ঘটে, সংযমের মর্য্যাদা রক্ষা পায়।

শাস্ত্রীয় আদেশের আলোচনায় বুঝা যায়, শাস্ত্রকারগণ বিবাহিত ব্যক্তির নিজস্ত্রীতেও যথেচ্ছ সংযোগের ব্যবস্থা দেন নাই। উপগমনের বিধান, ইন্দ্রিয়-চর্য্যার সমর্থন করে না, পক্ষান্তরে সংযমেরই সমর্থন করে। এই শাস্ত্রীয় সংযম-নিয়ম মানিয়া চলিলেই সুসন্তান লাভ করা যায়—বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

উদ্দেশ্য ও উপায়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ইন্দ্রিয়চর্য্যা বিবাহের উদ্দেশ্য না হয়, তবে অপত্যোৎপাদন উদ্দেশ্য হইতে পারে না; কারণ অপত্যোৎপাদন ইন্দ্রিয়চর্য্যারই অধীন। প্রত্যুত্তরে বলা যায়, উপায় কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বৈধ উপগমন সন্তানলাভের উপায়। সন্তান-লাভের জন্য বিবাহ করা কর্ত্তব্য, এইরূপ শাস্ত্রীয় আদেশ আছে, কিন্তু "উপগমনের জন্য বিবাহ করিবে" এরূপ বিধান নাই। "বৈধ উপগমন দ্বারাই সন্তান লাভ করা কর্ত্তব্য" এই শাস্ত্রীয় বিধি, যথেচ্ছ উপগমনের সমর্থক নয়, সন্তানার্থে উপগমন-নিয়ম-* পালনেরই সমর্থক।

ইন্দ্রিয়-সেবা উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ পুত্রার্থীর প্রলোভনস্বরূপ হইয়া বৈধ পুত্রোৎপাদনে প্ররোচনা জন্মায়। পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য, কিন্তু উহার উপায় যদি অসুখকর হয়, তবে সে কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে অগ্রসর হয় কয়জন? কর্ত্তব্যে আগ্রহ জন্মাইবার নিমিত্তই বিধাতা ইন্দ্রিয়-সেবায় ইন্দ্রিয়-সুখের বিধান করিয়াছেন। হিতকর ঔষধও তিক্ত হইলে সহজে কেহ খাইতে চাহে না। উপকারক ঔষধ মিষ্ট হইলেই লোকে আগ্রহ-সহকারে খায়। নিবৃত্তরজস্কা স্ত্রীতে উপগমনের বিধান নাই, সুতরাং বুঝা গেল, পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা ভিন্ন উপগমন সঙ্গত হয় না।

"আধ্যাত্মিক মিলন" বিবাহের উদ্দেশ্য নহে।

যেমন ইন্দ্রিয়সেবা বিবাহের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, তেমনি নর-নারীর আধ্যাত্মিক মিলনও বিবাহের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, আধ্যাত্মিকমিলনই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে পারি,

* ঋতুকালেই নিজস্ত্রীতে সঙ্গত হইবে, অন্যথা নহে; এই নিয়মকে উপগমন-নিয়ম বলা যায়।

নরনারীর আধ্যাত্মিক মিলন, বিবাহ ব্যতীতও সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু বৈধ সন্তানোৎপাদন কখনই বিবাহ ভিন্ন ঘটিতে পারে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি—আত্ম-বিকাশ—আত্মলাভ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে, বিবাহ ভিন্নও নরনারীর মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলন ঘটিয়া থাকে, আবার বিবাহের দ্বারাও নরনারীর আধ্যাত্মিক মিলন হইয়া থাকে। এ অবস্থায় বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক মিলন—ইহা বলা সঙ্গত নহে। পতি-পত্নীভাবে যে লৌকিক বা শারীরিক সম্বন্ধ ও বৈধ উপগমনের অধিকার, তাহা আধ্যাত্মিক-মিলনে একান্তই নিরর্থক। সুতরাং বিবাহের সহিত আধ্যাত্মিক-মিলনের কার্য্যকারণভাব-সম্বন্ধস্থাপন কষ্টকল্পনা মাত্র।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বিবাহবিধির অধীন নহেন।

বিবাহের উদ্দেশ্য অপত্যোৎপাদন—সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষণ, সুতরাং বিবাহ কর্ত্তব্য, যদিও ইহাই সংক্ষেপে শাস্ত্রের উপদেশ, তথাপি ইহা সত্য যে, এ কর্ত্তব্যের বন্ধনে সকলকে বদ্ধ করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা সৃষ্টিপ্রবাহ-রক্ষার্থে অগ্রসর হন না।

শাস্ত্র একশ্রেণীর (উপকুর্ব্বাণ) ব্রহ্মচারীর জন্য লিখিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ—ব্রহ্মচর্য্য শেষ করিয়া গৃহস্থ হইবে অর্থাৎ বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবে,—পরে যখন বয়স অধিক হইবে, ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিবে, তখন বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে,—সর্ব্বশেষে পূর্ণ বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাস লইয়া আত্মমোক্ষ ও জগতের কল্যাণে মনোনিবেশ করিবে।

এ ব্যবস্থার অনুসরণ সকলে করিবে না, কারণ সকলের অধিকার সমান নয়, সকলে সমান ভোগবাসনা লইয়া বাস করে না। ব্রহ্মচারিজীবনেই যাহার ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়, সে আবার গৃহস্থ-জীবনের জঞ্জাল স্পর্শ করিতে যাইবে কেন? যাহার সংসার-বাসনা নাই, সে হয়ত আমরণ পবিত্র ব্রহ্মচারি-ব্রত পালন করিয়া, সংযমের অবতারস্বরূপ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিরূপে জীবনযাপন করিবে, না হয় ব্রহ্মচর্য্যসমাপ্তির পরেই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া বিশ্বমঙ্গলে আত্ম-নিয়োগ করিবে। শাস্ত্র, আমরণ-ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

আসমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুম্
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্।

যে ব্রহ্মচারী আমরণ গুরু-শুশ্রূষায় (গুরুর অভাবে অগ্নির সেবায়) জীবন অতিবাহিত করেন, তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন।

আমরণ ব্রহ্মচারী, ইহজীবনে আদর্শ সংযমী, নিষ্কাম কর্ম্মী ও নিঃস্বার্থ সেবক-রূপে জগতে যে অত্যুচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, তাহা দ্বারা জগতের যে মহদুপকার সাধিত হয়, তাহার তুলনায় অপত্যোৎপাদন দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহরক্ষণ অধিকতর মঙ্গলদায়ক নহে। এই সকল নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারীরা আমরণ পবিত্র জীবন যাপন করেন ও পরিণামে শাশ্বত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ—অর্থাৎ যদি সংসার-কামনা না থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যের অন্তেই সন্ন্যাসী হইবে। এই সব বিরক্ত সন্ন্যাসীরা মোক্ষ বা অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। বেদ বলিয়াছেন, ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ। ত্যাগ—সন্ন্যাস—বিধিপূর্ব্বক ত্যাগ। সন্ন্যাসীর জীবনের মুলমন্ত্র 'আম-মোক্ষ ও জগতের মঙ্গল।' একজন প্রকৃত ত্যাগী সন্ন্যাসী, জগতের যে মঙ্গল সাধন করেন, লক্ষ ২ পুত্রবান্ গৃহস্থও তাহা করিতে পারেন না।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অথবা যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যসমাপনপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদের মানবজীবন সফল, কারণ তাঁহারা সংযমের পথে—ত্যাগের পথে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া কৃতার্থ হন। পবিত্রতার ও ত্যাগের আদর্শ-সম্পৎ তাঁহাদিগকে অমরত্ব প্রদান করে। তাঁহারা ইহজীবনেই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। মানব-জীবনের উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁহারা দীর্ঘকাল সংযমের সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃত হইয়া কামাদি পাশবপ্রবৃত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন এবং পরিণামে কামাদিকে পরাস্ত করিয়া বিজয়মাল্য গ্রহণ করেন। তাঁহারাই আদর্শ মানবজীবন বহন করেন।

(ক্রমশঃ)

শাপে বর।

দশরথ! মোরা অন্ধ দম্পতি, কখন
পরস্পর কেহ কারো না দেখি বদন।
এ ধরা বিষম এক অন্ধকারে ঢাকা
যদিও মোদের কাছে, তবু মধুমাখা

সিন্ধুর বচন শুনি ভাবিতাম মনে—
এ সুখের তুল্য সুখ নাহিক্ ভুবনে!
ক্ষুধা হ'লে ফল আর পিপাসায় জল
সিন্ধুই যোগা'য়ে প্রাণ করিত শীতল।
এরূপে সন্তুষ্ট হ'য়ে পুত্রের সেবায়,
থাকিতাম বিভুপদ-ধ্যানে সর্ব্বদায়।
অহহ! সাধিলে আসি সে সাধে বিষাদ!
বিনাদোষে ঘটাইলে কি ঘোর প্রমাদ?
অপুত্রক তুমি, কিন্তু কহি কায়মনে—
অপত্য-বিরহ-দুঃখ ভুঞ্জিও জীবনে!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ।

শিক্ষাষ্টকং।

(পূর্ব্বিতোনুবৃত্তম্)

এরূপ নামেও রুচি হইল না বলিয়া বিষাদ ও দৈন্য প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, আমি দীন, কিন্তু আমার এ দৈন্য, নাম লইবার অধিকারশূন্যতা-জন্য দৈন্য—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণ, লোক সকলের ভিন্ন ভিন্ন রুচির নিমিত্ত বহুপ্রকার নাম ধারণ করিয়াছেন এবং সেই নামে আপনার স্বরূপের সমুদায় শক্তি অর্পণ করিয়াছেন—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ২৬৯ অঙ্কে।

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ-রূপ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ১৭ পরিচ্ছেদে।

এই 'সকল শক্তি' বলাতেই বুঝা গেল, নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞান-যোগাদি কিছুই খুজিতে হইবে না; কারণ সর্ব্বশক্তির মধ্যে যোগশক্তি জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে এই "হরেকৃষ্ণ" নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না; প্রত্যুত নামে লালসা ও আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু এইরূপ অন্যকোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। সুতরাং বলিয়াছেন "অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" অর্থাৎ যেই নাম সেই কৃষ্ণ। এই নামের আরও শক্তি এই যে, এনাম উচ্চারণে শুদ্ধি বা অশুদ্ধতার অপেক্ষা রাখেন না যথা—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেৎ দেহ-দ্রবিণ-জনতালোভ-পাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

(পুনা—আনন্দাশ্রম-মুদ্রিত) পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

হে বিপ্র। একমাত্র নাম যাহার বাক্যগত (অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্ মধ্যে প্রবৃত্ত) স্মরণ-পথগত (অর্থাৎ কথঞ্চিৎ মনঃস্পৃষ্ট) কিম্বা কর্ণমূলে স্পৃষ্ট হয়েন, তাহা শুদ্ধবর্ণই হউন্ বা অশুদ্ধবর্ণ হউন্, ব্যবহিতরহিত হইলেই নামকারীকে নিশ্চয় উদ্ধার করিবেন। কিন্তু, ঐ নাম যদি দেহ, ধন, ও জনতায় লোভ-পরায়ণ পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহাহইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েননা। (নামের এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে—এমন সময় যদি অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু নামের অবশিষ্টাংশের উচ্চারণ না করা হয় তাহা হইলে ঐ উচ্চারণ ব্যবহিত। যেমন "নারায়ণ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "নারা" এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পরে অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করা হয় ও নামের অবশিষ্ট "য়ণ" এই দুই অক্ষর আর উচ্চারণ না করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে "ব্যবহিত" বলে। "তদ্রহিত" অর্থাৎ "নারা" শব্দের পর অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া পরে "য়ণ" শব্দ উচ্চারণ করা হইলে তাহাকে "ব্যবহিতরহিত" বলে।)

নামের আরও শক্তি এই যে নামাভাস হইতে পাপক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে! পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তম-শ্লোক-মৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃ-শ্রবণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে ১ম লহর্য্যাম্।

মহাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে গুণনিধে! তুমি সেই পাবন সকলের পাবন উত্তমশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা-বিশুদ্ধ মতিদ্বারা অকপটে ভজনা কর; কারণ যদি তাঁহার নাম রূপ সূর্য্যের আভাস-মাত্র একবার অন্তঃকরণ-কুহরে উদিত হয়, তাহা হইলে তাহা মহাপাতক-রূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করিবে।

ঐ নামাভাস হইতে সংসার-ক্ষয় হইয়া থাকে যথা—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিকম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥
শ্রীভাগবতে ৬।২।৪৯।

মহাত্মা শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন যে, অজামিল যখন মৃত্যু-সময়ে (শ্রদ্ধাবিহীন হইয়াও) পুত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে যে ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তি হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি?

এ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় কহিয়াছেন—

নামাভাস হৈতে সব পাপক্ষয় হয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহে অজামিল সাক্ষী॥
শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যলীলয়াং ৩ পরিচ্ছেদে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি নামাভাসে মনুষ্য মুক্তি লাভ করেন, তাহাহইলে অজামিল ত জীবদ্দশায় পুত্র নারায়ণকে অনেকবার আহ্বান করিয়া-ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মুক্তি না হইয়া মরণ-সময়ে নারায়ণকে আহ্বান করিতেই তাঁহার মুক্তি হইল কেন? নাম-মাহাত্ম্য রক্ষা করিবার জন্য পূজ্যপাদ

জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে পুত্রের "পুঁটি" "পচা" প্রভৃতি অন্য "ডাকনাম" ছিল, সেই নামেই অজামিল তাঁহার পুত্রকে চিরকাল আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন ; কিন্তু মৃত্যু-সময়ে পূর্ব্বজন্মান্তরীণ সুকৃতিবশতঃ "নারায়ণ" নামেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মুক্তি হইয়াছিল—

"যদি পূর্ব্বং তন্নোচ্চারিতবান্ তথাপ্যেতেনৈব নিষ্কৃতং কৃতং স্যাদিতি হি তদর্থঃ"

শ্রীভাগবতে ৬। ২। ৮ শ্লোকে জীব-গোস্বামিপাদঃ।

নাম-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ কহিয়াছেন যে, পুত্রের নামকরণ-সময় হইতে যে অনেকবার নাম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথমনাম-গ্রহণেই সমুদায় পাপক্ষয় হইয়াছিল এবং তৎপরে দ্বিতীয়বার হইতে যত নাম করিয়াছিলেন— সেই নাম-সমুদায় অজামীলের ভক্তির সাধক হইয়াছিল—

"বস্তুতস্তু পুত্র-নামকরণসময়মারভ্যৈব পুত্রাহ্বানাদিষু বহুশো ব্যাহৃতানাং নাম্নাং মধ্যে যৎ প্রথমং তদেব সর্ব্বপাপপ্রশমকমভূদন্যানি তু ভক্তি-সাধকানীতি ব্যাখ্যেয়ং"।

শ্রীভাগবতে ৬। ২। ৯। শ্লোকে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

এই নাম, হেলা করিয়া গ্রহণ করিলেও তাহাতে ফল আছে যথা—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম ॥

স্কন্দ-পুরাণে প্রভাসখণ্ডে।

হে শৌনক ! সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল বেদরূপ লতার সৎফল এবং ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণনাম, যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হয়েন, তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম, মনুষ্যমাত্রকে ত্রাণ করিয়া থাকেন।

এ নাম, সঙ্কেত কিম্বা পরিহাস করিয়া বলিলেও ফল আছে যথা—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা
বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টঃ তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥

শ্রীভাগবতে ৬। ২। ১৪—১৫।

সঙ্কেতে, পরিহাসে, স্তোভে (অর্থাৎ গীত-আলাপে স্থানপূরণের জন্য) কিম্বা হেলাতে (অর্থাৎ "বিষ্ণু কি করিবে ?" এইরূপ অবজ্ঞায়) গৃহীত শ্রীকৃষ্ণের নাম, অশেষ পাপ নাশ করিয়া থাকেন। অট্টালিকাদি হইতে পতিত, পথে পদস্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদিপীড়ায় তপ্ত, দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া, অবশে "হরি" এই দুটি অক্ষর উচ্চারণ করিলে, মনুষ্য, যাতনা প্রাপ্ত হন না। (এখানে 'পুমান্" শব্দ বর্ণাশ্রমাদিনিয়মশূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।)

নলরাজা বিবিধ উপচার দ্বারা নারায়ণের পূজা কালে নারায়ণের নাম মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন যথা—

লীলয়াঽপি তব নাম জনা যে
গৃহ্নতে নরকনাশকরস্য।
তেভ্য এব নরকৈরুচিতাভী-
স্তেতু বিভ্যতু কথং নরকেভ্যঃ॥
মৃত্যু-হেতুষু ন বজ্রনিপাতাৎ
ভীতিমর্হতি জনস্ত্বয়ি ভক্তঃ।
যৎ তদোচ্চরতি বৈষ্ণব-কণ্ঠা-
ন্নিষ্প্রযত্নমপি নাম তব দ্রাক্॥

নৈষধ-চরিতে ২১ সর্গে ১৭—১৮।

যে সকল মনুষ্য পরিহাস-প্রসঙ্গে নরক-নাশক তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট নরক ভীত হইয়া থাকে, তাঁহারা নরককে ভয় করিবেন কেন ?

তোমার ভক্তজন, মৃত্যুর কারণ দারুণ বজ্রনিপাত হইতেও ভীত হন না, কারণ বজ্রপাতকালে হঠাৎ বৈষ্ণবজনের কণ্ঠ হইতে বিনাপ্রযত্নেও তোমার নাম বহির্গত হইয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।

এ নামে প্রায়শ্চিত্ত নাই; কারণ প্রায়শ্চিত্তে কর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করিতে পারে না। যেরূপ হস্তী স্নান করিয়া পুনরায় নিজ অঙ্গে ধূলি লেপন করে, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তকারীকেও পুনরায় সেই পাপে লিপ্ত হইতে দেখা যায়—

প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জর-শৌচবৎ।

শ্রীভাগবতে ৬। ১। ১০।

বেদও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"যঃ সকৃৎ পাপকং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদেনং ততোঽপরং।"

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে ৭। ৩। ৫।

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য কহিয়াছেন—

যঃ পুমান্ ধর্ম্মশাস্ত্রভীতিরহিতঃ সকৃৎ পাপকং কুর্য্যাৎ স পুমান্ ততঃ পাপাদন্যৎ এনৎ পাপং তদভ্যাসবশাৎ কুর্য্যাদেব।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রভীতিরহিত হইয়া একবার পাপ করে, সেই ব্যক্তি সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, সেই পূর্ব্বপাপের সংস্কার বশে অভ্যাসবশতঃ পুনরায় সেই পাপ করিয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাপ-কর্ম্মের জন্য অনুশোচনায় হৃদয় দগ্ধ না হইবে এবং তজ্জন্য চক্ষু দিয়া অশ্রু বহির্গত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে প্রায়শ্চিত্ত কাহাকে বলি? তদুত্তরে বলিয়াছেন যে—

"প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্"।

শ্রীভাগবতে ৬।১।১১।

জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত।

যদিও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ করিয়াছেন যে—

"তেন পাপক্ষয়মাত্র সাধনত্বেন বিধিবোধিতং কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তং"

প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বে

পাপক্ষয়মাত্র সাধনোপযোগী বিধিবোধিত কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে; তথাপি বলা যায়, প্রায়শ্চিত্ত কেবল পাপক্ষয় মাত্র করিয়া থাকে, কিন্তু সংস্কার ত্যাগ করাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ।

অতিপ্রাচীনকাল হইতে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক-কার্য্যে বৃত হইয়া আসিতেছেন। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথকে বলিয়াছিলেন—

ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ—
অথর্ব্ব-শিরসি প্রোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ॥

আমি আপনার পুত্রোৎপত্তির জন্য অথর্ব্বশীর্ষোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টি যাগ করিব। দশরথের পুত্রেষ্টিযাগ, অথর্ব্ব-বেদের বিধানানুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, রামায়ণে সে কথা লিখিত আছে।

দ্বিজাঃ সর্ব্বে সমাহূতা যজ্ঞস্থার্থেহি জাপকাঃ।
ঋগযজুঃসামাথর্ব্বান্ বৈ বেদাসুদগীরয়ন্তি যে॥
স্কন্দ, ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ ১৩ শ্লোক।

পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা॥
যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ৩১৩ শ্লোক।

অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-কার্য্যে বৃত হইতেন।

আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভির্হৌত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদগাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ।
বিষ্ণুপুরাণ ৩ অংশ ৪ অঃ ১২ শ্লোক।
বায়ু-পুরাণে ৬০ অঃ ১৮ শ্লোক।

অথর্ব্বা সৃজতে ঘোরমদ্ভুতং শময়েত্তথা।
অথর্ব্বা রক্ষতে যজ্ঞং যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরাঃ। ১।
দিব্যান্তরীক্ষভৌমানামুৎপাতানামনেকধা।
ব্রহ্মা শময়েন্নাধ্বর্য্যু র্নছন্দোগোন বহ্বৃচঃ॥
রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা তস্মাদথর্ব্ববিৎ॥
(বায়ুপুরাণ)

অথর্ব্ববেদী ঋত্বিক্ উৎপাতের সৃষ্টি করেন, এবং উপদ্রবের শান্তি করেন। অথর্ব্ববেদী ঋত্বিক্ যজ্ঞ রক্ষা করেন। অঙ্গিরা যজ্ঞের পতি। অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ দ্যুলোকের, অন্তরীক্ষের এবং পৃথিবীর নানা প্রকার উৎপাতের শান্তি করেন। ব্রহ্মা অনিষ্টের শান্তি করিতে পারেন, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী, ঋগ্বেদী ঋত্বিক্ তাহা পারেন না। ব্রহ্মা রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ, সেইজন্য অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই "ব্রহ্মা" হওয়া উচিত।

অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ হোম করিতেন।

চক্রুঃ সামর্গ্যজুর্মন্ত্রৈ র্বধ্বা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ।
পুরোহিতোঽথর্ব্ববিদ্বৈ জুহাব গ্রহশান্তয়ে।
রুক্মিণীবিবাহে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে.

বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সাম ঋগ্ যজুর্মন্ত্র দ্বারা বধূর (রুক্মিণীর) রক্ষাবিধান করিলেন, এবং অথর্ব্ববেদজ্ঞ পুরোহিত গ্রহ-শান্তির জন্য হোম করিলেন।

বেদাথর্ব্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপ-যজ্ঞ-প্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥
যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ ১০১ শ্লোক।

সুপ্রসিদ্ধ বশিষ্ঠমুনি অথর্ব্ববিদ্ ছিলেন।

সবভূব দুরাসদঃ পরৈঃ গুরুণাথর্ব্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।
পবনাগ্নিসমাগমোহয়ং সহিতং ব্রহ্মযদস্ত্রতেজসা॥
রঘুবংশ ৮ম সর্গ ৪ শ্লোক।

অথর্ব্ববেদতত্ত্বজ্ঞ মহামুনি গুরুদেব বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক (অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা) অভিষিক্ত হইয়া মহারাজ পবনাগ্নিসংযোগ-তুল্য (ব্রাহ্মক্ষাত্র-তেজ একত্র অধিষ্ঠিত হওয়ায়) শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন।

প্রতিষ্ঠাকার্য্যে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণের আবশ্যকতা আছে।

পূর্ব্বাদিকুম্ভেষু ততো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ।
পঠেয়ুঃ স্ব-স্ব-বেদাংস্তে ঋগ্বেদ-প্রভৃতীন্ শনৈঃ॥
শাতাতপ ২ অঃ ৭ শ্লোক।

পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে-স্থাপিত কলসের নিকট ঋগ্‌বেদী প্রভৃতি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, স্ব স্ব বেদ পাঠ করিবেন।

অথর্ব্বশিরসঞ্চৈব কুম্ভসূক্তমথর্ব্বণঃ।
নীল-রুদ্রাংশ্চ মৈত্রঞ্চ অথর্ব্বাচোত্তরে জপেৎ॥
গরুড়পুরাণ ৪৮ অঃ ৫৭ শ্লোক।

অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ, অথর্ব্বশীর্ষ ও অথর্ব্ব বেদোক্ত-কুম্ভসূক্ত, নীলরুদ্রমন্ত্র ও মৈত্রমন্ত্র সকল উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া জপ করিবেন।

অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ অপবিত্র নহে—

সপুত্রঃ সহ ভৃত্যৈশ্চ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনং।
গাশ্চৈবৈকশতং দদ্যাচ্চাতুর্ব্বেদ্যেষু দক্ষিণাং॥
পরাশর ১২ অঃ ৬৬ শ্লোক।

ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি, পুত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত অন্বিত হইয়া চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া একশত গাভী দক্ষিণা দিবে। ইহারা পতিত হইল পাপ-ক্ষয়ার্থ ব্রাহ্মণভোজনে কখনই এই অথর্ব্ববেদীয়ব্রাহ্মণভোজনের উল্লেখ ও দক্ষিণা-দানের কথা থাকিত না।

সামবেদোহহং দেবি ব্রহ্মা ঋগ্বেদ উচ্যতে।
যজুর্ব্বেদো ভবেদ্‌বিষ্ণুঃ মূলাধারোহথর্ব্বণঃ ॥
স্কন্দ, প্রভাসখণ্ড ১০৫ অঃ ৬২ শ্লোক।

দেবি! আমি সামবেদ, ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, বিষ্ণু যজুর্ব্বেদে এবং মূলশক্তিই অথর্ববেদ।

"ঋগ্‌যজুঃপারগো যশ্চ সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসো যাতো ব্রাহ্মণঃ পংক্তিপাবনঃ ॥
শঙ্খসংহিতা ১৩ অঃ ৭ শ্লোক।

যিনি ঋগ্বেদবেত্তা, যজুর্ব্বেদবেত্তা, সামবেদবেত্তা, অথর্ববেদবেত্তা হইবেন, সে ব্রাহ্মণ পংক্তিপাবন।

অথর্ববেদী ব্রাহ্মণের অন্ন-ভোজনে কোনও দোষ নাই

ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ভোজ্যান্না অবধ্যা দান-ভাজনং
নমস্কার্য্যাবিবর্ণেন সবর্ণেন কনীয়সা ॥
পণ্ডিতসর্ব্বস্ব—ব্রাহ্মণ-প্রকরণ।

সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণ অবধ্য ও দানের পাত্র; সকল ব্রাহ্মণের অন্নই ভোজন-যোগ্য; ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ, সকল ব্রাহ্মণকেই নমস্কারক রিবে, এবং অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ, অধিকবয়স্ক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবে।

অথর্ববেদের আচার্য্যগণ।

(১) বৃহস্পতি (২) অথর্ব্বন (৩) ভৃগু (৪) ভার্গব (৫) অঙ্গিরা (৬) আঙ্গিরস (৭) কবি উশনা (৮) শৌনক (৯) নারদ (১০) গৌতম (১১) কাত্যায়ন (১২) কর্ম্মঘ (১৩) পিপ্পলাদ (১৪) মাহকি (১৫) গর্গ (১৬) গার্গ্য (১৭) বৃদ্ধগর্গ (১৮) আত্রেয় (১৯) পদ্মযোনি (২০) ক্রোষ্টকী এই বিশজন অথর্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।

জ্যোতির্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীর-পুরাণ-পাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচন ॥
অত্রি-সংহিতায় ৩৫৭ শ্লোক।

জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণ, অথর্ববেদী ও শুকপাখীর ন্যায় অর্থ-বোধ না করিয়া পুরাণ-পাঠক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণ করিবে না।

এই বচনে "অথর্ব্বন্" শব্দের প্রকৃতার্থ না বুঝিয়া, অথর্ব্ব-বেদী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে যজ্ঞাদিতে বরণ করিবে না বলিয়া যাঁহারা মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে সবিনয়ে প্রত্যুত্তর দিতেছি যে, সূর্য্যবংশের পুরোহিত ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ ছিলেন, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণ অথর্ব্ববেদী ছিলেন; তাঁহারা যদি শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বর্জ্জিত হইয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমানকালের অথর্ব্ব-বেদী ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই শ্রাদ্ধাদিতে বরণীয় না হইতে পারেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কিরূপ তেজস্বী ছিলেন, তাহা আপত্তিকারক মহাশয়দের বুঝাইতে হইবে না। অথর্ব্ব-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদিতে বরণীয় না হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ, দেবর্ষি নারদ, সুরগুরু বৃহস্পতি অথর্ব্ববেদ পড়িতেন না। অতএব, অত্রি-সংহিতার "জ্যোতির্ব্বিদ্" শব্দ, যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে, তেমন "অথর্ব্বন্" শব্দেও অথর্ব্ব-বেদোক্ত অভিচার-কার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণকে বুঝিতে হইবে। উক্তউভয়বিধ ব্রাহ্মণ তমোগুণবিশিষ্টতাহেতু শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞে বরণীয় নহে। অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বরণীয় না হইলে পূর্ব্বোক্ত বহু শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। "জ্যোতির্ব্বিদ্" শব্দের জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ—এই অর্থ করিবার কারণ এই যে মনুবচনে "নক্ষত্রৈঃ যশ্চ জীবতি" এইরূপ লিখা আছে। অতএব, জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণও কখন নিন্দনীয় নহে। বেতন-গ্রহণপূর্ব্বক জ্যোতির্গণনা করিয়া যে ব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তিনিই নিন্দনীয় হইবেন। এবচনটীকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াও স্বীকার করেন। কেননা, শ্রাদ্ধে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় যথা—

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি যে শস্তাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
যে ব্রাহ্মণাঃ পুরাখ্যাতাঃ পাপানাং পংক্তিপাবনাঃ॥ ২১
ত্রিনাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।
যশ্চ বিদ্যা-ব্রত-স্নাতো ধর্ম্মদ্রোণস্য পাঠকঃ॥ ২২
পুরাণজ্ঞস্তথাজ্ঞানী বিজ্ঞেয়ো জ্যেষ্ঠ-সামবিৎ।
অথর্ব্বশিরসোবেত্তা ক্রতুগামী সুকর্ম্মকৃৎ॥ ২৩॥

স্কন্দপুরাণ, নাগর-খণ্ড ২১৮ অঃ উক্ত শ্লোক।

বোধহয় এখন আপত্তিকারকেরা বুঝিবেন, অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধা-দিতে বৃত হইলে দোষ হইবেনা। যদি বলেন, অথর্ব্ববেদে অভিচারকর্ম্ম আছে—তজ্জন্য উহা নিন্দনীয়, কিন্তু ভাবিতে গেলে বলিতে হয়, উহাতে দোষ হইতে

পারে না, কারণ অভিচার কর্ম্ম সামবেদেও আছে। প্রসিদ্ধ অভিচার "শ্যেনযাগ" সামবেদেই উপদিষ্ট। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সামবেদের অভিচারমন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন—

যদুক্তং সামবিধিনা সামবেদে বধাত্মকং।
তস্তৈর্দারুণৈর্ম্মন্ত্রৈর্জুহুবতো জাতবেদসং॥

স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১৬৮ অঃ ৩৬ শ্লোক।

বশিষ্ঠ অথর্ব্ব-মন্ত্রের দ্বারায় রক্ষা করিয়াছিলেন যথা—

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তেনোক্তা ততঃ সা নিশ্চলাভবৎ।
নিজমন্ত্রৈশ্চ সাতেন স্তম্ভিতাথর্ব্বণোদ্ভবৈঃ॥

স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১৬৮ অঃ ৪৭ শ্লোক।

"শুষ্কমীনমথর্ব্বান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ" এই অর্দ্ধ-শ্লোক কোন্ গ্রন্থ হইতে পণ্ডিতসর্ব্বস্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই। আবার কেহ কেহ শুষ্কমীনমশৌচান্নং এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বচনের কোন প্রামাণ্য নাই। কোন মূলগ্রন্থে এইরূপ বচন থাকিলেও "অথর্ব্ব" শব্দে অভিচার-কর্ম্মজীবী বুঝিতে হইবে। যেহেতু ভগবান্ মনু অভিচারকার্য্যকে উপ-পাতক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বিশেষ "প্রকৃতিবাদ" অভিধানে অথর্ব্বশব্দে লিখিয়াছেন—"অথর্ব্ব বিং ত্রি, রোগ, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কারণ বশতঃ অশক্ত ও অকর্ম্মণ্য।" সুতরাং তাহার অন্ন অগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

শুধু বচন-পরায়ণ হওয়া উচিত নহে, যুক্তির সন্ধানও করিতে হয়।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ।

অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণের অন্ন অভক্ষ্য হইলে বৃহস্পতি, শুক্র, বশিষ্ঠাদি মহাত্মগণের অন্ন অগ্রাহ্য হইত। আর কোন্ ঋষিই বা অথর্ব্ববেদ পাঠ করিতেন না? বেদ-পাঠে জানা যায়, সুমন্তু, অঙ্গিরা, পৈল, পিপ্‌পলাদ, নারদ, বৃহস্পতি, গর্গ প্রভৃতি অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ অভোজ্যান্ন হইলে অথর্ব্ববেদজ্ঞ আঙ্গিরস নামক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত্ত গোপগণকে অন্ন প্রার্থনা করিতে কখনই আদেশ করিতেন না।

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গ-কাম্যয়া ॥
তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মমচাভিধাম্ ॥
শ্রীভাগবত ১০ স্কন্ধ ৩।৪ শ্লোক।

পূর্ব্বোক্ত বচন-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা নিশ্চিত হইল যে অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ অন্যান্যবেদী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজ্য; ইহাদের নিন্দনীয় হইবার কোন কারণ নাই। দ্বেষকারিগণ এখন প্রকৃততত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ভ্রান্ত সংস্কার অপনোদন করিলে বিরাট্ হিন্দুসমাজের ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায় ও অসীম উন্নতি হইতে পারে। বহুশাস্ত্র-গ্রন্থে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ দ্বারা গ্রহ-যজ্ঞাদি করিবার উপদেশ আছে এবং অথর্ব্ব-বেদ ও অথর্ব্ব-বেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা আছে যথা—

বহ্বৃচো হন্তিবৈ রাষ্ট্রমধ্বর্য্যুঃ নাশয়েৎ সুতং
ছন্দোগো নাশয়েৎ অর্থং তস্মাদাথর্ব্বণো গুরুঃ ॥
বায়ু-পুরাণ।

আমরা যথাশক্তি শাস্ত্রালোচনা করিয়া বুঝিলাম যে, অথর্ব্ব-বেদী ব্রাহ্মণ কখন নিন্দনীয় নহে; তাহাদের সহিত অন্যান্যবেদী ব্রাহ্মণের সামাজিক সম্বন্ধও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ একই গায়ত্রীর উপাসক, সকলেই স্ব-স্ব-বেদোক্ত মন্ত্রে জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই চতুর্ব্বেদ পাঠ করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে। অশক্ত পক্ষেই স্ব-শাখা অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণই সন্ধ্যোপাসনার সময় চতুর্ব্বেদের ১ম চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন—ইহা ব্রাহ্মণমাত্রই অবগত আছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণমাত্রই পূজনীয়—ইহাতে ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদী সামবেদী অথর্ব্ববেদী বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। একই পদ্য-গদ্য-গানাত্মক বেদ অল্পমেধাবিদিগের উপকারার্থে ব্যাসদেব কর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া, ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদীকে যজুর্ব্বেদী সামবেদীকে, সামবেদী অথর্ব্ববেদীকে নীচ মনে করিলে বা পরস্পর বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিলে, কত পাপভাগী হইতে হইবে, তাহা, বেদনিন্দা-রত-শ্চৈব বেদনিন্দারতস্তথা। দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব তে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মসু" ইত্যাদি উশনঃসংহিতা-পাঠে বুঝিতে পারেন। আমরা সকলেই ব্রহ্মমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিলে বেদবিভাগ বশতঃ আমাদের ভিন্ন ২ ভাব হওয়া

উচিত নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অবশ্যই বুঝিবেন যে, আমরা ভিন্ন-বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত হইলেও ভিন্ন ২ রুচিসম্পন্ন ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ন্যায় কখনই ভিন্ন নহে। ভেদজ্ঞান করিলে নিশ্চয়ই পাপভাগী হইতে হইবে। আমরা কালক্রমে মোহবশতঃ অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। আসুন ব্রাহ্মণগণ! এখনও সময় আছে। পরস্পর বিদ্বেষ ভাব ভুলিয়া যান, পরস্পর স্নেহ, ভক্তি, সামাজিকতা প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হউন। দেখিতে পাইবেন, সমস্ত পৃথিবীর লোক আবার ভারতজননীকে রত্নগর্ভা, জ্ঞানবিজ্ঞানমণ্ডিতা নবগৌরবময়ী দেখিয়া করুণকণ্ঠে স্তুতি করিবে। আবার সেই সামধ্বনিতে ভারতের আশ্রম প্রতিধ্বনিত হইবে। ভ্রাতৃগণ! ঈর্ষা দ্বেষ ভুলিয়া যান। আমরা যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই, কল্পিত-শ্রেণীবিভাগে আমাদের কি হইবে? আমাদের ত্রিকালদর্শী সংযমী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্র আলোচনা করুন, দেখিতে পাইবেন, আমরা কি ছিলাম—এখন কি হইয়াছি! আমি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আমি উৎকলশ্রেণীর, আমি বৈদিকশ্রেণীর, আমি মধ্যমশ্রেণীর, আমি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অর্থশূন্য বাক্যে আত্মশ্লাঘা করিবেন না! একটু ভাবিয়া দেখুন, রাঢ়ীয় শ্রেণী প্রভৃতি শব্দের কোন শাস্ত্রীয় অর্থ নাই। সকলেই সকল কার্য্য করিতেছেন—সকলেই স্বধর্ম্ম হইতে কিছু ২ নামিয়া আসিতেছেন। তবে এত অহঙ্কার—এত স্পর্দ্ধা কিসের জন্য? আপনাদের যজ্ঞোপবীতটী ভিন্ন আর কি আছে, কিছু দেখাইতে পারেন কি? "ক্ষমা দয়া দমোদানং ধর্ম্মঃ সত্যং শ্রুতং ঘৃণা। বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণ-লক্ষণং॥" উক্ত লক্ষণের কিছু রাখিয়াছেন কি? একটু ভাবিয়া দেখুন। এখন প্রশান্ত হইয়া যাহাতে সকল ব্রাহ্মণের উন্নতি হয়, তাহাই করুন। পরস্পর বিদ্বেষভাব থাকিলে কাহারও উন্নতি হইবে না। একদল অপরদলকে বাধা দিবে, একদলের নিশ্চয় অবনতি ঘটিবে, তাহাহইলে ব্রাহ্মণের উন্নতি হইবে না বরং অবনতি হইবে! আমি বেশী কিছু বলিতে চাহিনা, কেবল এই মাত্র বলি যে, আপনারা সকলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করুন। বিদেশ পর্য্যটন করুন। পরস্পর বিদ্বেষ ভাব ভুলিয়া যান। পরস্পর সৌহার্দ্দস্থাপন ও সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করুন, অচিরে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। নিতান্ত অশক্তপক্ষে বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণনিন্দা করিবেন না। ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য, ব্রাহ্মণ নারায়ণস্বরূপ। আলোক দেখিতে যদি ভালই বোধ না হয়, তবে পাদপ-কোটর-গত পেচকের ন্যায় নীরবে স্বগৃহকোটরে বসিয়া থাকুন।

নিতান্ত চুপ করিতে না পারিলে সে গৃহমধ্যেই পেচকোচিত কর্কশশব্দ করিতে পারেন। আমরা আর পেচকের মত ঘোর অন্ধকারে থাকিতে চাহি না। আমরা মহর্ষিদিগের শাস্ত্রের শাসনে থাকিতে ভালবাসি—সেইজন্য বলিতেছি, "আমরা চতুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ এক—কখনই ভিন্ন নহে, ভিন্ন হইতে পারি না।" ¶

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ

কামরূপ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তম্)

ক্ষোভকাখ্যান্মহাশৈলাদৈশান্যাং পর্ব্বতোত্তমঃ।
তুঙ্গঃ সন্ধ্যাচলোনাম বশিষ্ঠোযত্র শপ্তবান্॥
নিমিনামন্তুরাজর্ষেঃ শাপাদ্ ব্রহ্মসুতঃ পুরা।
বশিষ্ঠোহশরীরোহভূত্তচ্ছাপাচ্চ নিমিস্তথা॥
ততোব্রহ্মোপদেশেন নির্জ্জনে কামরূপকে।
সন্ধ্যাচলে তপস্তেপে তস্য বিষ্ণুরভূত্তদা॥
অমৃতান্যবতার্য্যাশু কুণ্ডং কৃত্বা গিরেস্তটে।
তত্র স্নাত্বাচ পীত্বাচ শরীরং প্রাপ পূর্ব্ববৎ॥
তস্মাদমৃতকুণ্ডাচ্চ সন্ধ্যা নাম নদী বরা।
নিঃসৃতা তত্রচাপ্লুত্য চিরায়ুরগদোভবেৎ॥

ক্ষোভকনামক মহাশৈলের ঈশানকোণে অত্যুচ্চ সন্ধ্যাচল অবস্থিত। সেখানে থাকিয়া বশিষ্ঠদেব উগ্রতারা প্রভৃতিকে অভিশাপ প্রদান করেন। *

¶ মেদিনীপুরজেলায় বহু অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহারা আচার-ব্যবহারে অন্যবেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন নহেন, অথচ, অন্যবেদী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করেন, এরূপ ব্যবহার যে অসঙ্গত—এ প্রবন্ধে তাহাই দেখান হইল। লেখক

* কামরূপের প্রভাবে পাপীতাপী সকলেই স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলে যমের অধিকার লুপ্ত হওয়ায় তাহার প্রতিকারকল্পে মহাদেবের আদেশমতে উগ্রতারা কামরূপ হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া কামরূপকে অরণ্যে আবৃত করিয়া রাখেন। সেই সময় বশিষ্ঠদেবকেও বামহাত দিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়ায় বশিষ্ঠদেব উগ্রতারাকে অভিশাপ দেন যে, তুমি যেমন আমাকে বামহাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিলে, তেমনি তুমি বামভাবে পূজিতা হইবে। বশিষ্ঠ মহাদেবকেও ভস্মাস্থি-ভূষিত ম্লেচ্ছবৎ হইতে শাপ দেন ও তত্রত্য সেবাইত ব্রাহ্মণগণকে ম্লেচ্ছ হইতে এবং ঐ প্রদেশকে ম্লেচ্ছাক্রান্ত হইতে অভিশাপ দেন। (কালিকাপুরাণ)।

পূর্ব্বকালে রাজর্ষি নিমির শাপে বশিষ্ঠ দেহহীন হন এবং বশিষ্ঠের শাপে রাজর্ষি নিমিও দেহহীন হন। পরে বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার উপদেশ মতে নির্জ্জন কামরূপ-প্রদেশে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহার দর্শন ও বরপ্রভাবে ঐখানে একটি অমৃত-কুণ্ড সৃষ্টি করেন। পরে সেইজলে স্নান ও সেই জলপান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দিব্য দেহ লাভ করেন। সেই অমৃতকুণ্ড হইতে সন্ধ্যানাম্নী একটি নদী উৎপন্ন হয়। উহার জলে স্নান করিলে মানব দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হয়।

কামাখ্যাপাহাড়ের মূল-দেশ হইতে বশিষ্ঠাশ্রম ৯ মাইল, ও গৌহাটী হইতে ৭ মাইল। গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলে গিয়া সেখান হইতে পদব্রজেই যাইব—সঙ্গে একটি লোটা, কম্বল ও একটি লণ্ঠন লইব স্থির করিলাম। কারণ শুনিলাম, ওখানে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে একরাত্রি বাসকরা আবশ্যক। আরও শুনিলাম, সেখানে বা তাহার নিকটে কোন লোকালয় নাই—একজন সন্ন্যাসী আছেন মাত্র। খাদ্যাদিও কিছু মিলে না। যখন যাত্রীসমাগম হয়, তখন সময় সময় একজন পাণ্ডাও গিয়া থাকে। আশ্রমের একক্রোশ দূরে "বেল-তলার হাট" বলিয়া একটী হাট আছে, তথায় একখান দোকানও আছে। সেখানে চা'ল ডা'ল পাওয়া যায়, তাহাই কিনিয়া লইয়া যাইতে হইবে। পাঁচ ছয় টাকা ব্যয় করিলে গৌহাটী হইতে ঘোড়ার গাড়ীও মিলে। আমি পদব্রজে যাওয়াই স্থির করিলাম। গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলে যাইতে হইবে। ১১৷০ টায় ট্রেণ; সকাল সকাল আহার করিতে বসিলাম। এমন সময় আমার পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন যে, "আমাদের পাশের বাটীতে আর কয়টি বাঙ্গাল যাত্রী আসিয়াছে, (ইহারা ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয়কেই "বাঙ্গাল" বলে, তবে বাঙ্গালী হচ্ছে "কোয়লা বাঙ্গাল" অর্থাৎ কাল বাঙ্গাল আর ইংরাজ হচ্ছে "বগা বাঙ্গাল" অর্থাৎ সাদা বাঙ্গাল। এরূপ ভাষা প্রাচীন, বালক ও স্ত্রীলোকেই ব্যবহার করে। নব্য-শিক্ষিতেরা ইংরাজকে ইংরাজ ও বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীই বলিয়া থাকে।) তাহারা গৌহাটীতে গাড়ী আনিতে গিয়াছে। তাহারাও আহারান্তে বশিষ্ঠাশ্রম দেখিতে যাইবে। আপনিও অংশ-মত ভাড়া দিলে সেই গাড়ীতেই যাইতে পারিবেন।" আমি নানা বিষয় ভাবিয়া শেষে তাহাতেই সম্মত হইলাম। আহারান্তে সেই যাত্রীগণের বাসায় গিয়া শুনিলাম—তাঁহাদের যিনি গাড়ী আনিতে গিয়াছেন, তিনি তখনও আসেন নাই; আসিলেই তাঁহারা রওনা হইবেন এবং আশ্রম দেখিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই পুনরায় বাসায় ফিরিবেন। ইচ্ছা করিলে অংশমত ভাড়া দিয়া তাঁহাদের গাড়ীতেও যাইতে পারি। আমি অংশমত ভাড়া দিতে সম্মত

হইয়া বলিলাম—"পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে আমার ঢের সময় লাগিবে। আমি ধীরে ধীরে নামিয়া পর্ব্বতের মূলদেশে বসিয়া থাকিব, গাড়ী আসিলে যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।" তাঁহারা বলিলেন—"বেশ! তাহাই হইবে।" তখন আমি ভাবিলাম যে, যখন গাড়ীতেই চলিলাম, সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিব, তখন আর লোটা কম্বল লণ্ঠন ইত্যাদির প্রয়োজন কি? ইহা মনে করিয়া বালাপোষখানা কাঁধের উপর ফেলিয়া ছাতি লাঠি লইয়া রওনা হইলাম। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে সামান্য বাকী থাকিতে দেখিলাম, যাঁহারা বশিষ্ঠাশ্রমের জন্য গাড়ী ঠিক্ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন। শুনিলাম, অতিরিক্ত বেলা হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা কল্য প্রত্যূষে গাড়ী আসিবার বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহারা অদ্য আর যাইবেন না। তাঁহারা পাঁচ জন আছেন—গাড়োয়ান্ তাহাই লইতে চায় না, আমি হইলে ছয় জন হইবে, সুতরাং তাহাত কখনই লইবে না! শুনিয়াই আমার চক্ষুস্থির! কি করা যায়? পুনরায় এই এক মাইল পথ পর্ব্বতারোহণ করিয়া লোটা কম্বল প্রভৃতি আনয়ন করিতে হইলে সে দিন আর যাওয়া ঘটে না। নানা চিন্তা করিয়া ভাবিলাম, সেখানে যখন একজন সন্ন্যাসী আছেন এবং লোকালবোর্ডের একখানা পাকা ঘরও আছে, তখন এত ভাবনাই বা কিসের? রেল-ষ্টেশনেও ত কত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছি! এখানে না হয় তাহাই ঘটিবে। আর ফিরিয়া যাইব না। যা করেন মা সর্ব্বমঙ্গলা, তাহাই ঘটিবে—এই মনে করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বাহির হইলাম। রেলে গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে "শিলং রোড" ধরিয়া বরাবর হাটিয়া যাইতে লাগিলাম। যদিও আহারান্তেই রওনা হইয়াছি (ঠিক মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত, মার্ত্তণ্ডদেব সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছেন—তাহার তাপে বৃক্ষরাজি সমুদয় দগ্ধ হইতেছে, কোন বৃক্ষে একটি পত্র নাই, কোথাও একবিন্দু ছায়া নাই, উলঙ্গ প্রকৃতি যেন খাঁ খাঁ করিতেছে—) তথাপি দুইদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সর্পগতিতে প্রসর্পণশীল অভ্রভেদী পর্ব্বত সমূহ, তদুপরি স্থানে স্থানে বিচরণশীল চঞ্চল কুরঙ্গদল, কোথাও বা দলবদ্ধ বন্য কুক্কুট, পেরু ও অন্যান্যজাতীয় পক্ষীকুল দেখিতে দেখিতে আনন্দে সকল দুঃখ ভুলিয়া চলিতে লাগিলাম! ৩॥০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটি শুষ্ক-তরু-মূলে বিশ্রাম করিতেছি—এমন সময় জটাজুটধারী গৈরিকপরিহিত রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া বঙ্গভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আমি বশিষ্ঠাশ্রমে কোন্ পথে যাইব?

আমি। বসুন্ আমি সেইখানেই যাইব। আপনার আশ্রম কোথায় ?

সন্ন্যাসী। গারোহিল্ শান্তি-আশ্রম।

আমি। আপনি কি নিগমানন্দের শিষ্য ?

সন্ন্যাসী। হাঁ।

স্বামী নিগমানন্দের সহিত কোন সময়ে কোন কারণে আমার পত্র-ব্যবহার ছিল। "শান্তি আশ্রমের" নাম শুনিয়াই সন্ন্যাসীকে নিগমানন্দের শিষ্য বলিয়া অনুমান করিয়া লইলাম। নবাগত সন্ন্যাসীর নাম স্বামী যোগানন্দ। ইঁহার জন্মস্থান ময়মনসিংহ জেলায়। ইনি একজন জমিদারের পুত্র, জজকোর্টের প্লীডার। পিতা নাই, মাতা আছেন এবং একটি অল্পবয়স্কা কন্যা ও স্ত্রী আছে। স্বামী নিগমানন্দের সঙ্গ-গুণে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় স্ত্রী ও মাতার অনুমতি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুর আদেশে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের চারি মঠ ঘুরিবেন। স্বামীজিকে পাইয়া হৃদয়ে খুব বল হইল। মা সর্ব্বমঙ্গলার অপার কৃপা ভাবিয়া উদ্দেশে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামী বলিলেন, "তবে এখন উঠুন—হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্য-পূর্ণ পার্ব্বত্য পথ; দিন থাকিতে থাকিতেই আশ্রমে যাওয়া কর্ত্তব্য।" আমিও বলিলাম—"চলুন, আপনাকে যখন পাইয়াছি—তখন আর ভয় নাই।" অতঃপর উভয়ে উঠিলাম। আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, ঠিক্ সেখান হইতে ডান দিকে আর একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়াছে। তদ্দর্শনে স্বামীজি বলিলেন, "আমি শুনিয়া আসিয়াছি—কিয়দ্দুর গিয়া একটি কাঁচা রাস্তা পাওয়া যাইবে—সেই রাস্তায় যাইতে হইবে। এই ত একটি কাঁচা রাস্তা দেখা যাইতেছে।" আমি বলিলাম—"স্বামী অভয়ানন্দ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, ৭ মাইল ছাড়াইয়া কাঁচা রাস্তায় যাইতে হইবে।" স্বামী বলিলেন "সেকি! আশ্রম পর্য্যন্ত মোট ৭ মাইল পথ। একজনকে জিজ্ঞাসা করা যাক্।" স্বামীজির আসামী ভাষাও কিছু কিছু জানা ছিল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—এখান হইতেই কাঁচা রাস্তায় যাইতে হইবে। তখন আমি ভগবানের দয়া ভাবিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঠিক্ ঐখানে যদি সন্ন্যাসীর দেখা না পাইতাম বা ঐস্থান ছাড়াইয়া গিয়া বিশ্রাম করিতে বসিতাম, তাহাহইলে ৭ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াই আমি পথ জিজ্ঞাসা করিতাম। তখন যেদিক্ যাইতে চাহিতাম, তাহাতেই রাত্রি হইয়া পড়িত, তখন মহাবিপন্ন হইতে হইত। বুঝিয়াই বুঝি মা সর্ব্বমঙ্গলা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সঙ্গী মিলাইয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গ লইয়া স্বামীজির সহিত নানা

সদালোচনা করিতে করিতে মহানন্দে গমন করিতে লাগিলাম। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অরণ্যের নিবিড়তা, পথের সঙ্কীর্ণতা ও পর্ব্বতের উচ্চতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বৃহৎ বৃহৎ শাল, সেগুণ, বট, অশ্বত্থ, রবার, ভূর্জ্জপত্র ও নানাজাতীয় অজ্ঞাত-নামা বৃক্ষরাজিতে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন! কোনও কোনও স্থানে পুঞ্জীকৃত গুল্মজাতীয় বৃক্ষ আমূলপুষ্পিত হইয়া সুগন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিতেছে—তাহার মধ্যে নানাজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিকুল কলধ্বনি-সহকারে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে! কোথাও বা বেতসীকুঞ্জমধ্যে অজ্ঞাতনামা কীট, কর্ণ-কঠোর ধ্বনিকরিয়া ভীতি উৎপাদন করিতেছে! কোথাও বা—সুরসিক ভ্রমরকুল পুষ্পবতী বনলতিকার কর্ণমূলে গুণ গুণ স্বরে প্রেমের গান গাহিতেছে। কোথায় বা বৃহদায়তন শাখামৃগগণ অশোককানন-দলনের পুনরভিনয় করিতেছে। কোথায় বা নাগ-কেশরকুঞ্জ দিগন্তবিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে! এইরূপে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অরণ্য এত নিবিড় হইতে লাগিল যে, সেই মধ্যাহ্নকালেও প্রদোষ-কালের ন্যায় অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। তখন আমরা একটি পাহাড় ভেদ করিয়া চলিতেছি। সেই পাহাড়ের উপত্যকায় দেখিলাম, প্রচুর আনারসের গাছ জন্মিয়া রহিয়াছে, গাছগুলি রক্তবর্ণ। স্থানে স্থানে কদলীকুঞ্জও দেখিতে পাইলাম। বেলা তখন অপরাহ্ণ। গৌহাটী হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত মোট ৭ মাইল পথ। বেলা ১২টার সময় গৌহাটী হইতে বাহির হইয়াও মাত্র ৬ মাইল আসিয়াছি। যদিও ইহার মধ্যে বেলা অপরাহ্ণ হওয়ার কথা নহে, কিন্তু আমরা যেখা-নেই সৌন্দর্য্যের আতিশয্য দেখিয়াছি, সেখানেই দীর্ঘকাল বসিয়া তাহা উপভোগ করিয়াছি—তাই এই ৬ মাইল পথ আসিতে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম। অনুমান আরও অর্দ্ধ মাইল পথ অগ্রসর হইয়াছি—এমন সময় কে যেন অতর্কিতভাবে শব্দময়ী সুধাধারায় আমাদের শ্রবণ-বিবর পুরিয়া দিল। আ-মরি, মরি! সে স্বর-লহরী যেন শ্যামের বাঁশরী-সম—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"—তখন আকুল-প্রাণে শব্দানুসরণে আরও দ্রুত ছুটিতে লাগিলাম। যতই নিকটে যাইতে লাগি-লাম, ততই সেই শব্দ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর বোধ হইতে লাগিল। আর একটু অগ্রসর হইয়াই দেখি—দুইদিকে দুইটি পথ গিয়াছে। একটি পথ ভেদ করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা; তাহার উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। অপর পথে নদীপার নাই। এখন কোন পথে যাই? সেখানে জনপ্রাণী নাই, আমরা উভয়েই অপরিচিত! বহু চিন্তা করিয়া শব্দ ও

স্রোতের উপর লক্ষ্য করিয়া সেতু পার হইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। সেতু পার হইয়া একটি অত্যুচ্চপর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিয়া তথাকার অরণ্যের ভীষণতা দেখিয়া স্বামীজির প্রাণে কি হইল জানিনা—আমার কিন্তু একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন আর সেই পূর্ব্বশ্রুত স্বরলহরীকে বংশীধ্বনি বলিয়া মনে হইল না! উহা যেন বলভদ্রের সপ্তপাতালভেদী শৃঙ্গরব বলিয়াই মনে হইতে লাগিল! যাহোক্ আমরা ভয়ে ভয়ে দ্রুত অগ্রসর হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম—একটি সন্ন্যাসী মৃত্তিকার বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তন্নিম্নে ধূনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। বেদীর উপর একখানা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত রহিয়াছে। সন্ন্যাসী আমার সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীকে সমাদর করিয়া বেদীর উপর বসাইলেন ও আমাকে সম্মুখসংলগ্ন গৃহবারান্দায় বসিতে অনুমতি করিলেন। আমি তথায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া, যেখানে আমার কানাই বলাই শিঙ্গা-বেণু বাজাইতেছিলেন, সেইখানে ছুটিয়া গেলাম। যে ভীমকান্ত দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। সে স্থানটি যেন কবিত্বমাখা। যে একান্ত মূঢ়, সেও যেন সেই স্থানের প্রভাবে মহাকবি হইতে পারে! যে একান্ত নীরস, সেও যেন সরস না হইয়া পারে না! যাহার হৃদয়ে কোন ভাব নাই, তাহার হৃদয়ও সেই বশিষ্ঠপ্রস্রবণবৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যে একান্ত নাস্তিক, সেও বোধহয় ক্ষণকালের জন্য আস্তিক না হইয়া পারে না! দেখিলাম, সেই শৈলমালা ভেদ করিয়া তিনটি স্থূল জলধারা পৃথগ্‌ভাবে নিপতিত হইয়া সবেগে ধাবিতা! পাষাণোপরি বেগে পতনজনিত একরূপ প্রচণ্ড শব্দ হইতেছে। আবার কোনও ধারা পাষাণকুহরে বেগে প্রবেশ করিয়া শ্রুতি-রসায়ন কুলু কুলু ধ্বনি করিতেছে। কোনও ধারা বা গম্ভীরগহ্বরে প্রবেশ করিবার জন্য গহ্বরবাসী পবনদেবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধাইয়াছে—তাহাতে একরূপ জীমূতমন্দ্রধ্বনি শুনা যাইতেছে। পবনদেবও যেন সেই তাণ্ডবিনীর নিকট পরাজিত হইয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে নিজের ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন। এইরূপে সেই অট্টহাসিনী ত্রিভুবনবিজয়া পবনদেবকেও পরাজিত করিয়া বিজয়শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে পাষাণ হইতে পাষাণান্তরে লাফাইয়া পড়িতেছে—আর ঘাত-প্রতিঘাতে ফেনিল হইয়া চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া পড়িতেছে! আ-মরি মরি! যেন সেই ঘোরনাদিনীকে রণবিজয়িনী দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে দিব্যাঙ্গনাগণ হুলাহুলি দিয়া লাজ ও কুসুম বর্ষণ করিতেছেন! তখন আমি কবিকুলশেখর ভবভূতির——

——"কুঞ্জেষু গদ্‌গদনদদ্‌গোদাবরীবারয়——

ইত্যাদি মনোহর শ্লোকটিকে মূর্ত্তিমান্ দর্শন করিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আলোচনা।

(তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ)

শ্রীমৎ তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের উদ্দেশ্য জগতের অভ্যুদয়—সমগ্রমানবজাতির কল্যাণ। আর সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায় 'ধর্ম্ম।' তাঁহার মতে "শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, অস্ত্রবল, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি যাহা কিছু লৌকিক সাধন আছে, তৎসমুদয় লোকরক্ষার প্রকৃত উপায় নহে, একের রক্ষণ এবং অপরের ধ্বংস তাহার ফল।" তর্করত্ন মহাশয়ের কথার মধ্যে গূঢ় ভাব আছে বোধহয়। শিল্পবাণিজ্যাদি একদিকে ভাল, অন্যদিকে মন্দ; তাহাদের দ্বারা কাহারও উপকার, কাহারও বা অপকার হয়, সুতরাং ওগুলি দ্বারা জগতের খাঁটী মঙ্গল হয় না—একথা বুঝিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম দ্বারা কি জগতে চিরকাল খাঁটী মঙ্গলই হইয়া আসিয়াছে? ধর্ম্মের জন্য জগতে যে রক্তপাত ও প্রাণপাত হইয়াছে, তাহা কি তর্করত্নমহাশয়ের মতে মঙ্গলের মধ্যে গণ্য হইবে! এক প্রকারের মঙ্গলের ধারণা কাহারও কাহারও মনে আছে, শুনাযায়। তাঁহারা বলেন "ধর্ম্মের জন্য যাহারা মরে, তাহাদের মরণই মঙ্গল।" তর্করত্ন মহাশয়ও কি তাহাই বলিবেন? বোধহয় না। একটু পূর্ব্বেই তিনি শিল্প বাণিজ্যাদি ব্যাপারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে "কতজাতি জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে" অতএব শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি লোকরক্ষার যথার্থ সাধন নয়, বলিয়াছেন! লোকরক্ষার সাধনের মধ্যে যে ধ্বংসলীলা বা "আগাছা উপড়াইয়া ফেলা' আছে বা থাকে, একথা ত তিনিই নিজেই বলিয়াছেন! তাঁহার অভিপ্রেত যথার্থ সাধন ও অযথার্থ সাধন, উভয়েরই মূল্য কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা একরূপ—একথা তিনি না মানিতে পারেন, কিন্তু ইহার ভ্রান্ততা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। খাঁটী ভাল, খাঁটী মন্দ, সংসারে কি আছে, আমরা জানিনা। ভালমন্দ-ভাবটাই আপেক্ষিক। তর্করত্ন মহাশয় 'লোকরক্ষা' বলিতে কি বুঝেন জানি না। তবে আমরা স্থূলবুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি, 'লোকরক্ষা' করিতে গেলে, অন্য কিছুর 'বিনাশ'ও করিতে হয়। নদীর কূল রক্ষা করিতে গেলে স্রোতের বল বা বেগ নষ্ট করিতে হয়। একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অসুরেরা মন্দ, তাঁহাদের বিনাশ করিয়া দেবতারা মঙ্গলই করিয়াছিলেন। অন্যদিক্ দিয়া দেখিলে, অসুর থাকাও দরকার, কারণ দেবতার অধঃপতন-নিবারণের অন্য ঔষধ নাই। আজ

যাহা মঙ্গল মনে হয়, ২।৪ দিন পরে তাহা অমঙ্গল মনে হইতে পারে। তর্করত্নমহাশয় বড় বড় কথা বলিতে গিয়া প্রহেলিকার অবতারণাই করিয়াছেন। একটী কথা বুঝি নাই। 'কত জাতি লুপ্ত হইয়াছে' একথা তর্করত্ন মহাশয় বলিতে পারেন কি? তিনি যে নৈয়ায়িক ও অদ্বৈতবাদখণ্ডনকারী। তাঁহার কাছে 'জাতি' যে নিত্য পদার্থ! জাতি অর্থে জাতিমান্ বুঝিলেও গোল। কারণ, সে ক্ষেত্রেও 'জাতি' বলিতে কি তিনি 'ক্যাল্‌ডীয় আসিরীয়' ইত্যাদি অথবা "ককেসীয় মঙ্গোলীয়" প্রভৃতি বুঝেন, না "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি" বুঝেন? খাঁটী হিন্দুরা 'জাতি' বলিতে ব্রাহ্মণাদি বুঝেন। তাহার কোন্‌টী বা কোন্‌গুলি যে শিল্পবাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কবে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা তর্করত্নমহাশয় বলেন নাই। তর্করত্ন মহাশয় খাঁটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কিন্তু 'জাতি' শব্দটী তিনি শাস্ত্রীয় অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি, তর্করত্নমহাশয় 'ধর্ম্মসিদ্ধান্ত' নামে এক উপাদেয় ধর্ম্ম-পুস্তক লিখিয়াছেন। অভিভাষণে দেখিতেছি, তাঁহার মতে 'ভগবদ্বাক্য ও ঋষিবাক্যে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট তাহাই ধর্ম্ম।' বেদ ও তন্ত্র ভগবদ্বাক্য, স্মৃতি এবং পুরাণ ঋষিবাক্য। স্মার্ত্ততন্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্র স্মৃতিমধ্যেই পরিগণিত।" এখানে বুঝা গেল, 'ধর্ম্ম' অর্থ হিন্দুর বেদ তন্ত্র স্মৃতি পুরাণাদিতে উপদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা কি বুঝিব, বাইবেল, জেন্দ্ অবেস্তা, কোরাণ প্রভৃতিতে অধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে? এই উপদেশ তর্করত্ন মহাশয়ের উপযুক্ত হইয়াছে কি? যদি বলা যায়, এখানে হিন্দুধর্ম্মের কথাই হইতেছে, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, জগতের অভ্যুদয়—সমগ্র মানব-জাতির কল্যাণ 'হিন্দুধর্ম্ম' দ্বারা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। জগতে যে সমস্ত জাতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অধিকারী নহে, হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা তাহাদের মঙ্গল সাধন কিরূপে হইবে, তাহা তর্করত্ন মহাশয়ই জানেন! তর্করত্ন মহাশয় ইহার পরে বলিয়াছেন, মানবের প্রকৃতিভেদমূলক জাতিভেদের কথা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রধান। অতি সূক্ষ্ম জটিলতত্ত্বে অভ্রান্তভাবে সত্বর বুদ্ধি-প্রবেশের ক্ষমতা, শাস্ত্রে বিশ্বাস, গুরুজনে ভক্তি, ভগবন্নিষ্ঠা, অসৎকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, সত্যবাদিতা, ক্ষমা, সদাচার, সন্তোষ, সদাপ্রফুল্লতা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণদম্পতির পুত্ররূপে উৎপত্তি, দৈহিক সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যিনি এই দ্বিবিধ সত্ত্বগুণে সুশোভিত, তিনি মানব প্রধান মুখ্য ব্রাহ্মণ।

জন্মানুসারে জাতি-নির্ণয় ও গুণ-কর্ম্মানুসারে জাতি-নির্ণয়—এই দুই মতের সামঞ্জস্য করিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, গুণকর্ম্ম চাই, আবার ব্রাহ্মণ-দম্পতীর

পুত্র হওয়াও চাই, তবেই 'মুখ্য' ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। যদি সাত্ত্বিক গুণ-কর্ম্ম না থাকে, শুধু ব্রাহ্মণ-দম্পতী হইতে জন্মলাভ থাকে, অথবা যদি গুণ-কর্ম্ম থাকে, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মলাভ না থাকে, তবে তিনি 'মুখ্য' ব্রাহ্মণ হইবেন না, 'গৌণ' ব্রাহ্মণ হইবেন—এরূপ ইঙ্গিত ইহাতে পাওয়া যায় না কি? পাছে ব্রাহ্মণ-দম্পতীর পুত্র নহেন এরূপ কেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান হইয়া ব্রাহ্মণ অন্ততঃ গৌণ ব্রাহ্মণ হইতে চাহেন এই ভয়ে তর্করত্ন মহাশয় 'মুখ্য ব্রাহ্মণ' বলিয়াই চুপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয় অনেকবার গড্ডালিকাপ্রবাহে পতিত হইয়াছেন, ক্রমে তাহা দেখাইব। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ধর্ম্ম-কর্ম্ম। মেদিনীপুরের রয়াল-গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পাণ্ডা ও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাণ্ডা মহাশয়দ্বয় নিজ ভবনে বিগত ৬ আষাঢ় চারিটী শিব-প্রতিষ্ঠা ও দুইটী তুলা-পুরুষ-দান সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই ব্যাপারে নানাস্থানের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন, সামাজিক-ভোজন, দরিদ্র-ভোজন ও দান-কর্ম্ম সমারোহসহকারে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ব্যয়-বহুল ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমে বিরল হইতে চলিয়াছে। এ সময় যাঁহারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজের ধন্যবাদার্হ।

সৎকর্ম্ম। বড়লাট্ সভার অতিরিক্ত সদস্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ এম্ এ বি এল্ মহাশয় উৎসৃষ্ট বৃষ-রক্ষার্থে এক বিধান প্রণয়ন প্রয়োজন মনে করিয়া উহার পাণ্ডুলিপী বড়লাট্ সভায় উপস্থাপিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। উৎসৃষ্ট বৃষের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিলে, যেমন একদিকে গোকুলের উন্নতি হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার নিরুপদ্রব হইতে পারে। বর্ত্তমানে বৃষের দুরবস্থা-দর্শনে অনেক সহৃদয় মহাত্মা বৃষোৎসর্গ করিতে ইতস্ততঃ করেন। বৃষ-রক্ষার্থে মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

সুসংবাদ। বর্দ্ধমান—কাঁকসা-গ্রামের আয়মাদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ আব্দুস্ সর্দ্দার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার যে প্রজা বঙ্গীয়-সৈন্যদলে যোগদান করিবে, তাহাকে বংশানুক্রমে খাজনা দিতে হইবে না। সুসংবাদই।

আত্মহত্যা। সংবাদপত্রে প্রকাশ 'বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের' সৈনিক "পরম" আত্মহত্যা করিয়াছে। রাত্রিতে সে পাহারায় ছিল। তাহার তদেহের নিকটে বন্দুক পাওয়া যায়। বন্দুকের একটী "গুলি" ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্যগুলি ঠিক্ আছে দেখা যায়। ভগবান্ এ পাপ-বুদ্ধি দিলেন কেন, তিনিই জানেন।

ভূমিকম্প। গত ২২ জুন প্রাতঃকালে দিল্লীতে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।


FOR KING & COUNTRY

ডিস্পেপসিয়া রোগের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ।

অম্লশূল-চূর্ণ।

বা

ডিস্পেপসিয়া পাউডার। (Dyspepsia Powder)

অধিকাংশ বাঙ্গালী বিশেষতঃ যাঁহাদের মস্তিষ্কের পরিচালনা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহারা প্রায়ই ডিস্পেপসিয়া রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং অনেকে আত্মীয় স্বজনকে দুঃখে ভাসাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু দেশীয় ভেষজ ভাণ্ডারলব্ধ এই অমূল্য ঔষধ নিয়মমত সেবন করিলে কাহারও ডিস্পেপসিয়া রোগে কষ্ট পাইতে হইবে না।

এই মহৌষধ বালক, বৃদ্ধ, যুবা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অম্ল (Acidity) শূল-বেদনা (Colic pain) অজীর্ণ (Indigestion) মলকুণ্ঠতা (Constipation) ইত্যাদি রোগ অতি অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ হইয়া থাকে।

ডিস্পেপসিয়া রোগ হইতে অন্যান্য যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ (Albu menaria) অণ্ডলালিক স্রাব, বহুমূত্র (Diabetes) পিত্তজনিত শিরঃপীড়া (Bilions Headache) হৃৎকম্পন (Palpitation of the heart) ইত্যাদি রোগও অতি অল্প দিনে আরোগ্য হয়।

স্বাভাবিক শরীরে ব্যবহার করিলেও ইহা দ্বারা ক্ষুধাবৃদ্ধি, আহারে রুচি, শরীরে পুষ্টি কান্তি ও লাবণ্য বৃদ্ধি হয়।

২ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে ঔষধের উপকারিতা বুঝা যাইবে। পুরাতন রোগীর পক্ষে অন্ততঃ দুই মাস ঔষধ-সেবনের প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত বহু রোগী এই ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করায় জনসাধারণের পরীক্ষার জন্য ইহা প্রচার করা হইল। ব্যবস্থাপত্র ঔষধের মাত্রা, অনুপান, খাওয়ার বিধি ও পথ্যের নিয়ম ঔষধের সহিত প্রেরিত হয়।

প্রতি ১০ দিবস সেবনোপযোগী ঔষধের মূল্য ২ দুই টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ইত্যাদি ।০ চারি আনা। মোট ২।০ দুই টাকা চারি আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ঔষধ পাঠান হয় না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান যায়।

যশোহরের খ্যাতনামা প্রবীণ উকিল বাবু মন্মথ দাশ গুপ্ত বি, এল, বলেন—
আমি বহুদিন যাবত উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে নিতান্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, Dyspepsia Powder ৭ দিন ব্যবহারেই অনেক উপকার পাইয়াছি।

শ্রীরসিকলাল চক্রবর্ত্তী, দারোগা সাপদিয়া থানা বলেন—That the medicine you were kind enough to give me has done me much good * * * * that is no doubt, a good specific for dyspepsia.

প্রাপ্তিস্থান।

কলিকাতার এজেন্ট—
শ্রীযুত যাদবচন্দ্র রায়।
৯।১০ ক্যানাল ইষ্ট রোড, উল্টাডাঙ্গা
(কলিকাতা)

যশোহরের এজেন্ট—
শ্রীকালীগোপাল দাস
হিন্দু-পত্রিকা আফিস।
(যশোহর)

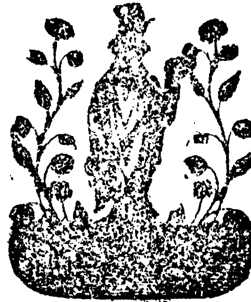
Reg. No C. 534

২৪ বর্ষ। শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED "THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক

বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,

সহকারি-সম্পাদক

স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর

হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইং—২১শে জুলাই ১৯১৭।

বাং—১৩ই শ্রাবণ ১৩২৪।

শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৹ আনা।

সূচী

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। আত্মজ্ঞান	১৪৫	৮। মধুর চরণে	১৮০
২। শিক্ষাষ্টকম্	১৪৭	৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১৮১
৩। বিবাহ	১৫৩	১০। ধর্ম্মশ্লোক	১৮৬
৪। রামের রাজ্যাভিষেক	১৬০	১১। আলোচনা	১৮৯
৫। হিন্দুশাস্ত্রতত্ত্ব	১৬১	১২। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১৯১
৬। কলা ও বিজ্ঞান	১৬৯	১৩। সংবাদ	১৯২
৭। কামরূপ ভ্রমণ	১৭৬		

বর্ত্তমান-সংখ্যার লেখকগণের নাম—

ভারতী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ, শ্রীনৃসিংহ জ্যোতিষভূষণ, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীচণ্ডীচরণ দাশগুপ্ত, শ্রীশশিভূষণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, ভাগবতরত্ন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা, সম্পাদক, সহ সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২৪ বর্ষ, ২৩শ খণ্ড
৪র্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ।

১৩২৪ সাল।
১৮৩৯ শকাব্দ।

আত্মভোলা।

(১)

আপনারে সে যে গিয়াছে ভুলিয়া
সংসারে শত কাজে ;
তোমারেও তাই পায় না খুঁজিয়া
বিরাট্ বিশ্ব-মাঝে।
ভাবিয়া দেখে না তোমার স্বরূপ,
জীবজগতের প্রতি লোমকূপ
ভরিয়া রয়েছ, তথাপি অরূপ,
প্রকট রূপের মেলা ;
বুদ্‌বুদমত উত্থিত কত
বিকট কালের খেলা !

(২)

সে খেলার মাঝে আপনা হারায়ে
হ'য়ে সরবস-হারা,
উদাস নয়নে মরমে মরিয়া
চাহিছে পাগলপারা।
কেন সে এসেছে, কিবা তা'র কাজ,
বহুরূপী মত কেন নানা সাজ,
কেন বা গঠিত মানব-সমাজ,
উদ্দেশ্য কি তা'র ?
মিথ্যা কি শুধু স্বপনের মত
ব'বে জীবনের ভার ?
ভাবনার মাঝে আপনা ডুবায়ে
আপনারে ভুলিয়াছে ;
আপনি সে বুঝি ক্ষুব্ধ আবেগে
ছুটিছে আপন-পাছে !
ভুলে গেছে তাই, মোহ আবরণ
খুলিলেই হয় সব দরশন ;
সংসার !—শুধু অলীক স্বপন ;
সত্য কেবলি তিনি—
অন্বেষণীয় দর্শনাদিতে
বিশ্বের মাঝে যিনি !

(৪)

কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব কোথায়
মগ্ন গুহার মাঝে—
নানান্ মুনির নানা অভিমত,
সব গুলো কিগো বাজে ?
ভুলেছে অতীত তাই আছে আশা,
তাই প্রাণে তা'র আকুল পিপাসা !

প্রাণের আবেগে ভুলিয়াছে ভাষা,
অন্তর বুঝি খোলা :—
সাধনা ভুলেছে　　তোমারে ভুলেছে,
তাই সে আত্মভোলা !

ভারতী শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

শিক্ষাষ্টকম্।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তম্)

শুকদেব কহিয়াছিলেন—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥
নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্য-শৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণু-গুল্মমিবানলঃ॥
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ।
ন তথাহ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ।
যথাকৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপূরুষনিষেবয়া॥
সধ্রীচীনোহ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোহকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্মুখং।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরা-কুম্ভমিবাপগাঃ॥
সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।

ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ ॥
শ্রীভাগবতে ৬। ১। ১১—১৯॥

হে রাজন্! চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ সমূলে নাশ পায় না, কারণ অবিদ্বান্ পুরুষ ঐ সকল প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী। (তজ্জন্য ঐ কর্ম্মে তাহাদের অবিদ্যানাশ না হওয়াতে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার-বশতঃ পাপান্তরের পুনঃ পুনঃ প্ররোহ হইয়া থাকে।) তাহাহইলে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহার উত্তর এই যে, জ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত।১১।

যেরূপ প্রত্যহ পথ্যান্ন-ভোজী ব্যক্তিকে রোগ কষ্ট দিতে পারে না, তদ্রূপ নিয়মকারী পুরুষও ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।১২।

ধর্ম্মজ্ঞ ধীর পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, (১) শম, দম, দান, সত্য, শৌচ, যম (অহিংসাদি), নিয়ম (জপাদি) দ্বারা কায়-মন-বাক্য-কৃত মহৎ পাপকেও অগ্নি যেরূপ বেণু-গুল্ম নাশ করিয়া থাকেন তাহার ন্যায় নাশ করিয়া থাকেন।১৩। ১৪।

(কিন্তু ঐ প্রায়শ্চিত্ত অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া অন্য মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন) কোন কোন বাসুদেব-পরায়ণ ভক্ত, কেবলা অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা, সূর্য্যদেব যেরূপ নীহার নাশ করেন, তাহার ন্যায় সমুদায় পাপ নাশ করিয়া থাকেন।১৫।

হে রাজন্! (এই ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ) পাপাত্মা মনুষ্য, শ্রীকৃষ্ণে মনঃ সমর্পণ করিয়া, ভগবদ্ভক্ত পুরুষদিগকে সেবা করিয়া, যেরূপ পবিত্র হইতে পারে, তপস্যাদি দ্বারা তদ্রূপ শুদ্ধ হইতে পারে না।১৬।

তজ্জন্য এই লোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ, যেহেতু ইহা মঙ্গলদায়ক এবং ইহাতে বিঘ্নাদিরও কোন ভয় নাই। সুশীল নিষ্কাম ভক্তগণ ঐ মার্গে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। (এই জন্য জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই মার্গে অসহায়তার জন্য ভয় কিম্বা কর্ম্ম-মার্গের ন্যায় মৎসরাদিযুক্ত মনুষ্য হইতে ভয় নাই)।১৭।

---

(১) অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য, যথা—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্

স্বামী।

(ভক্তিই অন্য-নিরপেক্ষা হইয়া লোক সকলকে পবিত্র করিতে ক্ষমা হন। চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, ভক্তি ব্যতিরেকে পবিত্র করিতে পারে না।) যেরূপ নদী সকল, সুরা-কুম্ভ শুদ্ধ করিতে পারে না, সেরূপ মহৎ প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইলেও তাহা নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না।১৮।

(ভক্তি অল্প পরিমাণে করিলেও মনুষ্যসকলকে পবিত্র করিতে পারেন - তাহাই বলিতেছেন) যে সকল মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে একবার মাত্র আপনার মন নিবেশিত করেন, তাহাতে তাঁহাদের মন ভগবানে অনুরাগি হয় মাত্র, কিন্তু জ্ঞানযুক্ত হয় না, তথাপি যম কিম্বা পাশহস্ত যমপুরুষ সকলকে স্বপ্নেও তাঁহারা দেখিতে পান না ; কারণ শ্রীকৃষ্ণে একবার মাত্রও মনোনিবেশ করাতেই তাঁহাদের দ্বারা সমুদয় প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইয়া থাকে।১৯।

তজ্জন্য কহিয়াছেন যে—

নাতঃ পরং কর্ম্ম-নিবন্ধ-কৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থ-পদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬।২।৪৬।

তীর্থপদ ভগবানের কীর্ত্তন ব্যতিরেকে মুক্তিকামিগণের পাপের মূলচ্ছেত্তা অন্য কিছু নাই। তদ্ভিন্ন যে প্রায়শ্চিত্তান্তর আছে, তাহাতে মন রজঃ এবং তমোগুণ দ্বারা মলিনই হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই মন ভগবানের কীর্ত্তনে নির্ম্মল হইলে পুনরায় কর্ম্মে আসক্ত হয় না।

পুনরায় কহিয়াছেন—

তস্মাৎ সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গলমংহসাম্।
মহতামপি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিকনিষ্কৃতম্ ॥
শৃন্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পদ্ম-মধুলিড়্ ন পুনর্বিসৃষ্টঃ
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥

শ্রীভাগবতে ৬।৩।৩১—৩৩।

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিলেন যে, হে কৌরব্য! ভগবান্ বিষ্ণুর নাম-সংকীর্ত্তন জগতের মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে, তাহা দ্বারা মহৎ পাপ সকলের ঐকান্তিক নিষ্কৃতি হইয়া থাকে।৩১।

ভগবান্ হরির উদ্দাম বীর্য্য সকল মুহুর্মুহু শ্রবণ কিম্বা কীর্ত্তন করিলে, তদ্দ্বারা সুজাতা ভক্তি যেমন চিত্তের শুদ্ধি করেন, ব্রতাদি সেরূপ শুদ্ধি করিতে পারে না।৩২।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মধু আস্বাদন করেন, তিনি (সেই মধুর আস্বাদনবশতঃ, তুচ্ছ করিয়া) দুঃখ-পূর্ণ মায়া-বিষয়ে পুনরায় রত হন না; যিনি উক্ত মধুরাস্বাদে বঞ্চিত, তিনি কামহত হইয়া নিজের পাপ-মোচনের জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ সেই কর্ম্মই করিতে চেষ্টা করেন, যাহা হইতে পুনরায় পাপের উদ্ভব হইয়া থাকে। (তজ্জন্য অপরাধী বা নিরপরাধ ভক্তগণ ভক্তিই করিবেন, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। ভক্তিতে অবিশ্বাসী স্মার্ত্তগণ এবং অর্থবাদাদি-কুতর্ক-কর্কশমতিগণ নামকীর্ত্তনের প্রাধান্য বর্ণন না করিয়া প্রায়শ্চিত্তকেই প্রধান বলিয়া থাকেন, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত-শাস্ত্রেরই সার্থকতা সম্পাদন করেন।—বিশ্বনাথঃ)

মন্বাদিশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, তাহাতে হৃদয়ের মালিন্য দূর হয় না—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি-সেবয়া॥১৭

শ্রীভাগবতে ৬।২।১৭

মনু প্রভৃতি মুনিগণের কথিত তপস্যা, দান এবং ব্রতাদি দ্বারা সেই সেই পাপের শান্তি হয়, কিন্তু পাপীর অধর্ম্ম-জন্য হৃদয়ের মালিন্য দূরীভূত হয় না; তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা দ্বারাই হইয়া থাকে।

পুনরায় কহিয়াছেন—

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।

তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
গুর্ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥

শ্রীভাগবতে ৬।২।১১।১২

ব্রহ্মবাদি-মন্বাদি মুনিগণ পাপনিষ্কৃতির জন্য যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে, পাপী ব্যক্তি ভগবান্ হরির নাম-উচ্চারণ মাত্রে যেরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শুদ্ধ হয় না। আরও ঐ নামোচ্চারণ (কেবল যে চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপ-ক্ষয় করিয়া দিয়াই উপক্ষীণ হন, তাহা নহে, কিন্তু) উত্তমশ্লোক নারায়ণের গুণসকলও প্রকাশ করিয়া দেন। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু যদি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মানব পাপ-পথে পুনরায় ধাবমান হয়, তাহা হইলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত একেবারে পাপের শোধক হইতে পারে না; তজ্জন্য যাঁহারা পাপের সমূল উচ্ছেদ করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হরির গুণানুবাদই প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু সেই হরি চিত্তের সংশোধক।

নামের শক্তি আরও কহিয়াছেন—

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনো হ্পরে ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥

শ্রীভাগবতে ৬।২।৯-১০

স্বর্ণ-চোর, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী, রাজা, পিতা, ও গোহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল পাতকী আছে, তাহাদের সকল পাপের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত নামকীর্ত্তন, যে হেতু নামোচ্চারণ করিবা মাত্র তাহাদের বিষয়ে বিষ্ণুর মতি হয়। (নামোচ্চারক পুরুষ আমারই, তজ্জন্য তাহাকে সর্ব্বথা আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য—ইহাই ভগবানের মতি।) প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, নামকারী নামাপরাধ বিষয়ে সাবধান হইবেন। নামাপরাধ দশ প্রকার যথা—

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ হুতাদি-সর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ১১ বিলাসে ধৃত পদ্মপুরাণ-বচনম্।

সাধুগণের নিন্দা করিলে নামের নিকট অত্যন্ত অপরাধ করা হয়, যেহেতু সেই সাধুর নিকটে নামের আবির্ভাব হইয়া থাকে! হায়! নাম কি প্রকারে সাধু-নিন্দা সহ্য করিতে পারিবেন? ইহলোকে যে ব্যক্তি শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুর নাম এবং গুণাদি সকল অন্তঃকরণে ভিন্নরূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয় হরিনামের অহিতকারী।

যে ব্যক্তি গুরুর অবজ্ঞা, বেদশাস্ত্র-নিন্দন, হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে, (অর্থাৎ স্তুতিবাদ কল্পনা করে), প্রকারান্তরে নাম-মাহাত্ম্যের অর্থ কল্পনা করে, নামের বলে পাপে রত হয়, ধর্ম্মরাজ যমের নিকট বহু যাতনা ভোগ করিলেও তাহার শুদ্ধি হয় না।

ধর্ম্ম, ব্রত, দান এবং যজ্ঞাদি সমুদায় শুভকর্ম্মকে নামের সহিত সমান মনে করাও অপরাধ; অশ্রদ্দধান জনে, বিমুখ জনে এবং যে ব্যক্তি শ্রবণ করিতে চায় না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া—শিব-নামে অপরাধ।

যে জন নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও আনন্দ প্রকাশ করে না এবং "আমি" "আমার" এই জ্ঞানে পূর্ণ থাকে ও ভোগাদি বিষয়ে রত হয়, সেও নামের নিকট অপরাধী।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, নামাভাস হইতেই মনুষ্য মুক্তিলাভ করে, অতএব নামাভ্যাসের ফল যে কি, তাহা বলা যায় না। ঐ নামাভ্যাস হইতে নামাপরাধ-জনিত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থ-করাণি চ॥
ঐ		ঐ

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই অপরাধ হরণ করেন; ঐ নাম সতত কীর্ত্তিত হইলে সমুদয় প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

বিবাহ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিবাহের অধিকারী।

যাঁহারা সেরূপ উচ্চসংযমবলে বলী নহেন, যাঁহারা কামবিজয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ নহেন, তাঁহারা প্রবৃত্তির পথে ক্রমে নিবৃত্তির রাজ্যে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষায় বিবাহ করেন। অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ও সুদৃঢ়-সংযম-পালনের শক্তি যাঁহাদের নাই, তাঁহারা জীবনের শৃঙ্খলারক্ষার উদ্দেশে, সংসারের অসংখ্য ভোগোপকরণের মধ্য হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটীমাত্র উপকরণ বাছিয়া লন—ইহাই বিবাহ। রুষীয় মনীষী ঋষিকল্প টলষ্টয়ও বিবাহের উদ্দেশ্য এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতেও সাধ্যসত্বে চির ব্রহ্মচর্য্য এবং অসমর্থ-পক্ষে বিবাহের ব্যবস্থা। আমরণ সংযমী হওয়ার সাধ্য নাই, কিন্তু অসংযত-ভাবের সঙ্কোচ-সাধন-পূর্ব্বক সংযতভাবে জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষা আছে—এরূপ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট পাত্রে (ঋতুকালে নিজ পত্নীতে) সঙ্গত হইয়া অন্যত্র সংযত থাকিবার ব্যবস্থা করাই আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই অসংযম, অসংযমের বৃদ্ধির জন্য নহে, সংযম-শিক্ষার জন্য।

বিবাহের রহস্য এই যে, যখন চিরসংযমী হওয়া সম্ভব হইল না, তখন এমন ক্ষেত্রে অসংযত হইব, যাহা দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ-রক্ষা হয় ও ক্রমে সংযমের পথে অগ্রসর হই, এবং কালে এক জীবনে না হয় বহু জন্মেও জীবনের যথার্থ সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি। এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রবৃত্তির পন্থানুসরণে যুবক ব্রহ্মচর্য্য-সমাপনান্তে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন এবং শাস্ত্রীয়

নিয়ম-পালন করিয়া সুসন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক ক্রমে অভ্যাসবলে ভোগ হইতে ত্যাগে উপনীত হন—প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন আর পতিপত্নীর মধ্য ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা প্রকাশ পায় না, তখন পতিপত্নী ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় থাকিয়া সন্তানের সুশিক্ষাদান ও অন্যান্য মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা জগ-জগতের কল্যাণ সাধন করেন—সন্তান উপযুক্ত হইলে ক্রমে সংসারের কার্য্য তাহার উপর সমর্পণ করিয়া, অবস্থাবিশেষে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে, অবস্থাবিশেষে একক বনাশ্রম গ্রহণ করেন—পরে সংসার-বাসনা নিঃশেষ হইলে সন্ন্যাস লইয়া মোক্ষমার্গে অগ্রসর হন।

এতাবৎ আলোচনায় বুঝা যায়, সামর্থ্যশালী মহাত্মার পক্ষে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য বা ব্রহ্মচর্য্যান্তে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যাহারা সেরূপ সামর্থ্যশালী নহে, সেই সাধারণশ্রেণীর জন্য ব্রহ্মচর্য্যান্তে বিবাহ ও অপত্যোৎপাদনের ব্যবস্থা। বিবাহ সংযমচ্যুতি ঘটাইবার জন্য নহে, উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত জীবনকে শৃঙ্খলা ও সংযমের পথে আনিবার জন্য।

এখানে মনে রাখিতে হইবে, উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিতে আমি আপাততঃ অক্ষম হইতে পারি, কিন্তু উচ্চ আদর্শের নিকট উপস্থিত হওয়াই আমার অভীপ্সিত। সংযমের পথে আত্মোন্নতি—অমৃতত্বপ্রাপ্তি আমার আকাঙ্খিত; আমি যত শীঘ্র পারি, উহার নিকটই পৌঁছিতে চেষ্টা করিব—এই ভাব মনে থাকিলে, পত্নীকে শয্যাসঙ্গিনী বলিয়া মনে হইবে না, 'সহধর্ম্মিণী' বলিয়া ধারণা হইবে। ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা-সাধনের চেষ্টায় যাহাতে পত্নীর সাহায্য পাওয়া যায়, এভাবে তাহাকে প্রস্তুত করিতে হইবে। দেখা যাইবে, ইহার ফলে, যে পত্নী ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতির উপকরণ, সেই ব্রহ্মচর্য্যরক্ষায় কামভোগবিহীন-দাম্পত্যপ্রেমের সেবায় প্রধান সাধন হইয়া দাঁড়াইবে।

যাহারা বিবাহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদর্শ বিস্মৃত হয়, ইন্দ্রিয়সেবাকেই বিবাহের লক্ষ্য বলিয়া মনে করে, তাহারা অতিভোগের ফলে অল্পকালেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের শরীরসার ক্ষীণ হওয়ায় অচিরে অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পায়। তাহারা নিজদোষে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় করিয়া, নানা অশান্তিকর ঘটনাজালে জড়িত ও বিড়ম্বিত হইয়া আমরণ অনুতাপানলে দগ্ধ হয়। মূল উদ্দেশ্যে মনোযোগ না থাকায়ই এই সব গোলযোগ ঘটে।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য অমৃতত্বপ্রাপ্তির প্রধান সাধন সংযম। প্রথম-কল্প চিরব্রহ্মচর্য্য ফলিতার্থে বিবাহ না করা। দ্বিতীয়কল্প বিবাহের পথে

সংযম আয়ত্ত করা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, মহামতি ঈশা প্রভৃতি বিবাহ করেন নাই। ভগবান্ বুদ্ধ, বিবাহ ও অপত্যোৎপাদনের পর মোক্ষমার্গে অগ্রসর হন। যে পথেই যাই, লক্ষ্য স্থির রাখা চাই।

বিবাহের লক্ষ্যের সহিত মানবজীবনের চরম লক্ষ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আলোচনা করিলে বলা যায়, যে বিবাহ জীবনের মুখ্য বা চরম লক্ষ্য হইতে দূরে লইয়া যায়, তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

আমরা দেখিলাম, বিবাহ দ্বারা মানবজীবনের লক্ষ্য দূরে যায় না; এখন আমরা দেখিব, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দ্বারা মানব-জীবনের লক্ষ্য স্থির থাকে কিনা?

বহুবিবাহ।

পুরুষ এক স্ত্রী-সত্ত্বে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর। ধর্ম্মশাস্ত্রেও 'অধিবেদন' অর্থাৎ এক পত্নীসত্ত্বে অন্য পত্নী-গ্রহণের প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু, যে পুরুষ বিবাহের দ্বারা (পত্নীর সাহায্যে) জীবনকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, জানিনা, সে এক পত্নী সত্ত্বে অন্য পত্নী গ্রহণ করিবে কিরূপে?

ধর্ম্মশাস্ত্র, একপত্নী-গ্রহণের পক্ষপাতী, তবে যেখানে সেই পত্নী দ্বারা অপত্যোৎপাদন ও ধর্ম্মজীবন-গঠনের সহায়তা না হয়, সেরূপ স্থলে দীর্ঘকাল পত্নীর সংশোধনের জন্য অপেক্ষা করিয়া পরে, অগত্যা পত্ন্যন্তর-গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুত্রবতী পত্নী সত্ত্বে বিবাহের অনুমতি দেন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রথমা পত্নীকে 'ধর্ম্মপত্নী' নাম দিয়াছেন ও দ্বিতীয়া পত্নীকে 'রতিবর্দ্ধিনী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে আমরা বুঝিয়াছি, যাহারা পত্নীসত্ত্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, শাস্ত্র তাহাদিগকে কামপ্রবণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুত্রোৎপাদন-সম্বন্ধেও শাস্ত্র এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। শাস্ত্রমতে প্রথম পুত্রই ধর্ম্মসঙ্গত পুত্র, অন্য সব পুত্র কামজ পুত্র। যাহারা এই আদেশ পালন করে না, সেইসব লোকেরা মূল লক্ষ্য সংযমের প্রতি মনোযোগী নহে; তাহারা আদর্শ হইতে বহুদূরে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে একটী নারী যেমন বহু পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্তা হইলে তাহার সতীত্ব নষ্ট হয় বলিয়া বিশ্বাস করি, তদ্রূপ একজন পুরুষও বহু নারীর সহিত শারীরসম্বন্ধ স্থাপন করিলে তাহার সদ্ভাব বা পবিত্রতা নষ্ট হয় বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য।

বিপত্নীকের বিবাহ।

পত্নীর মৃত্যু হইলে পরে যে সমস্ত অপুত্র মানব পুনরায় বিবাহ করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, অপত্যলাভ বিবাহের উদ্দেশ্য, ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় তাঁহাদের বিবাহ করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন, সমর্থপক্ষে বিবাহ না করাই প্রশস্তকল্প; পতনের বেশী সম্ভাবনা থাকিলে, অগত্যা বিবাহই কর্ত্তব্য।

পুত্রবান্ ব্যক্তির পত্নীবিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। কদাচিৎ পতন-ভয়ে বিবাহ করা প্রয়োজন বোধ হইলেও মনে করা উচিত যে, প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব-স্থাপনই কর্ত্তব্য, প্রবৃত্তির দাসত্বে আত্মনিয়োগ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ সংযম-শিক্ষা না থাকিলে বিপত্নীকের বিবাহ করা মন্দের ভাল হইতে পারে, কিন্তু পত্নীসত্ত্বে বিবাহ কোনও মতে সমর্থন-যোগ্য নহে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষে বলা যাইতে পারে, 'একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা' ইহাই আদর্শ। সংযম ভিন্ন আত্মোন্নতি অসম্ভব। আত্মোন্নতি ভিন্ন মানবজীবনের সার্থকতাও নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বহুবিবাহ সঙ্গত হইতে পারে না। বিবাহে আধ্যাত্মিক মিলন যাঁহারা চাহেন, তাঁহারাও নারীর একপতি-গ্রহণ ও পুরুষের একপত্নী-গ্রহণই সঙ্গত বলিবেন।

বিধবা-বিবাহ।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে বহু উক্তি পাওয়া যায়। সংযম এবং আত্মোন্নয়ন জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মানিলে, বিধবার পত্যন্তর-গ্রহণ বৈধ বিবেচনা করা যায় না। বিবাহের পথে সংযমের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, বিধবাকে আর সংযম-ভ্রষ্টা হইতে বলা চলে না। শাস্ত্র এই ভাবেই বলিয়াছেন "ভর্ত্তরি প্রেতে ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।" রমণীর (ঋতুকালে) স্বামিসংসর্গে অধিকার আছে, কিন্তু ঐ সংসর্গ তাহার লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য সংযম। যদি সংযমের পথ দৈববলে পরিষ্কৃত হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমই শ্রেষ্ঠকল্প। যেখানে সংযম-ভ্রংশের আশঙ্কা হয়, সেখানে পবিত্রতা লইয়া দেহত্যাগ করাই হিন্দুশাস্ত্র-কারগণ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। বিধবাকে পুনরায় ভোগের পথে না লইয়া ত্যাগের পথে লওয়াই সঙ্গত। পত্যন্তর-গ্রহণ দ্বারা ভোগের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া আত্মোন্নতির প্রতিকূল। সংযমের স্থলে সংসর্গ ও ত্যাগের স্থলে ভোগকে বসাইলে, জীবনের লক্ষ্য ক্রমশঃ অধিক দূরবর্ত্তী হইতে থাকে। তবে

অবস্থা-বিশেষে ব্যবস্থা করা দরকার হয়। যদি কেহ বলেন, "বিধবার ভোগবাসনা থাকিলে তাহাকে বলপূর্ব্বক ত্যাগের পথে আনা সম্ভব হইবে না; পুনরায় বিবাহ না দিলে তাহার জীবন কলুষিত হইবে; সে অধঃপতন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না, সুতরাং বিবাহ দিয়া তাহাকে অধিকতর অধঃপতন হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য"—তিনি মনে করিবেন, প্রবৃত্তির সংযম ভিন্ন শান্তি নাই। বিবাহকে ভোগের সোপান মনে করিলে উত্তরোত্তর প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ই দেওয়া হইবে। তবে একান্ত অপারগতা হইলে যেমন অপুত্র বিপত্নীকের বিবাহ অগত্যা অনুমোদন-যোগ্য, তদ্রূপ অনপত্যা বিধবারও বিবাহ অনুমোদিত হওয়া উচিত। পতিব্রতা পবিত্রা বিধবা রমণীর নিকট পত্যন্তর-গ্রহণ ব্যভিচার-রূপেই প্রতীত হয়। বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে সংস্কার, প্রথম বিবাহেই সংস্কার সিদ্ধ হওয়ায় দ্বিতীয়-বার বিবাহ করা সঙ্গত হয় না,—ইহা কি, স্ত্রী কি পুরুষ, সকলের পক্ষেই সমান। অপত্য-কামনায় অনপত্য বিপত্নীক পুরুষ যেমন পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকেন, অনপত্যা বিধবা নারীও তেমনি বিবাহ করিতে পারিবেন না কেন—এ কথার উত্তরে বলা যায়, পুরুষেরও ঐরূপ বিবাহ প্রশস্ত নয়, স্ত্রীরও প্রশস্ত নহে। নিতান্ত অসমর্থ স্থলে পুরুষের পক্ষেও পুনর্ব্বিবাহ যেরূপ, স্ত্রীর পক্ষেও পত্যন্তর-গ্রহণ সেরূপ অপ্রশস্ত কর্ত্তব্য। প্রশস্তকল্প এই যে, সংযত স্ত্রী পুরুষ কাহারও পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ কর্ত্তব্য নহে, কারণ উহাতে জীবনের চরম লক্ষ্য দূরবর্ত্তী হয়। বস্তুতঃ পুরুষের পত্ন্যন্তর-গ্রহণ ও স্ত্রীর পত্যন্তরগ্রহণ উভয়ই আত্মোন্নতির প্রতিকূল, সুতরাং অকর্ত্তব্য।

বাল্যবিবাহ।

আত্মোন্নতির উপায় সংযমের দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, বাল্যবিবাহও শ্রেয়স্কর নহে। বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে তখন অপত্যোৎপাদন সম্ভব হয় না। বালিকাপত্নী স্বামীর ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিতেও পারে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে বিবাহ নিরর্থক।

যদি বলা যায়, বাল্যাবধি নিজগৃহে রাখিয়া সুশিক্ষা দিবার জন্য, নিজের যোগ্যজীবন-যাপনে সাহায্য করিবার উপযুক্ত করিয়া গড়াইয়া লইবার জন্য, বলিকাকে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য—যদি বলা যায়, যুবতীকে নিজের ভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া, বাল্যবিবাহ অধিকতর শুভদায়ক মনে করিয়া, অনেক ধর্ম্মাচার্য্যও বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা হইলে মনে রাখিতে হইবে, বাল্যবিবাহ বালিকা-সংসর্গের কারণ হওয়ায়ই দূষণীয়।

বাল্যবিবাহে বালা বধূ ও কিশোর বর উভয়েরই চিত্তে সর্ব্বদা সংযোগ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয় বলিয়া উভয়েরই ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। কৈশোরে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার অবতারণা করিয়া বালিকার দেহ ও মন নিপীড়িত করা না হয়, প্রত্যুত তাহাকে সংযম ও সৎশিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্ববিকাশের পথে লইয়া যাওয়া হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিলে, তাহা দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু ঘটে প্রায়ই বিপরীত।

অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা পত্নীর সহিত শারীর-সম্বন্ধ-স্থাপন ও তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাহাতে বীজবপন মহাপাপ। ইহা একসঙ্গে আত্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যা।

শাস্ত্র বলেন, ঊনষোড়শবর্ষায়াং অপ্রাপ্তপঞ্চবিংশতিঃ, যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ব্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ, তস্মাদ-ত্যন্তবালায়াং গর্ব্ভাধানং ন কারয়েৎ। ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে ২৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক স্বামী যদি গর্ভাধান করে, তাহা হইলে সেই গর্ব্ভস্থ সন্তান গর্ব্ভেই বিপন্ন হয়; যদি নিরাপদে প্রসূত হয়, তাহা হইলেও সে সন্তান দীর্ঘ-জীবী হয় না; যদি বা কদাচিৎ দীর্ঘজীবীও হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল রুগ্ন অক-র্ম্মণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ব্ভাধান করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, বাল্যবিবাহে কেবল ব্যর্থ সংস্কারমাত্রই চলিতে পারে, অন্যবিধ সম্বন্ধ চলিতে পারে না। বিবাহের মন্ত্রগুলির আলোচনা করিলে, সেগুলি বাল্যবিবাহে খাটে, এরূপ মনে হয় না। সুতরাং বাল্যবিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হইলেও বালাসংসর্গ-ভয়ে উহা যে ত্যাজ্য তাহাতে সংশয় নাই।

সংযম স্বাস্থ্যের মূল।

শরীর ও মন সংযত না হইলে আত্মোন্নতি হয় না। যে কার্য্য দ্বারা শরীর দুর্ব্বল ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কখনও আত্মোন্নতির অনুকূল হয় না। শরীর দুর্ব্বল হইলে মন স্বভাবতই অবসাদগ্রস্ত হয়। মন দুর্ব্বল হইলে কামাদি-রিপুর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। দেখা যায়, রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি অধিক-মাত্রায় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া থাকে, সুতরাং, সর্ব্বথা শরীররক্ষায় মনোযোগী হওয়া উচিত। শাস্ত্র বলেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীররক্ষা করিতে হইলে সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

মানুষ যদি বিন্দুধারণ করিতে পারে, শরীরসার সযত্নে রক্ষা করিতে পারে, এককথায় ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারে, তবে শরীর নীরোগ সবল ও মন দৃঢ় নির্ম্মল হইবে এবং আধ্যাত্মিক-কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং

যাঁহারা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য আত্মোন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে চিরসংযম—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য অথবা ব্রহ্মচর্য্যান্তে সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রশস্ত। একথা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পক্ষে সমান প্রয়োজ্য। পুরুষের পক্ষে যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য প্রশস্তকল্প, নারীগণের পক্ষেও তেমনি চিরসংযম আমরণ ব্রহ্মচর্য্য প্রশস্তকল্প। গার্গী আদি ব্রহ্মবাদিনী নারীগণ আমরণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া গিয়াছেন। উভয়ত্রই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য, তদভাবে বিবাহ; বিবাহও একবারই প্রশস্ত—ইহা আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

যাঁহারা সে উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বিবাহ করিয়া শাস্ত্রীয়-নিয়মপালনপূর্ব্বক পত্নীতে উপগত হইয়া অপত্যোৎপাদন করিবেন। সন্তান জন্মিলে পর স্ত্রীর সহিত ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় বাস করিয়া, সন্তান-পালন ও সংযমের অনুশীলন করিবেন। ক্রমে অভ্যাস-বলে বিবেক-বৈরাগ্যের সেবায় কৃতকার্য্য হইয়া সন্ন্যাস বা ত্যাগজীবন গ্রহণ করিয়া জগতের কল্যাণ ও আত্মমোক্ষে মনোযোগী হইবেন—ইহাই আর্য্যশাস্ত্রোক্ত উপদেশ।

যাঁহারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিবাহের পথে ভোগের পঙ্কিল-প্রবাহে পতিত হইবেন, তাঁহারা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতে ২ পশুত্বের রাজ্যে উপনীত হইবেন। তাঁহাদের বিবাহ ধর্ম্ম নয়, অধর্ম্ম।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যই যদি প্রশস্তকল্প হয়, তবে সকলেরই নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা হইলে সৃষ্টিরক্ষা—জীব-প্রবাহরক্ষা হইবে কিরূপে? উত্তরে আমরা বলিব,—আত্মা অমর, জীবের বৃদ্ধি হ্রাস নাই; ভোগক্লিষ্ট অজ্ঞ জীবসমূহ স্থূলদেহে থাকিয়া যদি সংসারের উন্নতি করিতে পারে, তবে উন্নত সূক্ষ্মদেহী জ্ঞানী জীববৃন্দ বর্ত্তমান থাকায় জীব স্রোত নষ্ট হইবে কিসে? অনুন্নত জীবের উন্নত জীবে পরিণতি কি জীব-স্রোতের বিনাশ? কখনই নয়।

বিবাহ যাহাতে আত্মোন্নতির অনুকূল হয়, সংযমের সোপান হয়, সেইভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যকরাই আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ।

আমরা দেখিলাম, আপাতদৃষ্টিতে পুত্রোৎপাদন বিবাহের উদ্দেশ্য বোধ হইলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য সংযম। ব্রহ্মচর্য্যের মূলমন্ত্রও সংযমই। বনী ও সন্ন্যাসী ত সংযমের সেবক। বুঝিলাম, সকল আশ্রমীরই আত্মোন্নতির সহায় সংযম। সংযমই মুখ্যতঃ ব্রহ্মচর্য্য, সুতরাং বলা যায়, ব্রহ্মচর্য্যই একমাত্র মোক্ষের সোপান।



রামের রাজ্যাভিষেক।

কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীমান্ ভরত শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব করিলেন। ভরত বলিলেন—আপনি আমাকে যেরূপ রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপে পুনঃ প্রদান করিলাম; এক্ষণে আপনি সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে থাকুন। সকলেই এই সাধু প্রস্তাবে প্রীত হইলেন।

ইতিমধ্যে শত্রুঘ্ন ক্ষৌরকার্য্য-নিপুণ নাপিত আনাইয়া রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণাদির ক্ষৌর-কার্য্যের এবং স্নানাদির ব্যবস্থা করাইলেন। শত্রুঘ্ন, স্নানান্তে স্বহস্তে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে অলঙ্কারে ভূষিত করিলেন। অন্তঃপুর-মধ্যে সুমিত্রা ও কৈকেয়ী, সীতাদেবীর অঙ্গে চন্দন-লেপন-পূর্ব্বক অলঙ্কার পরাইলেন। কৌশল্যা স্বয়ং বানর-সেনাধ্যক্ষগণের পত্নীগণকে অলঙ্কারাদি পরাইলেন।

পরে শত্রুঞ্জয়-নামক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সুগ্রীব ও হনুমান্ রামচন্দ্রের সহিত নগর-দর্শনার্থ গমন করিলেন। সীতাদেবীও অন্যান্য নারীগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইলেন। ভরত, রামচন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া অশ্বের রজ্জু ধরিলেন, শত্রুঘ্ন ছত্র ধরিলেন, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বানরগণও শ্রীরামের অনুগমন করিলেন। সমস্ত নগরে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইবার জন্য মন্দির, চৈত্য, উচ্চ অট্টালিকা ও প্রশস্ত রাজপথ পরিপূর্ণ করিল। ব্রাহ্মণগণ সুবর্ণবর্ণ অক্ষত হাতে করিয়া মঙ্গল পাঠ করিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণ দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কা-বিজয়ের নানা গল্প শুনিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

আজ অযোধ্যার প্রতি গৃহ সজ্জিত ও আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ। গৃহে ২ পতাকা উড়িতেছে। নগর-পরিদর্শনান্তে শ্রীরামচন্দ্র রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া ইক্ষ্বাকুসম্রাট্‌দিগের চিরোষিত গৃহে প্রবেশ করিলেন ও ভরতকে আদেশ দিলেন, "আমার অশোকবনশোভিত বাটিকায় সুগ্রীবের বাসস্থান করিয়া দাও।" ভরত রামচন্দ্রের আদেশ পাইয়া সুগ্রীবের হস্ত ধারণ করিয়া স্বয়ং তাহাকে বৃক্ষবাটিকায় লইয়া গেলেন।

এদিকে মন্ত্রিগণ শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অচিরে পাঁচশত নদীর ও সমুদ্রের জল আনীত হইল। বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে

স্বর্ণ পীঠে উপবেশন করাইলেন। বশিষ্ঠ, বিজয়, কশ্যপ, জাবালি, গৌতম এবং বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ নির্ম্মল ও সুগন্ধ জল দ্বারা তাঁহার অভিষেক করাইলেন। ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ, কন্যাগণ, কুমারীগণ এবং সর্ব্ববর্ণের প্রধানগণ, সর্ব্বৌষধি-মিশ্রিত জল দ্বারা অভিষেক করাইলেন। তৎপরে স্বয়ং মহর্ষি বশিষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু-রাজকুলের রত্নময় কিরীট, যাহা আদিরাজ মনু অভিষেক-সময় ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। গীত বাদ্যের দ্বারা রাজধানী আনন্দপূর্ণ হইল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে গো ও নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন। এই সময় শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে মণিময় কাঞ্চনমালা, অঙ্গদকে দুইখানি কেয়ূর এবং জনকনন্দিনীকে চন্দ্রের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট হার প্রদান করিলেন। জনকনন্দিনী হনুমানের সমস্ত উপকার স্মরণ করিয়া তাহাকে সুন্দর বসন দান করিলেন এবং আপনার কণ্ঠ হইতে হার উত্তোলন করিয়া বার বার পতির মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। রাম নিজের ত্রুটি এবং সীতার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, হে ভামিনি! তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকে উহা প্রদান করিতে পার। তখন সীতাদেবী সর্ব্বগুণের আকর হনুমানকে উহা প্রদান করিলেন। তৎপরে শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ, জাম্বুবান্, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতিকে নানা রত্ন ও মাল্য প্রদান করিলেন। অভিষেকের অবসানে বিভীষণ লঙ্কায় গমন করিলেন এবং সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সহিত পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন এবং ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজের গুরুভারের কিছু লাঘব করিলেন।

হিন্দু-জ্যোতিষ।

গুরু-শিষ্য সংবাদ।

শিষ্য। গুরুদেব! দুষ্প্রাপ্য দক্ষিণার অন্বেষণে আমি স্নাতকবেশে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি; কতশত রাজ-সভায় কত শত প্রবীণপণ্ডিতের সমাগমে কত জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এবং দেশ-দেশান্তর-পর্য্যটনে অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছি; এখন ঈপ্সিত দক্ষিণা গ্রহণ করুন, আমি কৃতার্থ হই।

গুরু। অধ্যয়নের অবসানে শিক্ষা-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে শিষ্যকে দীর্ঘ প্রবাসে পাঠাইতে হয়, ইহাই প্রচীন প্রথা। যাউক্ সে কথা, তোমার কিছু বক্তব্য আছে?

শিষ্য। অদ্য দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীচরণে বিদায় লইব।

গুরু। কি প্রশ্ন বল?

শিষ্য। ডাক্তার ওয়েবার-প্রমুখ পাশ্চাত্য জ্যোতিষিক লেখকগণ বলেন যে, ভারতীয় নক্ষত্রচক্র ব্যাবিলন্‌নগরের আমদানী এবং হিন্দুর রাশিচক্র গ্রীক্‌জাতি হইতে লব্ধ—সেও আবার সেকন্দর বাদসাহের দিগ্‌বিজয়ের পরে। কেহ বা এমনও বলিতে চাহেন যে, হিন্দু, গ্রীক্‌জাতি হইতে সৌর-বর্ষগণনা শিক্ষা করেন। হিন্দু তারাদর্শক হইলে সিদ্ধান্তগ্রন্থে ভগোলের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিত, হিন্দুর তারাচিত্র ও তারাগোলক থাকিত। এখন প্রশ্ন, হিন্দুজ্যোতিষ স্বকীয় না পরকীয়?

গুরু। যখন য়ুরোপের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক ডাক্তার ওয়েবার হিন্দুজ্যোতিষকে পরকীয় বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তাঁহার মত অতি সাবধানে খণ্ডন করিতে হইবে। তবে এককথা, হিন্দুজ্যোতিষের স্বকীয়তা ঋগ্বেদ ও সায়ন-ভাষ্য অবলম্বনে মীমাংসা করিব, কিন্তু ভাষ্যে অন্ধবিশ্বাস-স্থাপনে অসমর্থ হইব—সুধীগণের চিত্ত তাহাতে বিচলিত হইবে না, এ ভরসা রাখি, কিন্তু তুমি সুকোমলমতি স্নাতক, তোমার মনে পাছে খট্‌কা বাধে, এই আমার মনের আশঙ্কা।

শিষ্য। আপনি ঋগ্বেদকে সাহিত্য-ভাবে আলোচনা করিবেন, তাহাতে আমি কোন দোষ দেখি না, তবে সায়নভাষ্যের ছিদ্রানুসন্ধান কি ভাল?

গুরু। ভাষ্যকার সায়ন শুধু আমাদের নহেন, তিনি বেদাধ্যায়িজগতের গুরু। গুরুর ভুল ধরিতে শিষ্যের অধিকার এবং শিষ্যই তাহাতে সক্ষম। শিষ্য গুরুর খুঁত ধরিলে গুরুর মর্য্যাদাবৃদ্ধি হয় এবং সদ্‌গুরু তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন। গুরুর খুঁত না ধরিলে বিদ্যা জড়তা প্রাপ্ত হয়—উন্নতির আশা থাকে না। গুরুর ভুল ধরিয়াই ইউরোপ আজ অতীব উন্নত এবং গুরুবাক্যে কম্পিত এসিয়া আজ নিতান্ত অধঃপতিত। খুঁত গুলি ঢাকিয়া দিতে পারিলে, সায়নের কীর্ত্তিস্তম্ভ জগতে অতুলনীয় হইবে।

শিষ্য। একেই বলে গুরুমারা বিদ্যা। যাক্, আসল কথা বলুন।

মলমাস।

গুরু। ঋগ্বেদে অধিকমাসের কোন উল্লেখ থাকে ত মন্ত্রটীর আবৃত্তি কর এবং ব্যাখ্যা কর।

শিষ্য। বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা য উপজায়তে। (১।২৫।৮) ঋক্।

অর্থ।

নিয়ম-পরায়ণ বরুণদেব দিনসংখ্যাসহ ১২ মাস জানেন এবং গণিত-শাস্ত্র-সম্ভূত কৃত্রিম অধিকমাস ও জানেন।

গুরু। অধিকমাস কিরূপে জন্মে?

শিষ্য। ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ডে বার সৌর মাস বা ১ সৌরবর্ষ হয় এবং ২৯ দিন ৩০ দণ্ডে এক চান্দ্রমাস হয়। ১২ চান্দ্রমাসে ৩৫৪ দিন মাত্র হয়, সৌর বর্ষের ১১ দিন কম পড়ে; ৩ সৌর বৎসরে ৩৩ দিন কম পড়ে। ৩ বৎসর অন্তর ১ মাস উৎখাত করিয়া দিয়া গণিতশাস্ত্র সৌর ও চান্দ্র-বৎসরের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এই উৎখাদিত মাসকে অধিকমাস বলে।

রাশি-চক্র।

গুরু। সৌর মাস ও সৌর বর্ষের গণনা করিতে হইলে রাশিচক্র দরকার এবং চান্দ্রমাস গণনা করিতে হইলে নক্ষত্র-চক্র দরকার, কিন্তু বেদে রাশিচক্রের কোন উল্লেখ পাও কি?

শিষ্য। আমরা (১।১৬৪।১১) ঋকে পড়ি, ১২ ভাগে বিভক্ত সত্যের রাশিচক্র দ্যুলোকের পরে নিয়ত ঘুরিতেছে—তাহাতে ৭২০ অনুভাগ বিদ্যমান আছে যথা——

দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।

আপুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥

গুরু। কোনও রাশির নাম ঋগ্বেদে পাও?

শিষ্য। বৃষ এবং সিংহ রাশির নাম ও বৃশ্চিক রাশির ঐতিহাসিক 'ত্রিত' নাম ঋগ্বেদে আছে। তারাবৃশ্চিক তিন রাশি ব্যাপিয়া আছে বলিয়া 'ত্রিত' নামে খ্যাত এবং ইহার অধিদেবতা মঙ্গলগ্রহও 'ত্রিত' নাম ধারণ করে।

গুরু। বৃষরাশির নাম কি প্রসঙ্গে আছে?

শিষ্য। ৬০০৭—৩৭৫০ বর্ষ পূর্ব্বে ২২৫০ বর্ষকাল বৃষরাশিতে শারদীয় ক্রান্তিপাত সঞ্চরণ করিত। ঐ ক্রান্তিপাতকে বেদে "উক্ষণঃ রন্ধ্রম্" বলা হইয়াছে। এই ক্রান্তিপাতে সূর্য্যের উদয় হইলে সূর্য্যসারথি অরুণদেবের বৈদিক-ভ্রাতা পূষাদেব বৃষপৃষ্ঠে হিরন্ময় সূর্য্যচক্র চালাইতেন—যথা:—

উত অদঃ পরুষে গবি সূরঃ চক্রম্ হিরণ্যয়ম্।

নি ঐরয়ৎ রথীতমঃ॥ (৬।৫৬।৩। ঋক্।

এস্থলে আমার স্বীকার করিতে হয় যে, সায়ন-প্রমুখ ভাষ্যকারগণ 'গো' অর্থে মেঘ বলেন, কিন্তু আপনি 'বৃষ' বলেন।

গুরু। গো শব্দের মুখ্য অর্থ বৃষ এবং গৌণ অর্থ মেঘ ইত্যাদি। মুখ্য অর্থ গ্রহণে যদি মূলের সদর্থ হয়, তবে গৌণ অর্থ গ্রহণে ভাষ্যকারগণের কোন অধিকার থাকে না—ইহাই সনাতন নিয়ম।

এখন ঋগ্বেদে তারা-সিংহের উল্লেখ কি প্রসঙ্গে আছে বল?

শিষ্য। ঋগ্বেদের (১০।৮) সূক্তে যে সমস্ত প্রহেলিকা আছে, তাহার মধ্যে একটী প্রহেলিকা এই;—

খেঁকশিয়াল, প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহের অগ্রে দৌড়ায়—যথা:—

লোপাশঃ সিংহম্ প্রত্যঞ্চম্ গৎসাঃ। (৪) ঋক্।

এস্থলে আমার বলিতে হইবে যে, সায়ন 'লোপাশ' অর্থে মৃগ বলেন।

গুরু। ভন্ বণ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত অভিধানে 'লোপাশ' শব্দে 'কিখি' বলেন। তুলনা কর, ল্যাটীন্ ল্যুপ্‌শ্ অর্থে নেকড়ে বাঘ। হরিণ অর্থ করিলে কোন প্রহেলিকাই হয় না।

শিষ্য। আকাশে সিংহের অগ্রে "৩ কর্কটিসা তারা" ধাবিত দেখিতে পাই। এই তারার পাশ্চাত্য নাম লল্ল অর্থাৎ খেঁকশিয়াল।

গুরু। বেদে 'ত্রিত' রাশির উল্লেখ কি প্রসঙ্গে আছে?

শিষ্য। ছায়াপথের পূর্ব্ববাহু বৃশ্চিকরাশি প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত আছে। পশ্চিমবাহুর অধিদেবতা মিত্র-দেব এবং পূর্ব্ববাহুর অধিদেবতা বরুণ-দেব। আমরা (৯।৯৫।৪) ঋক পড়ি:—আকাশ-সমুদ্রে ত্রিত বরুণদেবকে ধারণ করিয়া আছেন। যথা;—

ত্রিতঃ বিভর্ত্তি বরুণং সমুদ্রে।

গুরু। পাশ্চাত্যে রাশিচক্র ১২ ভাগে কে কোন্ সময়ে বিভক্ত করেন?

শিষ্য। এখন হইতে প্রায় ২০৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহামতি হিপার্কস্ বৈজ্ঞানিক-হিসাবে খৃঃ পূঃ ১২০ সনে ১২ ভাগে রাশিচক্রবিভাগ করেন এবং ৩৬০ ভাগে অনুভাগ করেন।

নক্ষত্রচক্র।

গুরু। ঋগ্বেদে নক্ষত্রচক্র বা তারাগৃহ পাও?

শিষ্য। আমরা (১।৮৪।১৫) ঋকে পড়ি;"—হেথা চন্দ্রমার গৃহে" যথা:—

ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে—

কিন্তু এখানে আমার প্রকাশ করিতে হয় যে, সায়ন চন্দ্রগৃহ অর্থে চন্দ্রমণ্ডল বলেন।

গুরু। আবারও বলিতে হইল যে 'চন্দ্রগৃহ' পদের মুখ্য অর্থ নক্ষত্রচক্র, গৌণ অর্থ চন্দ্রমণ্ডল হইলেও পারে।

শিষ্য। এ সম্বন্ধে মীমাংসা পরে শুনিব।

গুরু। ঋগ্বেদে কোন নক্ষত্রের নাম পাও?

শিষ্য। ঋগ্বেদে স্পষ্টাক্ষরে মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের নাম আছে এবং প্রহেলিকায় কৃত্তিকা-নক্ষত্রের নাম আছে, আর মূলানক্ষত্রের তারাদ্বয়ের নামও আছে। এই তারাদ্বয়ের নাম অশ্বিদ্বয়, অর্থাৎ এই তারাদ্বয় বুধ ও শুক্র গ্রহের নাক্ষত্রিক প্রতিমা।

গুরু। মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রের নাম কি প্রসঙ্গে আছে?

শিষ্য। সূর্য্যকন্যা সূর্য্যার বিবাহ উপলক্ষে আমরা (১০।৮৫।১৩) ঋকে পড়ি;—মঘাদিনে পশুহত্যা হয় এবং পূর্ব্ব-অর্জ্জুনী নক্ষত্রে কন্যা-সম্প্রদান হয়—মঘাসু হন্যন্তে গাবঃ অর্জ্জুন্যোঃ পরিউহ্যতে। এস্থলে আমার ব্যক্ত করিতে হয় যে, পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ বলেন—অর্জ্জুন্যোঃ অর্থে পূর্ব্ব-অর্জ্জুনী ও উত্তর-অর্জ্জুনী এই উভয় নক্ষত্র বুঝিতে হইবে।

গুরু। পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা-সংখ্যা অনুসারে সংস্কৃতভাষায় নক্ষত্র-নাম একবচনে, দ্বিবচনে বা বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। আমরা তৈত্তরীয়ব্রাহ্মণে (৩।১।৩) পড়ি—

কৃত্তিকাভ্যঃ স্বাহা, রোহিণৈ্য স্বাহা, পুনর্ব্বসুভ্যাং স্বাহা।

সুতরাং অর্জ্জুন্যোঃ বলিলে দুই অর্জ্জুনী নক্ষত্র বুঝিব কেন?*

শিষ্য। এস্থলে পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের ভ্রম স্পষ্টই বুঝিতেছি।

গুরু। কৃত্তিকা-নক্ষত্র সম্বন্ধে কি প্রহেলিকা আছে?

---

* "অর্জ্জুনী" শব্দ, সপ্তমীর দ্বিবচনেই 'অর্জ্জুন্যোঃ' রূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে লেখক, পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের যে ভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না। তারাসংখ্যা অনুসারে একবচন-দ্বিবচনাদির প্রয়োগ হয়—এ কথাও সঙ্গত নহে, কারণ শকটাকৃতি রোহিণী-নক্ষত্রে পাঁচটীর বেশী তারা সহজেই দেখা যায়, কিন্তু "রোহিণৈ্য" একবচন-প্রয়োগ আছে।

হিঃ পঃ সঃ।

শিষ্য। আমরা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ২০ সূক্তে পড়িঃ—

শশ, প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুর গিলিয়া ফেলে—

শশঃ ক্ষুরং প্রত্যঞ্চং জগার।

এস্থলে আমার ব্যক্ত করা উচিত যে, ক্ষুর-নিগরণ করা সুকোমল-দেহ শশ-মৃগের পক্ষে অসম্ভব, তাই সায়ন বলেন—এস্থলে ক্ষুর অর্থে ঘাস, কিন্তু "শশ ঘাস খায়" এবাক্যে প্রহেলিকা কোথায়?

গুরু। এই প্রহেলিকার শশ, চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত এবং এই প্রহেলিকার ক্ষুর ক্ষুরাকৃতি কৃত্তিকানক্ষত্র।

যখন কার্ত্তিকী পূর্ণিমা-রাত্রিতে তারাগ্রহযোগে শশধর, ক্ষুরাকৃতি কৃত্তিকা-নক্ষত্র আচ্ছাদন করেন, তখন তুমি কি দেখ?

শিষ্য। তখনই "শশঃ ক্ষুরং প্রত্যঞ্চং জগার" দেখি।

গুরু। মূলানক্ষত্রের তারাদ্বয়ের উল্লেখ কোন্ স্থানে আছে?

শিষ্য। মূলানক্ষত্রের প্রাচীন নাম বিচৃত। এই বিচৃত নক্ষত্রের তারাদ্বয় মূলানক্ষত্রের অধিপতি যমদেবের "শ্যামশবলৌ" সারমেয়দ্বয়। আমরা (১০। ১৪। ১০) ঋকে পড়ি—

হে প্রেত আত্মা, যমের দ্বাররক্ষক শ্যাম-শবল-নামক সারমেয়দ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সাধুগণের পথে যাও। যথা:—

অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরোহক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা। (১০) ঋক্।
যৌ তে শ্বানৌ যমরক্ষিতারৌ........ (১১) ঋক্॥

জ্যোতিশ্চক্রাতীত তারামণ্ডল।

গুরু। জ্যোতিশ্চক্রাতীত তারামণ্ডলের নাম কোন গ্রন্থে পাও?

শিষ্য। জ্যোতিশ্চক্রাতীত তারামণ্ডলের নাম কোন সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে দেখি না। ভারতাব্জু ব্রেনাণ্ড সাহেব, হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের ত্রুটি-মার্জ্জনার জন্য গ্রন্থবিশেষে বলিয়াছেন যে—"গণিত লইয়াই হিন্দুরা ব্যস্ত। জ্যোতিশ্চক্রের বাহিরে নেত্রপাত করিবার সময় তাহাদের ছিল না।

গুরু। ঋগ্বেদে সূর্য্য-সারথি পুষাদেব, সপ্তর্ষিমণ্ডল, গরুড়মণ্ডল আদি তারা-মণ্ডলের উল্লেখ আছে, স্মরণ করিয়া দেখ।

শিষ্য। স্মরণ হইতেছে বটে।

গুরু। বৃষরাশির উত্তরে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-চিত্রে যে সারথিমণ্ডল দেখা যায়, তাহাকেই বাল্মীকির "ব্রহ্মরাশি" এবং ঋগ্বেদের "পুষাদেব" বলিয়া জানিবে।

এই পুষাদেবকে পার্থিব অগ্নির নাক্ষত্রিক প্রতিমা বলিয়া জানিবে। "দবগৃগবৈ নক্ষত্রাণি।" পুষাদেবের চরিত্র বেদে কি পাও?

শিষ্য। ঋগ্বেদে ১।৪২ আদি ৭টী সূক্তে পুষাদেবের কথা আছে, তদ্ভিন্ন বহু সূক্তে পুষার স্তব আছে। সে সমস্ত পাঠে দেখা যায় যে, পুষাদেব পশুপালক, অজাশ্ব, রথীতম, পথঃপতি এবং সূর্য্যের দূত।

গুরু। ব্রহ্মরাশির স্থূলতম তারার নাম কি?

শিষ্য। সূর্য্যসিদ্ধান্ত এই তারাকে "ব্রহ্মহৃদয়" বলেন।

গুরু। ঋগ্বেদে (১০।২৬।৬ ঋকে) পুষাদেবের 'শুচা' নামে যে ছাগের উল্লেখ আছে, ঐ তারাকে সেই "অজ তারা" বলিয়া জানিবে। ঐ তারার গ্রীক্ নাম এইক্স (Aix) এবং ল্যাটীন্ নাম কেপেলা। (Capella.)

শিষ্য। এখন বুঝিলাম, স্কন্দদেবের পিতা অগ্নিদেব, তাঁহার এই সকল ছাগ লইয়া স্বীয় শিশুসন্তানকে খেলা দিতেন।

অগ্নির্ভূত্বা নৈগমেয়ঃ ছাগবক্ত্রঃ বহুপ্রজঃ। ক্রীড়য়ামাস ষড়্বক্ত্রং......। ইত্যাদি কবি-কল্পনা নহে।

গুরু। পাশ্চাত্য তারা-চিত্রে তারা-সারথির কি আকৃতি অঙ্কিত আছে?

শিষ্য। প্রাচীন তারা-চিত্রে এক দেবতা—তাহার স্কন্ধে এক ছাগ এবং ইদানীন্তন তারা-চিত্রে—এক রাখাল—তাহার স্কন্ধে এক ছাগ—এই দুই মূর্ত্তি দেখিতে পাই।

গুরু। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিক লেখকগণ তারা-সারথির রথের খবর কি দেন? তারা-ছাগ তারা-সারথির সহচর কেন হইল, একথায় কি বলেন?

শিষ্য। তাঁহারা হতাশ হইয়া বলেন—তারা-সারথির রথ কোথায় তাহা জানি না, এবং তারা-ছাগ এই তারামণ্ডলে কেন স্থান পাইল তাহাও বুঝি না। এই দুই কথা লইয়া তাঁহারা অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকেন।

গুরু। বেদমতে সূর্য্যবিম্বই সূর্য্যের রথ যথা—

.........সূর্য্যং আধত্ত দিবি চিত্র্যং রথম্। (৪।৬৩।৭) ঋক্।

সূর্য্য-সারথির অশ্ব অজ, এই জন্যই পূষা অজাশ্ব নাম ধারণ করেন।

শিষ্য। বেদমতে পুষা, অশ্বিদেব, বাজী, পুষ্টিম্ভর, "মনুর্হিতঃ" এবং প্রেত-আত্মার পথ-প্রদর্শক। তিনি প্রেতআত্মাকে দ্যুলোকে পিতৃগণ-সমীপে লইয়া যান।

গুরু। পূষা দেবের ছিক্রু ভ্রাতা কে বলিতে পার ?

শিষ্য। বাইবেলের ঈশ্বর-দূত গেব্রিয়েল আমাদের পূষা-দেবের ছিক্রুভ্রাতা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ আমরা টালমড্ গ্রন্থে পড়ি, গেব্রিয়েল অগ্নিরাজ, বজ্রদেব এবং ফলদেব, গেব্রিয়েল মানববন্ধু এবং ইস্রেল-জাতির মৃত্যুদেব, অপিচ তিনিই তাহাদিগের প্রেত আত্মার রক্ষক।

সপ্তর্ষি-মণ্ডল।

গুরু। সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের তারা-ভল্লুক এবং বৃহৎ রথ ও ভারতের চিত্রশিখণ্ডিমণ্ডল ঃ ঋগ্বেদে তারা-ভল্লুকের কোন উল্লেখ আছে ?

শিষ্য। ভূলোকের রাজা মনু, দ্যুলোকে 'যমরাজ' নামে খ্যাত এবং তাঁহার রাজসভার সদস্য সপ্তর্ষিগণ বেদে 'পিতৃগণ' নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তর্ষিগণের ঋক্ষরূপ আমরা (১। ২৪। ১০) ঋকে পড়ি। যথা——

অমী যে ঋক্ষাঃ নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশে কুহচিদ্দিবেয়ুঃ ॥

কিন্তু এস্থলে আমার ব্যক্ত করিতে হয় যে, ভাষ্যকার সায়ন 'ঋক্ষা' অর্থে ভল্লুক বলিয়া অবশেষে এলোপাক দিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মোক্ষ-মূলার–(Maxmuller) প্রমুখ পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণ উক্ত বেদমন্ত্রের ঋক্ষ অর্থে ভল্লুক—কোন মতেই বলিতে চাহেন না।

গুরু। সায়ন বাজসনেয়িগণের মতাবলম্বনে ভল্লুক অর্থ করিয়াছিলেন এবং শতপথ-ব্রাহ্মণ-পাঠে (২।১।১।৪) দেখি, মহর্ষি কণ্ব বাজসনেয়িগণের মত সমর্থন করেন। আমরা আরও (৮। ৬৩। ৪) ঋকে দেখি যে, ঋক্ষপুত্র আর্ক্ষ শ্রুতবান্ অগ্নিসমীপে পুষ্টিলাভ করেন।

তুলনা কর, প্রাচীন গ্রীকগণ বলিতেন যে, বৃহৎ ভল্লুকের পালিত পুত্র জিউস্‌দেব। (Zeus)

লাটীন্‌গণের জুপিটর দেব (Jupiter) এইজ কেপেলা (Aix capella) অজ-দুগ্ধ-পানে পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে আর্ক্ষ শ্রুতবান্‌কে সপ্তর্ষিপুত্র বৃহস্পতি বলিতে পারি।

শিষ্য। বুঝিলাম, বেদমতে বৃহস্পতি সপ্তর্ষি-ভল্লুক-পুত্র।

(ক্রমশঃ)

তারাদর্শক।

কলা ও বিজ্ঞান।

ভাবপ্রবণতাই মানবের বিশেষত্ব। মানবের অন্তর্জগতে অবিরতই সৃষ্টি-কার্য্য চলিতেছে। মানব-মন স্বরচিত জগৎ আপনাতে মগ্ন ও প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না; ইহার পক্ষে আত্মগোপন করা একেবারে অসম্ভব। রচনা করা যেমন মনের ধর্ম্ম, রচনা করিয়া ব্যক্ত করাও তেমন মনেরই ধর্ম্ম; ইহার ফলে মানবের চতুর্দ্দিকে গৃহ, প্রস্তর-মূর্ত্তি, পুস্তক, আলেখ্য প্রভৃতি সঞ্জীভূত; আর সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি সর্ববিধ কলাই তাহার চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত। বাহিরের কার্য্যসমূহ মানসিক সৃষ্টির ফল বা নিদর্শন মাত্র। শুদ্ধ যে বাক্যপুঞ্জ বা ভাষাই ভাব-সমষ্টিকে প্রকাশ করিতে চায় তাহা নহে, শিল্প, কলা প্রভৃতি সকল মানবীয় নৈপুণ্যই ভাবের প্রকাশক বা বাহক।

যাহা ভাবকে পরিব্যক্ত করিতে পারে তাহাই ভাষা। স্থাপত্য, তক্ষণ-কার্য্য, চিত্রকার্য্য, কাব্য প্রভৃতি এক একটি কলা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ইহারাও প্রত্যেকেই উচ্চশ্রেণীর ভাষা। ভাবের দ্যোতক বলিয়া, অমূর্ত্ত ভাবকে মূর্ত্ত করিতে পারে বলিয়া, ইহারা অতীব মূল্যবান্, নতুবা স্বতন্ত্রভাবে অসার ও তুচ্ছ। চিত্রকর যখন কোনও দৃশ্য অঙ্কনে কৃতকার্য্য ও নিপুণ হন, তখন তিনি কতকগুলি ভাবকে ব্যক্ত করিবার উপযোগী যন্ত্র সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন মাত্র। চিত্রকরের পক্ষে চিত্র ভাবপ্রকাশ করিবার একটি যন্ত্র; সুতরাং ইহাকে একপ্রকার ভাষাই বলিতে হইবে। এই ভাষার সৌন্দর্য্য, চিত্রকরের ভাবের সজীবতার ও গভীরতার উপর নির্ভর করে। চিত্রকরের পক্ষে এই ভাষাকে সুচারু করা যত কঠিন, কবির পক্ষেও কাব্য-ভাষাকে সুচারু করা ততই কঠিন। চিত্রকরের রেখাঙ্কনের ভাষায় যেরূপ সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্মতা, বিশুদ্ধতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কবিরও সেইরূপ শব্দ-যোজনা, স্বর-মাধুর্য্য, বিশুদ্ধতা ও শব্দ-শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু এই বিশেষ বিশেষ গুণাবলী, চিত্র ও কাব্যের উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে সহায় হইলেও, তাহাদের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার প্রতিপাদক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না; লিপিচাতুর্য্যের দ্বারা চিত্রের উৎকর্ষ নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ ভাষা ভাবের সহযোগিনী, কিন্তু অনেকসময়ে ভাব ও ভাষার শক্তির সীমা স্থির করা সুকঠিন হয়। ভাষাকে যেমন ভাবের অনুগমন

করিতে হয়, ভাবকেও তেমন অনেকস্থলে ভাষার উপর নির্ভর করিতে হয়; কারণ ভাষার কিছুমাত্র অঙ্গ-বিপ্লব বা বিকৃতি ঘটিলেই ভাবের সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়—ভাব অন্তরে সৃষ্ট হইয়াও বাহিরে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে না। উদ্দাম ভাবকে সংযত করায় ভাষার আর এক শক্তির পরিচয়, কিন্তু চিন্তা যতই গভীর হইতে থাকে ও উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে, ততই ভাষার প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে প্রস্তুত হয়। সেক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই রচনা-শক্তির গৌরব ও প্রধান লক্ষ্য। ভাব, আড়ম্বর-পূর্ণ জটিল ভাষাচ্ছদের দ্বারা আবৃত হইলে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, অথচ অনলঙ্কৃত সামান্য শব্দ-সমষ্টি বা রেখা-পুঞ্জের মধ্য দিয়া আপনার সত্তা ও সৌন্দর্য্য পরিব্যক্ত করিবার সুযোগ পায়। গভীর ভাব, স্বচ্ছ আবরণের উপর অতিসহজেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। উজ্জ্বল ভাষার হৈমী ছটা বা অত্যধিক উচ্ছ্বাস, ভাবের বৈচিত্র্য-প্রকাশের পক্ষে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। যাহা ভাবকে অন্তর্দ্দেশ হইতে বহির্দ্দেশে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে, তাহাই প্রকৃত প্রাণময়ী ভাষা; সেই ভাষাই শক্তিময়ী ও সম্পন্নময়ী। এই ভাববাহিনী ভাষা, সৌন্দর্য্যপ্রিয় চিত্রকরের উজ্জ্বল চিত্র এবং ভাবপ্রবণ কবির সজীব কাব্য। অতএব কাব্য একটি ভাব-চিত্র, আর চিত্র একটি ভাব-কাব্য, ফলতঃ কাব্য ও চিত্র উভয়েই প্রকৃত ভাষা।

ভাষাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা প্রকাশক ও প্রসাধক। যে পরিমাণে ভাষা ভাবকে ধারণ ও বহন করিতে পারে, তৎপরিমাণে ইহা প্রকাশক। যখন ভাষার শক্তি কেবল আপনার অঙ্গ-সৌষ্ঠব-সাধনে বা বেশ-বিন্যাসে প্রযুক্ত, তখন ইহার মুল্য অতি কম। ভাষার সেই ভাব-বর্জ্জিত অন্তঃসারশূন্য অংশটুকুকে প্রসাধক মাত্র বলা যাইতে পারে। কাব্য, চিত্র প্রভৃতি সকলপ্রকার ভাষাই ভাবের বিগ্রহমাত্র। এই বিগ্রহ, ভাবের দ্বারা বিভাবিত না হইলে, আপনার সজীবতা ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে। চিত্রের বহির্ভাগকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করা এবং চিত্রের মধ্যে গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবকে ফুটাইয়া তোলার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। ভাব ও ভাষার মধ্যে ভাবেরই গরিষ্ঠতা স্বীকার্য্য; কারণ ভাব, ভাষার জীবন ও স্রষ্টা, আর ভাষা ভাবের দেহ, উপলক্ষ বা প্রতিকৃতি মাত্র। এক চিত্রের সহিত অন্য চিত্রের তুলনা-কালে ভাবপ্রকাশ-সামর্থ্যকেই আদর্শ ধরিয়া বিচার করা বিধেয়। চিত্রের বাহ্য পারিপাট্য বা সুচারু অঙ্গ-বিন্যাস, কণামাত্র ভাবকেও

শ্রেষ্ঠতায় অতিক্রম করিতে পারে না। ভাষা কখনও ভাবের স্থান অধিকার করিতে পারে না এবং তাহার প্রকৃত মূল্য দিতে পারে না। বস্তুতঃ ভাব অদ্বিতীয় ও অমূল্য। ভাবই কেবল ভাবের মূল্য দিতে সক্ষম।

হৃদয়ের ভাবপুঞ্জকে সুব্যক্ত করাই সকল প্রকার ভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য, অতএব কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রত্যেক কলাই হৃদয়ের "জীবন্ত ভাষা"। এই ভাষাই সুপ্ত হৃদয়কে উত্তেজিত ও জাগরিত করিতে পারে। অতএব ইহা এক অন্তর্দ্দেশ হইতে অন্য অন্তর্দ্দেশে গমনাগমনের প্রধান পথ এবং অন্তরে-বাহিরে অবাধগতি। ইহারই দ্বারা এক প্রাণ অন্যপ্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে এবং এক হৃদয়ের উচ্ছাস ও স্পন্দন অন্যহৃদয়ে স্থান পায়। বাহ্য প্রকৃতির অনুকরণ করাই কলার বা ভাষার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধরিলে, ইহার পরিধি অতীব সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে; কারণ শুধু অনুকরণ বা বাহ্যপ্রকৃতিকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করা ইহার একটি দিক্ মাত্র। সেই দিক্‌কে কলার বাহ্য বা প্রাকৃতিক দিক্ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া ইহার আর এক দিক্ আছে, যাহার নাম মানসিক। এখানে কলা মৌলিক ও সৃষ্টিশীল, কারণ ইহা বাহ্য প্রকৃতিকে আপনার ছাঁচে ঢালিয়া লয়—বাহ্যজগৎকে চিন্তা-বীথিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আবার নব সজ্জায় বাহির করিয়া আনে।

এখন বিষয়টাকে স্পষ্ট করিয়া দেখা যাউক্। স্থাপত্য-কলায় বাহ্য দিক্‌টার প্রাধান্য দেখা যায়, কারণ এখানে বস্তুগত উপাদান সুবিন্যস্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তক্ষণ-কলাও বস্তুগত ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, এখানে প্রস্তরফলক প্রভৃতি জড়বস্তুর সাহায্যে জীবন্তবৎ প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হয়, সুতরাং ইহাতে উপাদান ও উদ্দেশ্যের বা আদর্শের মধ্যে যত প্রভেদ আছে, স্থাপত্যকলায় তত নাই বলিয়া, তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। চিত্র, কাব্য ও সঙ্গীতে বাহ্য উপাদানের প্রভাব খুবই কম। এখানে সামান্য বর্ণ ও ধ্বনির দ্বারা হৃদয়কে আবেগময় ও ভাবময় করিয়া তোলা ও উচ্চ ভাবকে ব্যক্ত করা একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব এ স্থলে শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়ের যথেষ্ট স্থান আছে। কলা-নিচয়ের মধ্যে যে যতটা বস্তুতন্ত্রতাহীন ও ভাবতন্ত্র হয়, সে ততই সৃষ্টিশীল ও স্বাধীন এবং সে ততই অন্যহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। ফলতঃ, কলা-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তর, ভাবরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সাক্ষী স্বরূপ। চিত্রপট, প্রস্তর-ফলক প্রভৃতি অতি সামান্য উপাদানের সাহায্যে উচ্চ ভাব বা আদর্শকে সুব্যক্ত করা এবং এক হৃদয়ের নীরব ভাষা অন্যহৃদয়ে

ক্রামিত করাই ইহার প্রধান কার্য্য। অতএব কলা—নিম্নস্তরে সৃষ্ট প্রকৃতির অনুসৃষ্টি করার যন্ত্র বটে, কিন্তু উচ্চস্তরে ভাবপুঞ্জের স্মারক ও উদ্বোধক। এই উচ্চস্তরে স্রষ্টা অর্থাৎ শিল্পী বাহ্যরূপের সেবক নহেন, মনোরাজ্যের রাজা। সংক্ষেপতঃ, প্রত্যেক কলায় তিনটি জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়;—ভাব, ভাষা এবং ভাষায় ভাবের প্রকাশ। ভাব ভাষার প্রাণ, ভাষা ভাবের বিগ্রহ এবং এই বিগ্রহই ভাবের অভিনয়ের ক্ষেত্র।

এখন কলা ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাউক্। ব্যক্তিগত মানব-জীবনে যেরূপ জ্ঞানের ক্রম-বিকাশ দৃষ্ট হয়, জাতীয় জীবনেও ঠিক্ তদ্রূপ। শৈশবাবস্থায় বাহ্য অসম্বদ্ধ ঘটনাপুঞ্জ, প্রকৃতির রূপ-প্রবাহ লইয়া মানবের চিত্ত অধিকার করে, সুতরাং বহির্জগৎ তাহার জ্ঞানোন্মেষের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হয়। তাহার পক্ষে প্রকৃতি তখন দৃশ্যপট মাত্র। তখন তাহার মানসপটে কত নব নব চিত্র ভাসিয়া উঠে, আবার সরিয়া যায়। তাহার পর আবার এই বিচ্ছিন্ন চিত্রাবলীকে ঐক্যসূত্রে নিবদ্ধ করিবার প্রেরণা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন সে অনিয়ম হইতে নিয়মের অভিমুখে যাইতে চায়—বিশৃঙ্খল ঘটনাপুঞ্জকে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চায়—বহুত্বের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পায়—এক ঘটনা বা বিষয় ছাড়িয়া ঐক্যের ভাব বা আদর্শকে আমন্ত্রণ ও বরণ করিয়া লয়। এইখানেই বিশ্বরূপ দৃশ্যমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন—এইখানেই বিশ্ব এক সার্থক জ্ঞানগর্ভ বিরাট্ গ্রন্থ! এইখানেই বিজ্ঞানের উদ্বোধন—এইখানেই মানব-সভ্যতার সূত্রপাত। এই ঐক্যভাবের অভ্যুদয়ে বিশ্বগ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, পত্রে পত্রে এক অপূর্ব্ব নবভাব প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। তখন মানব বাহিরের ঐক্য দেখিয়া আপনার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং হৃদয়গত ভাবপুঞ্জের অন্তরালেও ঐক্যের সন্ধান পায়। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বাহ্য পার্থক্যের পশ্চাতে এক বিশ্বজনীন মিলনের ভাব তাহার সমক্ষে ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ, প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের সাক্ষাৎকারে ও পরিচয়ে—বাস্তবের সহিত অ-বাস্তবভাবের সংযোগে মানবীয় জ্ঞান-জীবনের আরম্ভ। বিজ্ঞান এই বহির্জগতের ও তাহার অন্তরস্থ ঐক্য-ভাবের (The idia of unity) কিম্বা তাহার মূলসত্তার সংবাদ লইতে চায়, আর কলা সেই ভাব-সত্তাকে অন্তর্জগৎ হইতে বহির্জগতে আনিয়া ফেলিতে চায়। অতএব বলা যায়, এই 'আদর্শ' বস্তুকে প্রতিভাত ও প্রত্যক্ষ করা উভয়েরই লক্ষ্য—এই ভাব-রাজ্যই উভয়ের কেন্দ্রস্থল ও মিলনভূমি।

কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। এ জগতে প্রত্যেক বস্তু

পূর্ণতা লাভ করিবার শক্তি পাইয়াছে। উত্তরোত্তর বিকশিত ও বর্দ্ধিত হওয়া, ক্রমশঃ নবশক্তি লাভ করা, অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানে অধিকতর উপযুক্ত হওয়া—ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য্য। বিজ্ঞান, বস্তুনিচয়ের অভিব্যক্তির ইতিহাস মাত্র। অতএব ইহা যে কোনও ক্ষুদ্র বস্তু বা ঘটনাকে উপেক্ষা করিলে বা পরীক্ষা না করিয়া আশু বিশ্বাসসংস্কারে গ্রহণ করিলেই লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে। যাহা অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া 'মনে হয়'—তাহাকেও সাধনীয় ও সম্ভবপর করিবার চেষ্টা করা ইহার প্রধান কর্ত্তব্য। অসত্য ও কল্পিত বিষয়কে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং সত্যের সন্ধান ও সংস্থাপন করা ইহার ধর্ম্ম। সত্য ও অসত্য, শস্য ও কণ্টকের ন্যায় একত্র বিজড়িত বলিয়া উভয়কেই বর্জ্জন করা ইহার পক্ষে অনুচিত। কার্য্যে কিন্তু, প্রথমেই বিজ্ঞান, ঘটনাপুঞ্জের বা বস্তু-নিচয়ের সঙ্কলনে ও বিশ্লেষণে আপনার শক্তি ব্যয় করিয়া বসে। অতএব যতই উন্নত হউক্ না কেন, তথাপি ইহার অজ্ঞতার শেষ নাই—ফলতঃ, সত্যকে পূর্ণভাবে সম্ভোগ করা ইহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু কলা, সত্য বা ঐক্য-ভাবের প্রকটমূর্ত্তি। মানব-হৃদয়, ইহার উৎসঙ্গে চিরদিনই যে মানব-হৃদয়ে মিলনের আদর্শ, সত্য-সৌন্দর্য্যের আদর্শ অভিনয় করিয়া আসি-তেছে—সেই আদর্শকে মূর্ত্তিময় করিবার প্রেরণায় কলার উদ্ভব। এই বিরাট্ অনন্ত ঐক্য, সত্য সৌন্দর্য্য, মূলে এক বস্তু—এক মহাভাবের বা মহাদর্শের অন্তর্গত। এই মহাদর্শ সর্ব্বতোমুখ; ইহার বিভিন্ন দিক্ বা গতি, বিভিন্ন কলার প্রাণদান করিয়াছে। অতএব সকল কলাই এক যোগসূত্রে গ্রথিত—এক বিশ্বকলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এবং মহাদর্শ সেই বিশ্বকলার আত্মা। মানব-হৃদয় এই মহাদর্শকে অনুভব করিতে পারিলেই ভাবে বিভোর হইয়া উঠে। এই মহান্ অনন্ত আদর্শ পরিবর্দ্ধিষ্ণু নহে, সদা পূর্ণাঙ্গ। ইহাকে কোন নব ও সূক্ষ্ম নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। ইহা অসভ্য ও সভ্য উভয়েরই হৃদয়ে নিহিত পূর্ণ পবিত্র উজ্জ্বল রত্ন। অনন্তকাল ধরিয়া এই মহাভাবের স্রোত প্রবহমান! বিশ্বকলাও সুদূর অতীত হইতে ইহাকে বহন করিয়া আসিতেছে! অতএব, এই বিশ্বকলার জীবনও এক নিরবচ্ছিন্ন গতি মাত্র, ইহা ক্রমবিকাশের ধারা নহে। মহাদর্শ চিরকালই একরূপ, বিশ্বকলাও চিরকালই একরূপ, কিন্তু মানব মহাদর্শকে সমগ্রভাবে অখণ্ড-দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না বলিয়া, তাহার এক এক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে; সুতরাং মানবের বিভিন্ন কলা, মহাদর্শের বিভিন্ন দিকের মহাভাবের বিভিন্ন ভাব-কণার

বা তরঙ্গের সংবাদ দেয় মাত্র। কাজেই বিশ্বকলার রূপান্তর প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর নহে; বস্তুতঃ মানবীয় আংশিকখণ্ডদৃষ্টির সমক্ষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন দিক্— ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা পরিবর্ত্তন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যথার্থতঃ অতিপ্রাচীনকালে ইহার প্রভাব ও সৌন্দর্য্য যেমন ছিল, এখনও ঠিক্ তাই। প্রাচীনতম-যুগের পিরামিড্, ইলিয়াড্, রামায়ণ প্রভৃতি মহাদর্শের প্রকট মূর্ত্তিসমূহ, নবযুগের উন্নতজগতের বক্ষে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে! বর্ত্তমানের বক্ষে দাঁড়াইয়া সুদূর অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে পারিলেও, কোন প্রকারেই কলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে পারা যায় না। ইহা সুদূর অতীতের ভাব বা আদর্শের উজ্জ্বলতম রেখা স্ববক্ষে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাবপ্রবণ যন্ত্র অতীব পুরাতন হইলেও বর্ত্তমানের পুরোভাগে আসিয়া অতীত মানবীয় সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতই অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে ব্যবধান ঘটিতেছে, ততই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং সত্য ও সৌন্দর্য্য যে অতীত ও বর্ত্তমানের যোগসূত্র এবং সকল দেশ ও কালের অতীত, ইহা তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

বিজ্ঞানও এই মহাদর্শকে প্রত্যক্ষ ও স্পর্শ করিবার জন্য নব নব পন্থা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। কলা ও বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পন্থা বিভিন্ন। কলা অন্তর্মুখী, আর বিজ্ঞান বহির্মুখ। কলা মানব-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞান বাহ্য-প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের আয়োজন যথেষ্ট, পরিশ্রমও যথেষ্ট। বিজ্ঞান অতি ক্ষুদ্র বস্তুর বিশ্লেষণে কত শত বৎসর কাটাইয়া দিতেছে, কিন্তু আপনার চরম উদ্দেশ্যের সহিত যোগরক্ষা না করায় ইহার সকল প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এই বিপুল বিস্তীর্ণ যন্ত্রের বিরামও নাই, সন্তোষও নাই। ইহাকে প্রমাণের উপর প্রমাণ চাপাইয়া, অনুমানকে অনুমানের দ্বারা নিরাস করিয়া, পুরাতনকে বর্জ্জন ও নূতনকে গ্রহণ করিয়া, কত ধ্বংস, কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, প্রতিহতগতিতেই ছুটিতে হইতেছে। দূরবীক্ষণযন্ত্রের আবিষ্কারক জেকব মেটিয়ু স্বপ্রতিভাপ্রভাবে জগৎকে দিন কয়েকের জন্য মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু গ্যালিলীও তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া বিজ্ঞান-জগৎ হইতে বিদায় করিয়া দিলেন; তারপর কেপ্লার, গ্যালিলীওকে পরাভূত করিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া লইলেন; আর ডেকার্ট, কেপ্লারের আবিষ্কৃত বিষয়গুলির উন্নতিসাধন করিয়া তাঁহাকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বিজ্ঞান, নানা বৈজ্ঞানিকের চিন্তার মধ্য দিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নব নব কলেবরে বাহির হইয়া

আসিতেছে; অথচ আপনার চরম উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে না। ইহার ফলে, বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকের স্বার্থ-সাধনার এমন একটি উপায় বা সোপান হইয়া দাঁড়াইতেছে—যদ্দ্বারা একজন বিজ্ঞানোজ্জ্বল সুধী একটি নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই অন্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া এবং পদ-দলিত করিয়া যশঃ-শৌধ-শিখরে আরোহণ করিবার সুযোগ পান।

কলারাজ্য কিন্তু এইরূপ প্রতিযোগিতা ও জয়-পরাজয়ের স্থান নহে; ইহা শুধু মতসহিষ্ণুতা ও উদারতার প্রশস্ত ভূমি। এখানে শিল্পীদের অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রাবলী, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সমান স্থান অধিকার করে। চরিত্র-চিত্রণে শেক্ষপীর ও ড্যান্টে উভয়েই শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন; একজন অন্যজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট নহেন। এখানে সকল চিত্রকরই ভাব-গাম্ভীর্য্যে ও রচনা-মাধুর্য্যে অনুকরণীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং স্ব স্ব কল্পনারাজ্যের স্বাধীন অধিপতি। অনন্তশক্তির আধার মানব-মন মহাভাবের দ্বারা বিভাবিত হইয়া কত সুন্দর সুন্দর চিত্র, কত নব নব রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ এই মহা-ভাবের অসীম পরিধি ও অসংখ্য দিক্ এবং ইহার এই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন চিত্র সৃষ্ট হয়।

কাব্য শ্রেষ্ঠকলা বলিয়া পরিচিত; কারণ ইহা অতিসহজেই অব্যক্ত মহাদর্শকে বাস্তবে আনিতে পারে এবং হৃদয়কে ভাবের বন্যায় প্লাবিত করে। এই আদর্শের অনন্তগামী স্রোত, প্রতিভাকে নবালোকে অনুরঞ্জিত করিয়া, হৃদয়ে প্রেমের উৎস উন্মুক্ত করিয়া এবং তৎসঙ্গে কাব্য-জীবনেও তরঙ্গের পর তরঙ্গ—গতির পর গতি আনিয়া, যুগযুগান্তর ধরিয়া বহিয়া যাই-তেছে। এই মহাভাব চিরপ্রবাহ-ময় অথচ নিত্য নব। সমগ্রভাবে ধরিলে ইহার জীবনে উচ্ছ্বাস বা অবসাদ নাই। ভাব-বন্যার "জোয়ার-ভাটা" দৃষ্টি-ভ্রমের ফল মাত্র। সেইরূপ বিশ্বকলার জীবনে স্ফূর্ত্তি ও বিলোপ কেবল মনের ভ্রান্তি মাত্র। খণ্ডদৃষ্টির দ্বারা দেখিলে মনে হইবে যে, সময়ে সময়ে কাব্যাকাশে অন্ধকারের ঘনচ্ছায়া পতিত হয়, কাব্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সমগ্রতার ভূমিতে কাব্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। যখনই কাব্যকলার আবির্ভাব, তখনই ইহার পূর্ণভাবের বিকাশ। যখনই যে স্থানে ইহার বাণী উচ্চারিত হয়, তখনই সেস্থানে ইহার সকল বক্তব্য বিষয় বলিয়া ফেলে; আবার অন্যস্থানে অন্য সময়ে অক্ষুণ্ণ নবমহিমায় নবজীবন গ্রহণ করে। প্রত্যেক কবি-হৃদয়ই

নব অথচ পূর্ণ আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে, তাই প্রত্যেক কবি, তাহার নিজ কেন্দ্রে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ কবি—প্রত্যেক কবিই কাব্য-পটে নিজ মৌলিকতার লাঞ্ছন মুদ্রিত করিতে সক্ষম। কাজেই নব নব কবির অভ্যুদয়ে নব নব কাব্যের আবির্ভাব হয়। সকল কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য—কেহ কাহারও অন্তরায় নয়। সকল কাব্যই আদিসৃষ্টি এবং বিশ্ব-কাব্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র—মহাভাবের বিভিন্ন বিভাবের বা দেশের বিকাশ মাত্র। মানব-হৃদয় ঐক্য—সত্য—সৌন্দর্য্যরূপ মহাদর্শকে অন্তরে-বাহিরে, সমষ্টিতে-ব্যষ্টিতে অরূপে-সরূপে নূতনে-পুরাতনে, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকালে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই জন্যই বিভিন্ন কলার সৃষ্টি—এই জন্যই সকল হৃদয় এক স্পন্দনে স্পন্দিত; সকল প্রাণ এক ভাব-তরঙ্গে নর্ত্তিত এবং সকল ভাষা এক নীরবভাষায় মুখরিত।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সরকার এম্ এ

কামরূপ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

এই জলস্রোতের মধ্যে সারি সারি ৩ খানা বৃহদায়তন মসৃণ পাষাণ আছে। প্রবাদ—এই ৩খানা পাথরের উপর বসিয়া বশিষ্ঠদেব যথাক্রমে ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। আমি জামা জুতা ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'স্বপ্নোনুমায়ানু মতিভ্রমোনু?"—মনে হইতে লাগিল, বশিষ্ঠদেব যেন এখনও এইখানে বর্ত্তমান-আছেন! বোধহয় ফল-মূলাদি আহরণার্থে এই পার্শ্বস্থ পর্ব্বতোপরি বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন! সায়ংকাল আগতপ্রায়—এখনই ফিরিয়া আসিবেন। বশিষ্ঠের স্মৃতির সাথে সাথে আর একটি মূর্ত্তি স্মরণ-পথে আসিল। সেই মূর্ত্তিটিই বশিষ্ঠের বশিষ্ঠত্বের জ্ঞাপক—সেই মূর্ত্তিটিই বশিষ্ঠ-স্বর্ণের নিকষণ-শিলা, সে মূর্ত্তিটি অধ্যবসায়-বিগ্রহ বিশ্বামিত্র।

তখন মনে হইতে লাগিল—বিশ্বামিত্রের রাজবেশে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ, হোম-ধেনুর প্রতি অযথা লোভ, বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যান, সসৈন্যে তাহার প্রতি আক্রমণ, ব্রহ্মতেজে পরাভূত হওয়ায় আত্মনির্ব্বেদ ও—"বলংবলং ব্রহ্মবলং"—এই সত্যের উপলব্ধি হওয়ায় তপস্যায় গমন, কত বাধা কত বিঘ্ন,

কত পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া, কত কঠোর ব্রত করিয়া, কত তীব্র অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া রাজর্ষিত্ব-লাভ, তাহারপর বশিষ্ঠের প্রতি ঈর্ষায় তাঁহার শতপুত্র-নাশ, অবশেষে বশিষ্ঠনাশক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তাহাতে বশিষ্ঠকেই বরণ, ক্ষমাবতার বশিষ্ঠের অচল অটল ও নির্ভীক চিত্তে প্রসন্নবদনে স্বনাশক-যজ্ঞে বরণ-গ্রহণ ও তাহার কর্ত্তব্য পালন! ইহাতেই বিশ্বামিত্রের চক্ষু ফুটিল—ইহাতেই বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভ হইল! তিনি বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের সিংহাসন কত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত! বিশ্বামিত্র সহস্র-বর্ষ পর্য্যন্ত কঠোরতম তপস্যার দ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া, এমন কি স্বয়ং বিধাতার সহিত প্রতিযোগিতায় সৃষ্টি করিবার শক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াও যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা অভিন্ন—ব্রহ্মণ্যদেব বশিষ্ঠদেবের একটি মাত্র জ্বলন্ত দৃষ্টান্তেই লাভ করিলেন। ধন্য গুরু বশিষ্ঠদেব! ধন্য শিষ্য বিশ্বামিত্র! এইরূপ গুরুই ইচ্ছা করিলে চণ্ডালকেও ব্রাহ্মণত্ব দিতে পারেন, আর এইরূপ শিষ্য চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন। যতদিন বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে অহঙ্কার ছিল, ততদিন ব্রহ্মত্ব পাইয়াছেন, ব্রাহ্মণত্ব পান নাই। যেই সেভাব ত্যাগ করিয়া বশিষ্ঠের পদমূলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, অমনি অনাহুত অবস্থায় ব্রাহ্মণত্ব তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিল! সেই বশিষ্ঠের পদরেণু-পুতশিলায় উপবেশন করিয়াছি—এ কথা স্মরণ হইতেই যেন ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল! অমনি ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্য আর একখানা ক্ষুদ্র পাষাণে সরিয়া বসিলাম। পরে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতে যাইতেছি, এমন সময় অদূরোপবিষ্ট পাণ্ডাঠাকুর শুধু জল খাইতে নিষেধ করিয়া, "বশিষ্ঠদেবের প্রসাদ" বলিয়া দুটি ভিজা ছোলা ও একটু লবণ আমাকে ও আমার সঙ্গী স্বামী যোগানন্দকে দিলেন। আমরা মহানন্দে প্রসাদ-গ্রহণ করিয়া করপুটে দুই তিন অঞ্জলি জল পান করিলাম। মনে হইল—সে সময়ের জন্য জল-প্রভাবে আমিও যেন তদ্বৎ নির্ম্মল হইলাম! সেই বশিষ্ঠ-তীর্থ-বারি যেন বশিষ্ঠ-চিত্তের ন্যায়ই নির্ম্মল এবং তাহার ন্যায় সুশীতল। আমি সঙ্গীত-বিদ্যায় একান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও তখন প্রাণের আবেগে গাহিতে লাগিলাম—

কুঞ্জে কুঞ্জে করপুটে মুঞ্জ মাধুকরী লুটে রে—
চর চর পান কর যমুনারি জল—রে—
(বল হরিবোল)
শ্রীকরতলে বাজায়ে মধুর মাদল—রে—(বল হরিবোল)

স্বামীজিও সজলনয়নে আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রোৎসাহিত করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দে আত্মহারা হইয়া গান করিলাম। পরে স্বামীজির আহ্বানে উপরে উঠিয়া তত্রত্য সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হইলাম। এই সন্ন্যাসীটি নাগা-সম্প্রদায়ভুক্ত, ইঁহার নাম সাধু অধরগির। বোধ হয়, গিরি—শব্দের অপভ্রংশই গির। আমরা উভয়ে আসিয়া পুনরায় সাধুর নিকট বসিলাম। সে দিন সাধুটির গাঁজা বা তামাক কিছুই ছিল না, তজ্জন্য তিনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে উহা কিনিতেও মিলে না। সাধু আমার সঙ্গের স্বামীজিকে দেখিয়া যেন অকূল সাগরের পারের তরী পাইলেন। সাধু মনে করিলেন; সন্ন্যাসী মানুষ নিশ্চয় গাঁজা খায়—দুই এক ছিলুম মিলিবে। তাই স্বামীজিকে বিশেষ যত্ন করিয়া কাছে বসাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, স্বামীজি পান, তামাক, গাঁজা, ভাঙ, কিছুই খান না, তখন নিতান্তই হতাশ হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু! তোমার কাছে চুরাট্ টুরাট্ কিছু আছে?" আমি "আছে" বলিয়া গুটি কতক বিড়ি বাহির করিয়া দিলাম। তখন সাধু মহাশয় মহানন্দে দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটাইতে লাগিলেন। পরে স্বামীজী সাধুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! অরুন্ধতীর আশ্রমটি কোথায়?" সাধু বলিলেন, "এই গঙ্গার পরপারে যে উচ্চ পাহাড় দেখাইতেছে, তাহার ধারে কিয়দ্দূর গেলেই উপর দিকে একটি বৃহৎ উপলখণ্ড ঝুলিতেছে—দেখিতে পাইবেন। তাহার উপর একটি বটবৃক্ষ হইয়াছে, নিম্নে পাথর আছে, তাহাতে তৈল সিন্দুর প্রভৃতি বিলেপিত আছে, দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। সেইটী অরুন্ধতী মাইকা আসন।" সাধু মাঝে মাঝে হিন্দিও বলেন, মাঝে মাঝে বাঙ্গালাও বলেন। মোটের উপর তাঁহার হিন্দি শুনিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালীর হিন্দি। যাহা হউক, আমরা তখনই সাধূপদিষ্ট পথে অরুন্ধতীর আসন দেখিতে ছুটিলাম। সাধু যে বর্ণনা দিলেন, তাহাতে কিছুই বুঝা গেল না; কেবল মনুষ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে করিতে চলিলাম। নদীতে অল্প জল ছিল, তাহা হাটিয়াই পার হইলাম। পার্ব্বত্য পথ। কিছুদুর গেলেই পদাঙ্ক লুপ্ত হইয়া গেল। তখন কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলাম। হেত্বাভাস লইয়া অনুমান করিতে গেলে যে ফল ঘটে, তাহাই হইল।

অনুমান অর্দ্ধ মাইল আরোহণের পর এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। বেলা তখন অবসানপ্রায়—দেখিয়া আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার

হইল। স্বামীজিকে বলিলাম, "দেখুন, আমরা যখন এখানে অদ্যকার রাত্রি থাকিবই, তখন আর অপরাহ্নকালে হিংস্রজন্তু-পূর্ণ নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল দুরারোহ পর্ব্বতে উঠিবার প্রয়োজন কি? কল্য প্রাতে দেখিলেই হইবে।" স্বামীজি আমার দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনার কি ভয় হইতেছে?" আমি বলিলাম "তা একটু হইতেছে বৈকি?" স্বামী বলিলেন—"তবে আপনি ফিরিয়া যান। আমরা ত সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে নিজদেহের প্রতিনিধি কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছি; আর আমাদের এদেহে মমতা কি?" তখন আমিও একটু হাসিয়া বলিলাম—"তবে চলুন, আপনার সঙ্গে যখন যাইব, তখন আমার ভয় কি?" এটি কিন্তু আমার প্রাণের কথা নহে; তবে করা কি? তখন আমার ফিরিয়া আসাও দায়, গতিকেই স্বামীজির সঙ্গে যাইতে সম্মত হইলাম। ভাবিলাম, প্রথম যেখানে যে অবস্থায় এই সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাইয়াছিলাম, তাহা না পাইলে আমার বিশেষ বিপন্ন হওয়ার সম্ভব ছিল। নিশ্চয়ই মা সর্ব্বমঙ্গলা আমার মঙ্গলের জন্যই ইঁহাকে পাঠাইয়াছেন। যখন আমি পুরুষকারের দ্বারা এ সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করি নাই, তখন পুরুষকারের দ্বারা ইহার সঙ্গত্যাগ কখনই কর্ত্তব্য নহে। ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে স্বামীজির সঙ্গে ক্রমান্বয় আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। তখন বেলা অবসান দেখিয়াই হউক্ আর পার্ব্বত্যসৌন্দর্য্যে উন্মত্ত হইয়াই হউক্ স্বামীজি হর হর বম্ বম্ ধ্বনি করিয়া পর্ব্বত-কন্দর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া উঠিতে লাগিলেন। সেখানে না আছে পথ, না আছে ধরিবার বৃক্ষাদি! পাহাড়ের গা বাহিয়া ওরূপভাবে দৌড়াইয়া উঠা অতি দুরূহ ব্যাপার! সামান্য পথ উঠিয়াই আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তদ্দর্শনে স্বামীজি বলিলেন—"আপনার বড় কষ্ট হইতেছে; এখানে একটু বসিয়া বিশ্রাম করুন। আমি আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া দেখি।" আমিও তাহাতে সম্মত হইলাম। কিন্তু তাঁহার বড় অধিক দূর যাইতে হইল না। অল্প সময় পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"ওদিকে এরূপ নিবিড় অরণ্য যে, তাহার মধ্যে আর প্রবেশ করিতে পারিলাম না।" তখন অগত্যা ফিরিয়া পুনরায় বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া সাধুর নিকট বিশেষভাবে পথের নিদর্শন সকল শুনিয়া লইয়া, তখনই আবার স্বামীজি রওনা হইলেন। আমিও গতিকেই তাঁহার সঙ্গ ধরিলাম। এবার অল্প আয়াসেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। এ স্থানও অতি মনোরম! উপরে বড় একখানা পাথর ছত্রাকারে ঝুলিতেছে।

তাহার উপর এক অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মিয়াছে। তাহা হইতে শুণ্ডাকারে কতকগুলি বোঁয়া নামিয়া মাটি পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। তন্নিম্নে সিন্দুর-শোভিত একখানা পাথর। তাহার পর বসিয়াই নাকি—অরুন্ধতী আরাধনা করিতেন। তাঁহার আসনে প্রণাম করিয়া, তাহার পার্শ্বে অন্য একখানা পাথরের উপর আমরা দুইজন উপবেশন করিলাম। স্বামীজি স্থান দেখিয়া পরমানন্দে ধ্যানে বসিলেন। "ব'সে থাকা চেয়ে বেগার দেওয়া ভাল" বিবেচনায় আমিও জপ করিতে বসিলাম, কিন্তু সে অধিকক্ষণ নহে। সূর্য্যাস্ত দেখিয়াই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু স্বামীজি আর চক্ষু মেলেন না। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙ্গিতেও সাহস হয় না! কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামীজি চক্ষু মেলিলে ধীর ও নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি আর কিছুক্ষণ এখানে বসিতে ইচ্ছা করেন?" স্বামীজি বলিলেন "হাঁ, আপনি আশ্রমে যান, আমি কিছুক্ষণ পরে আসিতেছি।" আমিও "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্রুতপদে বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া গাত্রবস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ঝরণার মধ্যবর্ত্তী উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া সায়ংসন্ধ্যায় মনোনিবেশ করিলাম। পরে রাত্রি অনুমান ৮টার সময় সাধুর নিকট আসিয়া দেখিলাম—স্বামীজিও আমার পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন একবার আহারের কথা মনে হইল। বিশুদ্ধ ঝরণার জল পান করিয়া পাহাড়ের উপর দৌড়াদৌড়ি করায় অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে! কিন্তু এ নিবিড় অরণ্যে খাইব কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

মধুর চরণে।

(মৃত্যু-দিন উপলক্ষে রচিত।)

হেরিয়া আকাশ-পথে দ্রুত ইরম্মদ,
সঞ্চারি তাড়িতশক্তি দেশের ভাষায়,
"অমৃতভাষিণী" তব "শ্বেতভূজা-পদ,"
করিলে শোভিত, দেব! নব সুষমায়।
মোহের আঁধার যবে, আবরি হৃদয়
ইষ্টদেব-দরশনে হয় অন্তরায়,

তাহার করুণ-চিত্র, ব্যাকুলতাময়—
রহিবে অঙ্কিত, সদা 'ব্রজ-অঙ্গনা'য়।
চির উদ্দীপনাময় 'বীরাঙ্গনা', নাম,
কম্পিত করিল যাহা সুষুপ্ত শ্রবণ,
তাহার প্রভাবে, আজি কত ধন্য ধাম
বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি বঙ্গে করে নিরীক্ষণ!
প্রতিভায় দীপ্ত, যেন মধ্যাহ্ন তপন,
প্রণাম করিছে স্মৃতি তোমার চরণ।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান-সহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১

সান্বয়ব্যাখ্যা। শ্রীভগবানুবাচ। ইদং গুহ্যতমং (গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাৎ গুহ্যতমং) বিজ্ঞান-সহিতং (বিজ্ঞানমৌপাসনং তৎসহিতম্) জ্ঞানং (ঈশ্বর-বিষয়ং) অনসূয়বে (অসূয়ারহিতায়) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি। যৎ জ্ঞাত্বা (যজ্‌জ্ঞানং প্রাপ্য) অশুভাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তোভবিষ্যসি)। ১

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, তুমি আমাতে দোষদৃষ্টিহীনতাবশতঃ অসূয়াশূন্য, এজন্য তোমাকে বিজ্ঞানসহিত আত্মজ্ঞান কহিতেছি; ইহা অবগত হইলে, তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।১

আলোচনা। কর্ম্ম ও উপাসনাদ্বারা দেহান্তে পুনরাবৃত্তি ও মুক্তি এই উভয়ই পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য এবং জ্ঞেয়-ব্রহ্ম নিরূপণপূর্ব্বক জ্ঞান-নিষ্ঠ পুরুষের কিরূপ গতি হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য

এই নবম অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞান গুহ্যতত্ত্ব, দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান তদপেক্ষা গুহ্যতর এবং পরমাত্মজ্ঞান ঐ আত্মজ্ঞান অপেক্ষাও রহস্যময় বলিয়া গুহ্যতম। রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিত ও সংযমী না হইলে, কেহ এই আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে সংযমাদিগুণযুক্ত এবং ভগবানে দোষদৃষ্টিহীন ও ভক্তিমান্ জানিয়া এই বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানতত্ত্ব—যে জ্ঞান লাভ করিলে, মানব, সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না, সেই জ্ঞানতত্ত্ব কহিতেছেন। অনধিকারীকে জ্ঞানতত্ত্বের উপদেশ দিলে বিপরীত ফল হয়, এজন্য সাধারণের সমক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। অনধিকারীর অপব্যবহারের ফলে মহৎ অনিষ্ট সম্ভব—এইজন্য মন্ত্র ঔষধাদি গোপন করিবে অর্থাৎ অযোগ্য পাত্রে স্থাপন করিবেনা, ইহাই শাস্ত্রের আভাস।১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২

সান্বয়ব্যাখ্যা। ইদং (জ্ঞানং) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা) রাজগুহ্যং (গুহ্যানাং রাজা, বিদ্যাসু গোপ্যেষু চ অতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) পবিত্রং (অতিপাবনং) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টঃ অবগমো বোধঃ যস্য, দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ) ধর্ম্ম্যং (সর্ব্ব-ধর্ম্মাত্মকং) কর্ত্তুং সুসুখং (সুখসম্প্রাপ্যং সুখেন কর্ত্তুং শক্যং) অব্যয়ম্ (অক্ষয়ফলকম্)।২

বঙ্গানুবাদ। এই আত্মবিদ্যা, সকল বিদ্যার রাজা, সকল গুহ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠ, উত্তম পবিত্র, প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, ধর্ম্মসম্মত এবং অক্ষয়ফলপ্রদ। ২

আলোচনা। লৌকিকবিদ্যা বা শাস্ত্রপঠিত বিদ্যা অপেক্ষা পারমার্থিকী বিদ্যা শ্রেষ্ঠা, এই জন্য আত্মজ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব মাত্রেই গুহ্য রহস্য-যুক্ত, আত্মজ্ঞান তৎসমস্ত হইতে গুহ্যতম। বস্তুমাত্রই যেমন অপব্যবহারের ফলে অনিষ্টজনক হয়, তদ্রূপ অধ্যাত্মবিদ্যাও অনধিকারীর পক্ষে নিষ্ফলা এবং অপকারকরী। ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ্য নয়, গুহ্যতম—এজন্য ইহাকে রাজগুহ্য বলা হইয়াছে। পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষের দ্বারা লোকের পাপ-বিশেষেরই বিনাশ হয়। আত্মজ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বজন্মকৃত ও বর্ত্তমানদেহকৃত পাপ-নাশ হয় এবং ভবিষ্যৎ-জন্মজন্য কর্ম্মপাশের সূচনাও নষ্ট হয়, এইজন্য আত্মজ্ঞানকে 'উত্তম পবিত্র' বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞান-লাভ হইলে যে পরমানন্দের উপলব্ধি হয়, তাহা আত্মজ্ঞানীই প্রত্যক্ষানুভব করেন। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাত্মক কার্য্য দ্বারা যে লাভ হয়, আত্মজ্ঞানী তাহা লাভ করিতে পারেন, এইজন্য 'ধর্ম্ম্য' বলা হইয়াছে।

যাগযজ্ঞাদি বহুআয়াসসাধ্য এবং বহুব্যয়সাধ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ। তাহার অঙ্গহানি হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। আত্মজ্ঞান কেবল শ্রবণ মনন বিচারণাদি দ্বারা আত্মনির্ভরতায় লব্ধ হইতে পারে, এইজন্য সুখসাধ্য বলা হইয়াছে। ইহা সুখসাধ্য হইলেও ইহার ফল অক্ষয়। কর্ম্মযোগের ফল যেমন নির্দ্দিষ্ট-কালীন স্বর্গাদিভোগের অন্তে ক্ষীণ হইয়া যায়, জ্ঞানযোগের ফল সেরূপ ক্ষয় পাইবার সম্ভব নাই, এজন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য (আত্মজ্ঞানরূপস্য ধর্ম্মস্য) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য স্বরূপে তৎ ফলে চ নাস্তিকাঃ) পুরুষাঃ মাং (পরমেশ্বরং) অপ্রাপ্য মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যু-যুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ তস্য বর্ত্ম নরকতির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গঃ তস্মিন্) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ)। ৩

বঙ্গানুবাদ। এই আত্মজ্ঞান-ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩

আলোচনা। আত্মজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তম পবিত্র ও সুখলভ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ হইলে মনুষ্যগণ ইহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির কারণ। যে পর্য্যন্ত জীবের ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য তৎপ্রতি শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তাবৎকাল জীব নানাযোনি ভ্রমণ করতঃ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। ৩

ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

সান্বয়ব্যাখ্যা। অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন অতীন্দ্রিয়স্বরূপেণ) ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং (সর্ব্বতোব্যাপ্তং) (তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ) সর্ব্বভূতানি (আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তানি) মৎস্থানি (কারণভূতে ময়ি স্থিতানি) অহং চ (আকাশ-বৎ নির্লিপ্তত্বাৎ অসঙ্গঃ চিদ্রূপঃ) তেষু (সর্ব্বভূতেষু) (ঘটাদিষু মৃত্তিকা ইব) ন অবস্থিতঃ। ৪

বঙ্গানুবাদ। আমি অব্যক্তরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। ৪

আলোচনা। এই নশ্বর জগতের সমস্তই সেই ভগবৎসত্তায় প্রকাশমান। তিনি না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। ছান্দোগ্য-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ আমি (পরমাত্মা) জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ (জগৎ) প্রকাশ করি। তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার সত্তা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এজন্য অব্যক্ত। তাঁহার সত্তায় বস্তু সকল সত্তাবান্ বটে, কিন্তু বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান্ নহেন, কারণ বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু তিনি অনাদি ও নিত্য। বস্তু সকল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, কিন্তু তিনি কাহারও আশ্রিত নহেন। ভগবান্ বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট—ইহা বেদাদির উক্তি এবং ইহা জ্ঞানগম্য। সৃষ্ট বস্তুতে স্রষ্টার মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে না, কিন্তু স্রষ্টার ভাব থাকে। একই দেব-মূর্ত্তি বিভিন্ন চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত হয়, সে স্থলে উভয় চিত্রকরের যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই সেই সেই চিত্রকরের ভাব; চিত্রকর সেই চিত্রে সেই ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। একবিষয়ঘটিত গ্রন্থ বিভিন্ন গ্রন্থকারের দ্বারা লিখিত হয়, নিজ বৈশিষ্ট্য দ্বারা সেই সেই গ্রন্থকার স্ব স্ব ভাবে সেই সেই গ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট বলা যায়। ভগবান্ ঘটাদিতে মৃত্তিকার ন্যায় লিপ্ত নহেন, আকাশাদির ন্যায় নির্লিপ্ত, এজন্য তিনি সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়াও কিছুতেই অবস্থিত নহেন। ৪

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫

সান্বয়ব্যাখ্যা। মে (মম) ঐশ্বরং যোগং (ঐশ্বরং অসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটনঘটনচাতুর্য্যং) পশ্য। ভূতানিচ (ব্রহ্মাদীনি) (মম অসঙ্গত্বাৎ) ন মৎস্থানি, মম আত্মা (পরং স্বরূপং) ভূতভৃৎ (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) চ (তথাপি) ভূতস্থঃ ন (মদীয়-যোগমায়া-বৈভবস্যা-বিতর্ক্যত্বাৎ ন কিঞ্চিদ্বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি এবং অহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি নিরহঙ্কারত্বাৎ তেষু ন তিষ্ঠামি)।৫

বঙ্গানুবাদ। তুমি আমার অসাধারণ যোগ-প্রভাব দর্শন কর। আমি ভূতসকলের ধারক ও পালক, অথচ আমি ভূতবর্গে অবস্থিত নহি, এই ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নয়। ৫

আলোচনা। এই চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক আলোচনা করিলে, আপাততঃ কেমন অসঙ্গতি বা বিরুদ্ধভাব বোধ হয়। ভগবদ্বাক্যে কখনও অসঙ্গতি বা

বিরুদ্ধভাব থাকিতে পারে না। ভগবানের যোগমায়া অবিতর্ক্য। তাঁহার অঘটন-ঘটনচাতুর্য্য অতুলনীয়। ভগবান্ বলিয়াছেন—"আমার যোগপ্রভাব দর্শন কর। আমি এই সকল ভূতের ধারক ও পালক। এই সকল ভূত আমাতে অবস্থান করেনা, আমিও ভূতসকলে অবস্থিতি করি না।" ভগবানের একথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ করিয়া অর্জ্জুন অপরাধী হন নাই। ভগবান্ পূর্ব্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন "ভূত সকল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি" এক্ষণ বলিতেছেন যে "ভূত সকলও আমাতে অবস্থিতি করেনা, আমিও ভূত সকলে অবস্থিতি করি না" ইহার সঙ্গতি কোথায়? ভগবান্ অসঙ্গ নির্লিপ্ত, এ হেতু কিছুতেই অবস্থিত নহেন, ইহা পূর্ব্বশ্লোকের আলোচনায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে কথা এই, ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম, তিনি বিশ্বের উৎ-পাদক ধারক পালক। তিনি ভূত সকলে লিপ্ত না থাকিয়া উৎপাদন, ধারণ ও পালন করিতে পারেন, কিন্তু জীবসকল তাঁহাতে অবস্থিতি না করিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারে? প্রকৃতপ্রস্তাবে—জীবের সহিত দেহের যে সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত সংসারের সেই সম্বন্ধ। জীব যেমন দেহকে ধারণ করিয়া আছে, দেহকে পালন করিতেছে, সেইরূপ ঈশ্বরও জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, পালন করিতেছেন—সত্য, কিন্তু জীব অহংকারবশতঃ দেহকে 'আমার' বলিয়া মনে করে ও দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, আর ভগবান্ নিরহঙ্কার, তাঁহার অহংভাব নাই, সুতরাং তিনি সংসারকে তাঁহার বলিয়া মনে করেন না, এবং সংসারের সহিত সংশ্লিষ্টও নহেন। অহঙ্কার ভিন্ন সংশ্লেষের সম্ভাবনা নাই। অহংবোধই অন্য হইতে পৃথক্ জ্ঞান করায়। ভগ-বানের অহংকার নাই, সুতরাং তিনি জীবে অবস্থিতি করেন—বা জীব তাহাতে অবস্থিতি করে এবং জীব ও তিনি পৃথক্—এই যে ভাব—এই জীবের ভাব তাঁহার নাই। ঈশ্বর যখন সর্ব্বময়, তখন তিনি কাহা হইতে আপনাকে পৃথক্ জ্ঞান করিবেন? এই পৃথগ্‌ভাব নাশ পাইলে জীব ব্রহ্মত্ব পায়। এইরূপ মর্ম্মেই ভগবান্ বলিয়াছেন—"আমিও ভূতে অবস্থিত নয়, ভূতসকলও আমাতে অবস্থিত নয়।"৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

ধর্ম্মরক্ষক।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ প্রতি যুগেই দুষ্ট-দমন, শিষ্ট-পালন এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মময়, সুতরাং ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দেখিলেই তাঁহার প্রাণ অস্থির হয়।

ধর্ম্ম জগন্মঙ্গলহেতু। ধর্ম্ম ব্যতীত কখনও কেহ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং—ধর্ম্ম সর্ব্বদা ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া থাকিলে কদাচ অবনতি হইতে পারে না। যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্বের বীজ স্বীয় হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয়ে পরমানন্দ-মহীরুহের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তাঁহার সকল প্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়। শ্রীরামায়ণে আরণ্যকাণ্ডে আছে—

ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখং।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্ব্বং ধর্ম্মসারমিদং জগৎ॥

ধর্ম্ম হইতে অর্থ এবং সুখ হয়; ধর্ম্ম দ্বারা সকল বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে; অতএব এ জগতে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। সুবুদ্ধি মানবেরা অতিশয় যত্ন-সহকারে নানাবিধ নিয়ম দ্বারা শরীর কৃশ করিয়াও ধর্ম্মলাভ করেন, কারণ শারীরিক সুখদায়ক উপায় দ্বারা পারত্রিক সুখ-হেতু ধর্ম্মলাভ করা অসম্ভব। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিবিধ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শ্রীমহাভারতে লিখিত আছে—

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ধারণ-সংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

ধারণ করেন বলিয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রজাগণকে ধারণ করিয়া আছেন। ধর্ম্ম মনুষ্যজীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় আশ্রয়। এই আশ্রয়চ্যুত হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ পায়। শাস্ত্র বলেন "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—অর্থাৎ ধর্ম্মহীন ব্যক্তিগণ পশুর সমান। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শ্রীভগবান্ যে ধর্ম্ম-স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই নিত্য, সত্য, সনাতনধর্ম্ম। "বেদপ্রণিহিতো-ধর্ম্মোহ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" আমাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া শ্রীভগবান্ অথবা তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ যে সনাতনধর্ম্ম প্রচার

করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য ও সেব্য। এই ধরাধামে শ্রীভগবান্ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি দেখিলেই দেশ-কালোচিত শিক্ষা-প্রদান করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। ধর্ম্ম এক—উহা সাম্প্রদায়িক নহে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের এই সনাতনধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও প্রাচীনতম। এই ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক উপদেশ সকল যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তদ্রূপ আর কোন ধর্ম্মেরই নহে। বহু সিদ্ধ সাধকের বহুকালের পরীক্ষায় এই সনাতন ধর্ম্ম অভ্রান্ত-সত্যরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

যদিও ধর্ম্মপদার্থ যথার্থ এক, তথাপি কালভেদে তাহার আচরণ ভিন্ন হইয়াছে। সত্যে ধ্যান-ধারণা, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে পূজাই "ধর্ম্ম" ছিল। শ্রীভগবান্ও তত্তৎকালে তত্তদ্ধর্ম্ম-স্থাপনপূর্ব্বক সাধুরক্ষণ এবং দুষ্ট-দমন করিয়াছিলেন। আবার এই ঘোর কলিযুগের প্রথমে যখন জীবগণ নিয়ত নানাবিধ পাপাচরণ আরম্ভ করিল, কেবল পরনিন্দা ও পরগ্লানিতে সুখানুভব করিতে লাগিল, ভগবদ্ভজন বিস্মৃত হইয়া অধঃপতনের দিকে ধাবমান্ হইল, তখন সেই করুণাময় গোলোকবিহারী শ্রীহরির করুণহৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। মূঢ়জীবগণের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যে—তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবগণই অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে; তাহারা সংসারকেই পরমসার জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদুঃখ ভোগ করিতেছে; সুতরাং কলিকালোচিত ধর্ম্মস্থাপনপূর্ব্বক জীবগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হওয়া দরকার। বৈষ্ণবগ্রন্থে এ সম্বন্ধে আছে—

কলি ঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম্মলেশ।
করুণা বাঢ়ল দেখি সর্ব্বজন-ক্লেশ॥
অধর্ম্ম-বিনাশ হেতু মোর অবতার।
অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুনঃ কি কাজ আমার॥
ঐছন জানিয়া দয়া উপজিল চিতে।
জনম লভিব নিজ প্রেম-প্রকাশিতে॥
এমত দুর্লভ প্রেম-ভক্তি প্রকাশিয়া।
বুঝাইব লোক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিয়া॥
নবদ্বীপে জন্ম মোর শচীর উদরে।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে॥

আর অবতার হেন অবতার নহে।
অসুর সংহার-হেতু পৃথিবীবিজয়ে ॥
মহাকায় মহাসুর মহা অস্ত্র মোর।
মহারণে সংহার করিয়া করো চুর ॥
এবে সর্ব্বজন সেই হৃদয় আসুরি।
খড়গ অস্ত্রে ছেন্ত নহে রণে কিবা করি ॥
নাম-গুণ-সঙ্কীর্ত্তন বৈষ্ণবের শক্তি।
প্রকাশ করিব আর নিজ প্রেমভক্তি ॥
এইমতে কলিপাপ করিব সংহার।
সবে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥
এবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন খড়গ তীক্ষ্ণ লঞা।
অন্তর অসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম্ম দূরদেশে যায়।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥
নিজপ্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব।
কভু না রাখিব দুঃখ শোক এক লব ॥
ভাসাইব স্থাবর-জঙ্গম দেবগণে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাসলোচনে ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে।

প্রাগুক্ত বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবান্ যে জীবগণের প্রতি কত সদয় তাহা সহজেই বুঝা গেল এবং কলিকল্মষনাশের জন্য ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্ যে পতিতপাবনস্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তাহাও জানা গেল। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই সকল লোক বিনষ্ট হইয়া যাইবে; আর আমিও বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রজাবর্গের নাশের কারণ হইব।"

উক্ত শ্লোক দ্বারাও শ্রীভগবানের করুণাময়-ভাব এবং লোক-ধর্ম্মরক্ষার্থ কর্ম্মকর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। ধর্ম্ম-রক্ষার্থ এবং জীব-দুঃখদূরীকরণার্থ তিনি

কখনও পশু, কখন পক্ষী, কখন মৎস্য, এবং কখন কূর্ম্ম হইয়া থাকেন। কখন ঋষি, কখন যোগী, কখন রাজা এবং কখন ভিক্ষুক পর্য্যন্তও তিনি হইয়াছেন। পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তিনি ভিখারী ভগবান্; সকলের দ্বারে দ্বারে নাম বিলাইয়া বেড়াইয়াছেন, লোককে হাতে ধরিয়া উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভাগবতরত্ন।

আলোচনা।

(তর্করত্ন মহাশয়ের অভিভাষণ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহর্ষি মনু বলেন :—

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তাচ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্। যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরম্। যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্। বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্ম-কার্য্য, আত্মচিন্তা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাহা জানিতে আগ্রহ হয়, যাহা করিয়া লজ্জিত হইতে হয় না, যাহাতে আত্মার তুষ্টি হয়, সেই সমস্তই সাত্ত্বিক গুণ-লক্ষণ। আমরা দেখিতে পাই, এই সকল লক্ষণ ব্রাহ্মণমাত্রেই বিদ্যমান থাকে না, আবার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যেও বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রধান' কথার কোন্ অর্থ সঙ্গত? "যিনি ব্রাহ্মণ, তিনি সত্ত্বগুণ-প্রধান হইবেই" না "যিনি সত্ত্বগুণপ্রধান, তিনিই ব্রাহ্মণ" এই অর্থ? তর্করত্ন মহাশয় জন্মানুসারি জাতিবন্ধনের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া দেখিলেন বড় গোল—কাজেই "ব্রাহ্মণ-দম্পতীর পুত্ররূপে উৎপত্তি দৈহিক সত্ত্বগুণের লক্ষণ" আবিষ্কার করিলেন। শাস্ত্রে ইহার সমর্থক প্রমাণ পাইনা, তর্করত্ন মহাশয়ও বলেন নাই, সুতরাং বুঝিলাম না। বিহিতবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত ঔরস সন্তান পিতৃজাতি হইবে—এমন কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু দৈহিক সত্ত্বগুণের এ নূতন লক্ষণটী খুজিয়া পাওয়া দুষ্কর। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশভক্তি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। (ইহার পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের এইরূপ লক্ষণ এগ্রন্থে বর্ণিত আছে) ইহার পরে শ্রীভাগবত বলিয়াছেন, যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, তাহা যদি অন্যত্রও দেখা যায়, তবে তাহাকেও ঐবর্ণের বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। এখানে বুঝিলাম, শাস্ত্র-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যদি অন্যজাতীয় লোকে দৃষ্ট হয়, তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শাস্ত্র এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন, শূদ্রে যচ্চ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। নবৈ শূদ্রোভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নহি। শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ থাকে, আর ব্রাহ্মণে যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না থাকে, তবে সেই শূদ্র শূদ্র নহে ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন শূদ্র। এক্ষেত্রে তর্করত্ন মহাশয় "দৈহিক সত্বগুণ" আবিষ্কার না করিয়া পারেন কি? হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়, এক শৌনকের বংশধরগণই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। (১) বৈশ্য নাভাগারিষ্টের পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। (২) ক্ষত্রিয় বীতহব্য (৩) বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। দেখা যায়, ব্রাহ্মণদম্পতীর পুত্র না হইয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারে, একথা শাস্ত্রে আছে। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-সাধনে অগ্রণীর ব্রাহ্মণমহাসম্মিলনের কর্ণধার পণ্ডিতপ্রবর তর্করত্ন মহাশয় এ প্রসঙ্গে দৈহিক

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে আছে (৪ অংশ ৮ অধ্যায়) ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রঃ পুত্রোঽভূৎ। কাললেশগৃৎসমদাস্তস্য ত্রয়ঃ পুত্রা অভবন্ গৃৎসমদস্য শৌনকঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তয়িতাঽভূৎ।

হরিবংশে (২৯অ ২০) আছে—পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ। বায়ুপুরাণে আছে—পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকোযস্য শৌনকাঃ, ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ। তদ্বংশে সমুদ্ভূতাঃ বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ। শৌনকের বংশধরগণ কর্ম্মবৈচিত্র্য হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল।

(২) হরিবংশে (১১ অ ৬৫৮) আছে—নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। কর্ম্মানুসারে বৈশ্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিল।

(৩)—যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ। রাজর্ষিদুর্ল্লভং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্। রাজা বীতহব্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বৈদিকসাহিত্যে ঐলূষ কবষ প্রভৃতি হীন শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভের কথা আছে। লেখক।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াই পাশ কাটাইয়াছেন, ইহা সুশোভন মনে হয় না। ব্রাহ্মণসন্তানের প্রবৃত্তিতেও বর্ত্তমান-কুশিক্ষাপ্রভাবে দোষস্পর্শ ঘটিয়াছে, সুতরাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্মেষণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই, একথা তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, কিন্তু "জাত্যভিমান" যে ব্রাহ্মণসমাজকে অসাদচার হইতে রক্ষা করিতেছে, একথা বলিতেও বিরত হন নাই। মোটের উপর জন্মানুসারেই ব্রাহ্মণ হইবে, এটা তাঁহার মনের কথা, তবে সেটা যত পছন্দ করেন, তত বেশী করিয়া বলেন নাই। বস্তুতঃ সমগ্রমানবজাতির কল্যাণের সহিত এ ভাব খাপ খায় না—একথা না বলিলেই অন্যায় হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শর্ম্মা।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

সে। গীতিকাব্য। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রাম বাটিকামারি, পোঃ গুয়াতলী, জেলা যশোহর—গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য আট আনা। কুণ্ডলীন-প্রেসে মুদ্রিত। ছাপা কাগজ ভাল। পত্নীবিয়োগে গ্রন্থকারের হৃদয়ের তারে যে করুণসুর বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার সঙ্গে সহজভাষার সরল-পদবিন্যাস মিলাইয়া তিনি 'সে' গীতি গাহিয়াছেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন "নাহি বিদ্যা, নহি কবি"—'কাঁদিতে কামনা সুধু—নাহি যশোআশা'। আমরা দেখিতেছি, তিনি হৃদয়বান্, তাঁহার ভাব আছে, কিন্তু ভাষা-রচনার নিপুণতা নাই, ভাষার বিশুদ্ধিসাধনের সাবধানতাও নাই, সুতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্যের অল্পতায় তাঁহার ভাবুকত্বের বা কবিত্বের অভাব কল্পনা করা যায় না। যে সহানুভূতির প্রেরণায় বাল্মীকির মুখে কোমল কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে সহানুভূতির স্বল্পমাত্র প্রেরণায়ও মানুষের প্রাণ কবিত্বময় হইয়া থাকে। কালীপদ বাবুর কতিপয় কবিতার কতিপয় স্থান পাঠ করিয়া অশ্রু-সম্বরণ করা কঠিন হইয়াছে। ব্যাকরণ-দোষ, ছন্দের স্খলন প্রভৃতি দোষ সত্ত্বেও 'সে' সুপাঠ্য হইয়াছে, কারণ ইহাতে প্রাণের কথাই বলা হইয়াছে। কালীপদ বাবু বলিতেছেন—

"নিসর্গের সনে মাখা তুমি প্রিয়ে! পারি কি থাকিতে তোমারে ভুলিয়ে?
তুমি বিদ্যমান বিহঙ্গম-তানে, স্তবকণ্ঠ শুনি বীণার নিক্বণে।" ইত্যাদি।

এখানে তিনি তাঁহার প্রাণময়ীকে বিশ্বময়ী-মূর্ত্তিতে দেখিতেছেন। বিস্তৃত সমালোচনার স্থানাভাব, সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে হয়, 'সে' পাঠ করিলে অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন। গ্রন্থকারের যশ-আশা নাই, সুতরাং সে কথা তুলিব না।

সংবাদ ও মন্তব্য।

সৈন্যসংখ্যা। গত ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতরক্ষিসৈন্যদলে প্রবেশার্থী হইয়া ১৭৬৬ জন ব্যক্তি মাত্র আবেদন করিয়াছেন। এ সংখ্যাল্পতা লজ্জাজনক মনে হয়।

সতীধর্ম্মরক্ষার্থ হত্যা। হাওড়া—সন্তোষপুরের শ্রীমতী উমাশশী দাসী নাম্নী এক ষোড়শী বৈষ্ণবী সতীধর্ম্মরক্ষার্থে ঐ গ্রামবাসী গৌরহাজরা নামক কৈবর্ত্ত-জাতীয় একব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। উমাশশীর স্বামী সেদিন গৃহে ছিল না; গৃহে উমাশশীর ২জন আত্মীয়া রমণী ছিল। অন্ধকার-গৃহে গৌর প্রবেশ করিয়া উমাশশীর নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করে। ফলে উমাশশী উত্তেজিতা হইয়া ধর্ম্মরক্ষার্থে গৌরকে দাত্র দ্বারা আঘাত করিতে থাকে। কিছুক্ষণে গৌরের মৃত্যু হয়। যাহারা সতীর সতীত্বনাশে সমুদ্যত হয়, তাহাদের এইরূপ গতি প্রায়ই হয়।

সংগ্রামে শ্যাম। এসিয়ার শ্যামরাজ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং শ্যামের অধিকারস্থ জার্ম্মান্ জাহাজগুলি আটক করিয়াছেন শ্যামের নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ২০০০০ মাত্র, কিন্তু যুদ্ধশিক্ষায় সকলেই বিধানতঃ বাধ্য, কাজেই বহুসৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে। জার্ম্মাণীর উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে, দেখিতেছি, একে একে প্রায় সকলেই তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতেছে। অধর্ম্মের পতন ও পরাজয় অনিবার্য্য।

দস্যুতা। সংবাদপত্রে প্রকাশ—শিবপুর—ইঞ্জিনিয়ারিংকলেজের নিকটে শ্রীমানীরোডে কাঠের গোলায় সম্প্রতি বিষম ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। রাত্রি দুইটার সময় প্রায় ২০ জন পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা দস্যু, কাঠের গোলার মালিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া ৫।৬ জনকে আহত করে এবং প্রায় দুই সহস্র টাকার সামগ্রী লইয়া পলায়ন করে। পুলিশকর্ম্মচারীরা নাকি কতিপয় ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। দস্যুদলন করিয়া দেশবাসীর ধন-প্রাণ নিরাপৎ করিতে পারিলেই কৃতিত্বের কথা।

স্বাধীনতার কথা। ফিন্‌ল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন কামনা করে। ফিনিশ্ পার্লা-মেণ্ট স্বায়ত্তশাসন-বিধানের এক পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। রুষিয়ার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হওয়াই উদ্দেশ্যে। ভবিতব্যতার নির্দ্ধারণ কিরূপ, সময়ে প্রকাশ পাইবে।

---

২৪ বর্ষ। আশ্বিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
সহকারি-সম্পাদক
স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইং—২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।
বাং—১৩ই আশ্বিন ১৩২৪।
শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা

সূচী।

	বিষয়।	পৃষ্ঠা।		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	সংস্কৃতভাষার উৎপত্তি	২৪১	৬।	ভক্তি কথা	২৭৫
২।	শিক্ষাষ্টকম্	২৪৮	৭।	শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা	২৭৯
৩।	শূদ্রাপবাদ-মোচন	২৫১	৮।	হিন্দু জ্যোতিষ	২৮২
৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৭১	৯।	কামরূপ ভ্রমণ	২৮৪
৫।	অপ্রকাশিত পদাবলী	২৭৪	১০।	সংবাদ ও মন্তব্য	২৮৮

বর্ত্তমান-সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীশ্রীনাথ দত্ত, শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত, শ্রীআনন্দনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রী———ভারতী, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা

২৫ বর্ষ, ২৭শ খণ্ড
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন

১৩২৪ সাল।
১৮৩৯ শকাব্দ

সংস্কৃতভাষার উৎপত্তি

সংস্কৃতভাষা সমস্ত আর্য্যভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া পাশ্চাত্য ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই সর্ব্বপ্রাচীন ভাষার আদি ইতিহাসের সন্ধান বিশেষরূপে সংশয়-সমাকুল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই এতৎ সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের ফল আমরা সসঙ্কোচে সুধীবর্গের সমীপে উপস্থিত করিতেছি। আমাদের ভরসা আছে যে, আমাদের দ্বারা প্রকৃত সত্যের উদ্ধার না হইয়া থাকিলে এতদুপলক্ষে সুধীবর্গের আলোচনা দ্বারা প্রকৃত-মীমাংসার পথ সুগম হইতে পারে।

সংস্কৃতভাষা, অপর সর্ব্বভাষা অপেক্ষা প্রাচীনা, সুতরাং অন্য কোন ভাষার নিকট ইহার জন্মবৃত্তান্ত জানিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার নিজের নিকট হইতে সেই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে তবেই তাহা বিশেষরূপে প্রত্যয়যোগ্য হইতে পারে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার নিকট হইতেই ইহার আত্ম-জীবনকাহিনী আমরা শুনিতে পারি। ভাষা-বোধক যে সমস্ত শব্দ অভিধানে

প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী শব্দে আমরা পূর্ব্বোক্ত আত্মজীবন-কাহিনীর বিস্ময়জনক আভাস প্রাপ্ত হই। সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধানে ভাষার এক পর্য্যায় শব্দ সকল এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"ব্রাহ্মীতু ভারতী ভাষা গীর্ব্বাগ্‌বাণী সরস্বতী।" ব্রাহ্মী, ভারতী, গীঃ, বাগ্, বাণী, সরস্বতী এইকয়টীই ভাষার পর্য্যায়শব্দ। এখানে 'ব্রাহ্মী', 'ভারতী', ও 'সরস্বতী' এই তিনটীকে আমরা সাধারণ-বাচক-শব্দ বলিয়া মনে করিতে পারি না—কিন্তু বিশেষ-সংজ্ঞাবাচক শব্দ বলিয়াই মনে করি। ভাষাপর্য্যায়ে পরিগণিত হইলেও এইগুলি যে প্রথমে সংস্কৃতভাষারই বাচক ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণই আমরা সংস্কৃতসাহিত্যে দেখিতে পাই।

বেদ আর্য্যভাষার আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। এই বেদ সংস্কৃতভাষায় বিরচিত। পূর্ব্বোক্ত তিনটী শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হয়—বেদ হইতেই আমরা তাহার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি। প্রথমেই আমরা সর্ব্বজন-সুপরিচিত "সরস্বতী" শব্দটীর পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইব। বেদে "সরস্বতী" একটী নদীর নাম। আর্য্যগণ প্রথমে এই নদীর তীরে বসতি-স্থাপন করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতঃ ইহাকে পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার তীরেই বেদগানে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রথম ধর্ম্মাবেগের অভিব্যক্তি হয়। এইখানেই বেদভাষার প্রথম স্ফুরণ হয়। এইপ্রকারে সরস্বতী-তীরে বেদ-রচনার প্রথম অনুপ্রাণনা প্রাপ্ত হন বলিয়া, আর্য্যঋষিগণ সরস্বতী-নদীর নামানুসারে বেদভাষার "সরস্বতী" নাম প্রদান করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধটীকে ইতিহাসের অক্ষয় উজ্জ্বলবর্ণে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা এখানে শ্রদ্ধাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তদীয় ঋগ্বেদানুবাদের টীকায় এতৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি :—

"কোন্ বস্তুকে প্রথমে 'সরস্বতী' নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? সরঃ অর্থ জল, সরস্বতীর প্রথম অর্থ 'নদী' তাহার সন্দেহ নাই; আর্য্যাবর্ত্তে সরস্বতী-নামে যে নদী আছে তাহাই প্রথমে "সরস্বতী দেবী" বলিয়া পূজিত হইয়াছিল। এক্ষণে গঙ্গা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্যাদেবী, প্রথম-হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী-নদী সেইরূপ ছিলেন।

অচিরে সরস্বতী বাগ্‌দেবীও হইলেন। যাস্ক বলিয়াছেন—"তত্র সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমাভবন্তি।" মূল ঋগ্বেদেও, সরস্বতীর উভয়-প্রকার গুণ লক্ষিত হয়।

কিরূপে নদীদেবী ক্রমে বাগ্‌দেবী হইলেন তাহা স্থির করা কঠিন। Muir বলেন—পুরাকালে সরস্বতী-নদীতীরে যজ্ঞ সম্পাদন হইত এবং মন্ত্র উচ্চারিত হইত—এইরূপে ক্রমে সেই সরস্বতী-নদী, সেই পবিত্র মন্ত্রের দেবী ও বাগ্‌দেবী বলিয়া পরিণত হইলেন।” ঋগ্বেদানুবাদ ৯-১০ পৃষ্ঠা।

সরস্বতীবিধৌত উত্তরদেশ যে এক সময়ে ভাষার মূলস্থানরূপে বিবেচিত হইত, বিশ্বকোষে তৎসম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে—“শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণে লিখিত—আছে পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্‌বৈ পথ্যাস্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুং যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতিস্মাহ। এষাহি বাচোদিক্ প্রজ্ঞাতা॥ ৭।৬। পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐদিক হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি বলিতেছেন”, এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এইস্থান ‘বাক্যের দিক্’ বলিয়া খ্যাত।

ভাষ্যকার বিনায়কভট্ট লিখিয়াছেন—“প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী-প্রসাদার্থং উদঞ্চ।”

বাক্, প্রজ্ঞাত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কাশ্মীরে সরস্বতী (তাঁহার স্থানরূপে) কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন এবং বদরিকাশ্রমে বেদের ঘোষণা শুনা যায়। সরস্বতীর প্রসাদ-লাভের জন্য লোকে উত্তর দিকে ভাষা শিখিতে যায়।”

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আর্য্যদিগের কোন্ বংশ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বৈদিক ভাষা গঠিত হয়? ভাষার “ভারতী” নামেই ইহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। ‘ভারতী” শব্দটী “ভরত” শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ “ভরত-সম্বন্ধিনী।” এই ব্যাখ্যায় ভরতের দ্বারা গঠিত—ইহাই ব্যুৎপত্তি দ্বারা লব্ধ অর্থ হয়। “ভরতের সন্তান” অর্থেও “ভারত” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ভারতদিগের সম্বন্ধিনী” এই অর্থেও “ভারতী” এই রূপই হইবে। সুতরাং উভয় ব্যুৎপত্তি হইতেই ভরতের দ্বারা বা ভরতবংশীয়দিগের দ্বারা বৈদিক ভাষা গঠিত হয় এবং তাহাতেই যে ইহার ‘ভারতী’ নাম হয়—তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে আমরা ভরত ও ভরতপুত্র (ভারত) উভয় নামই প্রাপ্ত হই। ভাষার “ভারতী” নামও বেদেই পাওয়া যায়।

অতএব ভরতদিগের সহিত যোগ হইতেই এই নাম হইয়াছে—এই অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

বেদের ভাষাই "সরস্বতী" ও "ভারতী" নামে অভিহিত হইত, আমাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিবার অবসর আমরা পাই নাই। ভাষার "ব্রাহ্মী" নামেই সেই প্রমাণ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি। বেদের এক নাম 'ব্রহ্ম' যথা—"বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্ম।" ব্রহ্ম বা বেদের সহিত সম্বন্ধ হইতে ভাষার 'ব্রাহ্মী' নাম হইয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। বেদের যেখানে ভাষার উৎপত্তি, জ্ঞান ও ব্যবহার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে "ব্রহ্ম" শব্দ, ভাষা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ব্রাহ্মণাঃ সংযজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহত্বং বিজহুর্বেদ্যাভিরোহ ব্রহ্মাণো বিচরন্ত্যুতে॥" ৮

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৭১ সূক্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ রমেশবাবু ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—"যখন অনেক স্তোতা একত্র হইয়া মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনাপূর্ব্বক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মেনা। কেহ ২ স্তোত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।" এখানে 'ব্রাহ্মণাঃ' 'ব্রহ্মাণঃ' শব্দের স্তোতা বা স্তোত্রজ্ঞ অনুবাদ না করিয়া 'ভাষাবিৎ' বা 'ভাষাভিজ্ঞ' অনুবাদ করিলেই যেন সমস্ত স্থলটীর বিশেষ সুসঙ্গতি হয়। যখন সমগ্র সূক্তটীতে ভাষারই প্রসঙ্গ, তখন ইহাতে স্তোত্রের উল্লেখ কতকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হইবে, ভাষার উল্লেখই বরঞ্চ স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই প্রকারে ব্রহ্ম, বেদ বা বৈদিকভাষাকে বুঝায় বলিয়া "ব্রাহ্মী" যে বৈদিক বা সংস্কৃতভাষারই নাম হইবে—তাহা আমরা পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছি। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে ঃ—

মহাভারতে সংস্কৃত ভাষাই "ব্রাহ্মীবাক্" বা "ব্রাহ্মীভাষা" নামে পরিচিত হইয়াছে যথা—রাজবৎ রূপবেশৌ তে ব্রাহ্মীং বাচং বিভর্ষিচ॥" (১।৮১।১৩)।"

ব্রহ্ম বা বেদ এই সংস্কৃতভাষায় রচিত হওয়াতে ইহার নাম যেমন "ব্রাহ্মী" হইয়াছে, তেমনই যে সরস্বতীপ্রদেশে ব্রহ্ম বা বেদ সংগ্রথিত হয় তাহারও নাম 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' হইয়াছে। এসম্বন্ধে পাশ্চাত্যপণ্ডিত ফ্রেজার (Frazer) তদীয় Literary History of India ("ভারতীয় সাহিত্য-বর্ণিত ইতিহাস") নামক

গ্রন্থে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা আমাদের কথার সমর্থনে উদ্ধৃত করিতে পারি ঃ—

"Across the five Rivers of the Punjab, the Aryans pressed until they reached the land to the East, renowned ever afterwards as Brahmanvata, and described as a land "created by the gods, lying between the two divine rivers, the Saraswati and Drishadvati." There the vedic Hymns were collected together, and the entire sacrificial system elaborated." Literary History of India by R. W. Frazer, L. L. B. p 66.

এ পর্য্যন্ত আমরা সংস্কৃতভাষার বিভিন্ন নামেরই মাত্র আলোচনা করিলাম, কিন্তু ইহার 'সংস্কৃত' নাম সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পারি নাই। "সংস্কৃত" নামটী প্রাচীন নাম নহে, প্রত্যুত ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাম। এই জন্যই বৈদিকসাহিত্যে পাণিনীয়ব্যাকরণে, এমনকি অমরকোষ অভিধানে পর্য্যন্ত 'ভাষা' অর্থে ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়না। পাণিনীয় ব্যাকরণে আমরা সাধারণ-সংস্কৃতকে "ভাষা" শব্দ দ্বারা উল্লিখিত দেখি এবং বৈদিকসংস্কৃতকে 'ছন্দঃ'-শব্দের দ্বারা উল্লিখিত দেখি। ইহা হইতে বৈদিকভাষা তখন কথিত-ভাষা-রূপে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহারই সংস্কার দ্বারা একটী সাধারণ কথিত-ভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল—ইহাই অনুমান হয়। এই নবসংস্কারপ্রাপ্ত বা সংস্কৃত ভাষাই "সংস্কৃত" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সম্ভবতঃ এই পার্থক্যের ফলে বৈদিকভাষা কেবল ধর্ম্মসাহিত্যেরই ভাষারূপে পরিগণিত হইল এবং ইহার সংস্কৃতরূপ লৌকিকসাহিত্যের ভাষারূপে পরিগণিত হইল। এপ্রকারে কেবল দেবকার্য্যে প্রযুক্ত হওয়াতে বৈদিক-সংস্কৃতই "দেবভাষা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

রামায়ণেই প্রথমতঃ ভাষার 'সংস্কৃত' নামের উল্লেখ স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। সুন্দরকাণ্ডে যেখানে হনুমান্ সীতাদেবীর সহিত কোন্ ভাষায় আলাপ করিবেন বিতর্ক করিতেছেন—সেইখানেই "সংস্কৃতে"র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থলটী আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"অহংহ্যতিতনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ।
বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাম্ ॥১৭
যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি ॥১৮

অবশ্যমেব বক্তব্যং মানুষং বাক্যমর্থবৎ।
ময়া সান্ত্বয়িতুং শক্যা নান্যথেয়মনিন্দিতা।" ১৯
রামায়ণ সুন্দরকাণ্ড ত্রিংশসর্গ।

"আমি ক্ষুদ্রকায় বানর হইয়া, মানবদিগের ব্যবহৃত ব্যাকরণ-দোষবিহীন পরিশুদ্ধ ভাষাতেই আলাপ করিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন করি, তাহা হইলে আমাকে 'রাবণ' মনে করিয়া সীতা ভয় পাইবেন, সুতরাং বিশুদ্ধ মানুষভাষা বলা অবশ্যকর্ত্তব্য। নচেৎ আমি এই অনিন্দিতা সীতাকে কখন আশ্বাসিতা করিতে পারিব না।"
বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

এখানে আমরা যেন দুইপ্রকারের সংস্কৃতভাষার উল্লেখ পাইতেছি—এক-প্রকার উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের ব্যবহৃত সংস্কৃত, অপরপ্রকার সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত সংস্কৃত। বর্ত্তমানে আমরা যেমন মার্জ্জিত বা সাধু বাঙ্গালা ও প্রাদেশিক বাঙ্গালা দেখিতে পাই, সংস্কৃতের পূর্ব্বোক্ত রূপদ্বয়ও তদ্রূপ বলিয়াই বোধ হয়। শাস্ত্রাদিতে আমরা ভাষার পূর্ব্বানুরূপ শ্রেণীবিভাগেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হই :—

এতচ্চ সংস্কৃত-দেশভাষান্যতরেণ যথাবোধং বক্তব্যং লেখ্যং বা। মূর্খানামপি বাদিপ্রতিবাদিতা-দর্শনাৎ। অতএবাধ্যাপনেঽপি, তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। সংস্কৃতৈঃ প্রাকৃতৈর্বাক্যৈর্যঃ শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাদ্যুপায়ৈশ্চ বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ॥" ইতি ব্যবহারতত্ত্বম্।

ইহার মর্ম্ম এই—"বাদী প্রতিবাদী মূর্খ থাকিতে দেখা যায় বলিয়া সংস্কৃত বা দেশভাষার একতরের দ্বারা বুঝাইতে হইবে বা লিখিতে হইবে। অধ্যাপনেও সেইরূপ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত হইয়াছে যে, যিনি শিষ্যকে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা দেশ-ভাষাদি উপায়ে বুঝাইতে পারেন, তিনিই গুরু।"

সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশভাষা এই তিন প্রকারের ভাষাই যে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখই আমরা "কথাসরিৎসাগরে" প্রাপ্ত হই :—

"সংস্কৃতং প্রাকৃতং তদ্বদ্দেশভাষাচ সর্ব্বদা।
ভাষাত্রয়মিদং ত্যক্তং যন্মনুষ্যেষু সম্ভবেৎ॥" ১৪৮
কথাপীঠলম্বক ৬ষ্ঠ তরঙ্গ।

দেশভাষাকে আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই মনে করি। দেশভাষা ও প্রাকৃত ভাষা উভয়ই ভাষাবিজ্ঞানের স্বরবিকৃতি (Phonetic decay)

এবং উপভাষাসৃষ্টি (Diabetic Regeneration) এই দুই প্রসিদ্ধ নিয়মের দ্বারা সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট বোধহয়। দেশভাষা সংস্কৃতেরই সাক্ষাৎ অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত দূর রূপান্তর—এইরূপে সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে ইহারা সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া সংস্কৃতভাষাকেই ইহাদের মূলরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈদকভাষার সংস্কার দ্বারা যে সংস্কৃতভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতীয় বিভিন্ন আর্য্যভাষাসকল তাহারই শাখাপ্রশাখা মাত্র।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের গবেষণা দ্বারাও আমাদিগের বক্তব্য সমর্থিত হয়। এখানে আমরা তাঁহাদিগের মত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"while in the literature of India the Vedic Sanskrit become modified into the later classical language, more or less artificial in its structure, it further, from about 500 years before Christ, broke down into a vernacular known as Prakrit, * which existed to about 1000 AD.

The Eastern branch of this Prakrit was the magadhi, spoken in magadha or South Behar, while the Western branch was the Souraseni spoken in the lands lying between the Ganges and Jamuna. Intermediate between these two distinctive homes of the Aryan culture lay the land, the vernacular of whose people showed traces of connection with both the magadhi and the Souraseni, so that it was called the Ardhamagadhi or half-mâgodhl.

Out side these three distinctive branches of the Aryan vernacular the spoken language of the North Western district was known as the "Apabramsa", or decayed language, From these four vernaculars all the modern Aryan vernaculars of India have descended." Literary History of India by R. W. Frazer L. L. B. p p 263—4.

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বৈদিকসংস্কৃত হইতে শুদ্ধ বা সাহিত্য-সংস্কৃত উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহা হইতে প্রাকৃতভাষা ও বর্ত্তমান কথিতভাষা সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। মাগধী, শৌরসেনী, ও

* Grierson, "Indo Aryan vernaculars", Calcutta Review (October 1895)

অর্দ্ধমাগধীই প্রথম মূলপ্রাকৃতভাষা ছিল এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে "অপভ্রংশ" নামে একটী কথিত-ভাষা ছিল। ভারতবর্ষের আর্য্যপ্রাকৃত-ভাষা সকল চারিটী ভাষা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে যে প্রাকৃতভাষা-ব্যতিরিক্ত 'দেশভাষা'র উল্লেখ করিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত "অপভ্রংশ" ভাষা আমাদের নিকট সেই 'দেশভাষা' বলিয়াই বোধ হয়। এই "অপভ্রংশ" নামটী দ্বারা ইহা যে সাক্ষাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, তাহার আশ্চর্য্য প্রমাণই পাওয়া যায়।

এই প্রকারে সংস্কৃতভাষার মূলানুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা বর্ত্তমান আর্য্যকথিত ভাষা-সকলের মূলের সন্ধানও প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ।

শিক্ষাষ্টকম্।

(পূর্ব্বিতোঽনুবৃত্তম্)

নামের শক্তিবলে যে স্থানে নাম সঙ্কীর্ত্তিত হয় সে স্থানের বায়ুও মনুষ্য-গণের পাপ ক্ষয় করিয়া থাকে—

দানব্রত-তপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ
শক্তয়ো দেব-মহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষুনামসু ॥
বাতোঽপ্যতো হরের্নাম উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥

শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে ১১ বিলাসে ধৃত স্কন্দপুরাণবচনম্।

দান, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ-ক্ষেত্র সকলের, দেব ও সাধুগণের এবং রাজসূয়, অশ্বমেধ ও জ্ঞানসাধ্য অধ্যাত্মবস্তুর যে সকল সর্ব্বপাপহর মঙ্গলপ্রদ শক্তি আছে, শ্রীহরি, তৎসমুদায় আকর্ষণ করিয়া নিজের নামসমুদায়ে স্থাপন করিয়াছেন। তজ্জন্য যেরূপ সূর্য্যদেব অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ

হরি-নামের বায়ুও সকল প্রকারের ভয়ানক পাপরাশিকে নষ্ট করিয়া থাকেন। নামের এরূপ শক্তি যে, নাম কালাকালের অপেক্ষা করেন না।

নদেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্ত শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনম্।

হে লুব্ধক! অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্য শ্রীহরি-নামে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই।

অন্যত্র—

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥

স্কান্দবচনম্।

চক্রায়ুধ বিষ্ণুর নাম সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিবে। তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে অশৌচ নাই, যেহেতু সেই নাম পবিত্র করিয়া থাকেন।

ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদং॥

স্কান্দবচনম্।

ভগবানের নাম দেশ, কাল এবং অবস্থার শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষা করেন না। ঐ নাম স্বতন্ত্র এবং ঐ নাম সকাম-পুরুষের অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

নদেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি উচ্যতে॥

বৈশ্বানরসংহিতাবচনম্।

ন দেশ-নিয়মো রাজন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥

বৈষ্ণব-চিন্তামণৌ।

ভগবানের নামের মুক্তিপ্রদানের ক্ষমতা আছে যথা—

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নর-নায়ক!
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র! কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥

গরুড়পুরাণে।

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষর-দ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥

স্কন্দপুরাণে।

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিং।
সোঽপি দোষ-ক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা॥ *

ব্রহ্মপুরাণে।

সর্ব্বধর্ম্ম-বহির্ভূতঃ সর্ব্ব-পাপ-রতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং।

যথাকথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ॥

বৃহন্নারদীয়ে।

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসার-ব্যাধি-ভেষজং।
দুঃখ-শোক-পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

ভারতে।

(উপরের কয়েকটি শ্লোক স্পষ্টার্থ বলিয়া অনুবাদ দেওয়া গেলনা।)

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে-
র্যদ্‌যচ্চেতদ্ গেয়পীযূষপুষ্টং।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জা সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র॥

নারদীয়ে।

গান-যোগ্য গাথাদির পরমশ্লাঘ্য মধুর রস দ্বারা পুষ্ট মুরারির নূতন নূতন নাম যাঁহারা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আনন্দিত হইয়া গান করেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত, ইহাতে আর সংশয় নাই।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্ বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥

শ্রীভাগবতে ১।১।১৪

সূত কহিয়াছিলেন যে ঋষিগণ। ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তিও বিবশ হইয়া যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে সদ্যঃ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; যেহেতু ভয় আপনি তাঁহার নাম হইতে ভীত হইয়া থাকে।

---

* চেদিপতিঃ শিশুপালঃ।

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥

শ্রীভাগবতে ৩।৯।১৫।

যে সকল মনুষ্য প্রাণবিয়োগকালে বিবশ হইয়া তোমার অবতার, গুণ এবং কর্ম্মের অনুকরণকারী নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহারা অনেকজন্মের পাপ পরিত্যাগ করিয়া সহসা আবরণ-শূন্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়েন, সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলাম। (এখানে অবতার-অনুকরণকারী নাম যথা "দেবকীনন্দন" ইত্যাদি, গুণানুকরণকারী নাম যথা "সর্ব্বজ্ঞ", "ভক্তবৎসল", ইত্যাদি; কর্ম্মানুকরণ-কারী নাম যথা, "গোবর্দ্ধনধারী", "কংসনিসূদন" ইত্যাদি)

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাং।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিং॥

শ্রীভাগবতে ৬।৩।২৪।

ভগবানের গুণ-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন কেবল যে মনুষ্যগণের পাপক্ষয় মাত্র করেন এমত নহে, কারণ পাপী অজামিল অশুচি এবং অসুস্থচিত্ত হইয়াও নিজের পুত্র "নারায়ণ"কে আহ্বান করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

শূদ্রাপবাদ-মোচন।

আজকাল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শিক্ষিতসম্প্রদায় মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। কি করিলে কৃষির, শিল্পের ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়, অনেকেই তদ্বিষয়ে চিন্তাকুল হইয়াছেন।

আমার বিবেচনায়, যে ব্যবসায়লিপ্ত লোকদিগকে সমাজের শ্রেষ্ঠমান্য লোকেরা ঘৃণা করেন, বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, অথবা আদর-সন্ত্রম করেন

না, সেই ব্যবসায়ের অবনতি অনিবার্য্য। বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও অর্থশালী ব্যক্তিরা যে ব্যবসায়ে লিপ্ত, তাহারই উন্নতি সম্ভব। ব্যবসায়ে শুধু যে অর্থের আবশ্যক, তাহা নয়, ব্যবসায়ে বিদ্যা ও বুদ্ধিরও আবশ্যক। প্রধানতঃ যে ব্যবসায়ে মান-সম্ভ্রম নাই, সকলেই তাহা সত্বর পরিত্যাগ করেন। বঙ্গদেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাদি ব্রহ্মোত্তর মহাত্রাণ প্রভৃতি খামার জমির চাষের উৎপন্নকেই জীবিকার প্রধান সম্বল করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ অনেকেই চাকরীর অনুরোধে বিদেশবাসী ও অনেকে স্বাস্থ্যের অনুরোধে সহরবাসী হইয়া জমিজমা বিক্রয় করিয়াছেন, অথবা বিলিবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা জমিজমার সহিত, কৃষির সহিত, সাক্ষাৎ সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের চাকুরি অথবা ইংরেজীবিদ্যাসাধ্য ডাক্তারী ওকালতী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে অশিক্ষিত প্রজাকুলের দুইটা অনিষ্ট হইয়াছে। যতদিন জমিজমার সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর লোকের সম্পর্ক ছিল, ততদিন জমিদারেরা প্রজাপীড়ন করিলে, ব্রাহ্মণাদিজাতীয় ব্যক্তিরা অবশিষ্ট প্রজাবর্গের পরমসহায় হইতেন। কৃষিকার্য্যলিপ্ত ব্যক্তিরা এখন জমিদারের ও তাঁহাদের নায়েব এবং গোমস্তাবর্গের উৎপীড়ন হইতে সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারেন না। পরন্তু যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করেন, অথবা ইংরেজী-বিদ্যা-সাধ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা অনেকে জমিদারী ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এজন্য তাঁহাদের অধিকাংশের সাহানুভূতি, অনেকটা জমিদারের ও তাঁহাদের আমলাবর্গের প্রতিই দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অনিষ্ট এই যে, দোকান করিয়া অথবা চাষ-বাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা যেন অধিকতর লজ্জার বিষয় হইয়াছে! দোকানী ও চাষীরা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্ব ২ জাতির সম্মান বজায় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কি উপায়ে তাঁহাদের সম্ভ্রম বজায় থাকিতে পারে, এবং কৃষি ও বাণিজ্যে অধিকতর উৎসাহ জন্মিতে পারে, তাহার আলোচনা করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে প্রধানতঃ দুইদলে বিভক্ত করিয়াছেন। একদলের নাম "সৎশূদ্র", অন্যদলের নাম ''অশুদ্ধশূদ্র''। সৎশূদ্রেরা 'জলচল' অর্থাৎ Drawers of water এবং অশুদ্ধ-শূদ্রেরা 'জল-অচল' অর্থাৎ Hewers of wood. ব্রাত্য বা ব্রতভ্রষ্ট বৌদ্ধদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য বাঙ্গালার সেন-রাজা কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের আগমন

অবধি এই হাজার বৎসর বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন সকল জাতি 'শূদ্র'। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগের নিকট ইঁহারা Drawers of water and Hewers of wood হইয়াই আছেন। সৎশূদ্র বা Drawers of water এর মধ্যে কায়স্থ, বারুজীবী, সদেগাপ, তৈলিক, তন্তুবায়, মোদক, নাপিত, কাংস্যকার, শঙ্খকার, গন্ধবণিক্, তাম্বুলী, মালী, প্রভৃতি এবং "অশুদ্ধশূদ্রের" মধ্যে দেশের অবশিষ্ট লোক যথা সুবর্ণবণিক্, সাহা, যোগী, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, পোদ, রাজবংশী, বাগ্‌দী, চর্ম্মকার, ইত্যাদি। যে সকল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের যাজন করেন, তাঁহারা "অশুদ্ধশূদ্রের" যাজনও করেন না, এবং তাঁহাদের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করেন না। চাষীকৈবর্ত্তের জল গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তাঁহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র।

বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সীর ১৯১১ সালের সেন্‌সাস্-রিপোর্ট-পাঠে জানা যায় যে, দুইকোটি হিন্দুর মধ্যে প্রায় ১৷০ দেড় কোটি হিন্দুই আধুনিক জাতিভেদে সন্তুষ্ট নহেন। এজন্য কোন ২ জাতি "ব্রাহ্মণ" বলিয়া, কোন ২ জাতি "ক্ষত্রিয়" বলিয়া, এবং কোন ২ জাতি 'বৈশ্য' বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সেন্‌সাস্ অফিসারের নিকট বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যথা—

জাতির নাম	জাতির লোকসংখ্যা
১। ব্রাহ্মণ-নাম-প্রার্থী	
নমঃশূদ্র	১৯,০০,০০০
২। ক্ষত্রিয়-নাম প্রার্থী	
১। হাঁড়ি	২৬,০০০
২। কোঁচ	১,২৪,০০০
৩। মালো	২;৪৭,০০০
৪। নাপিত	৪,৪৪,০০০
৫। পোদ	৫,৩৬,০০০
৬। পুণ্ডারি	১৬,০০০
৭। রাজবংশী	১৪ ৭০.০০০
৩। বৈশ্য-নাম-প্রার্থী	
১। বারুজীবী	১,৭৭,০০০
২। গন্ধবণিক্	১,২৯,০০০
৩। গৌর	২,০০০
৪। গোপ	৬,৪৪,০০০

৫।	কৈবর্ত্ত	২১,৩৬,০০০
৬।	কর্ম্মকার	২,৬১,০০০
৭।	সদেগাপ	৫,৫০,০০০
৮।	সাহা	৩,২৪,০০০
৯।	সুবর্ণবণিক্	১,০৯,০০০
১০।	সূত্রধর	১,৭৭,০০০
১১।	তাম্বুলী	৪৯,০০০

কায়স্থদের 'ক্ষত্রিয়' পরিচয় দেওয়ার সংবাদ সকলেই জ্ঞাত আছেন। তাঁহাদের জনসংখ্যা (১১,০৭,০০০) এগার লক্ষের উপর হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে কায়স্থ, বারুজীবী, সদেগাপ, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি নানাকারণে শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া গণ্য। এই নাম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা সকলেই হিন্দু-সমাজের আধুনিক জাতিবন্ধনে অসন্তুষ্ট।

মুসলমান্দের প্রথম অধিকার-সময়ে হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান্ হইতে চলিয়াছিলেন। তখন হিন্দুসমাজরক্ষার্থ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণের নামে জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিয়া এবং ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ইস্লাম্ধর্ম্ম-গ্রহণে বাধা দিয়াছিলেন, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নব্য-স্মৃতির প্রচার করিয়া ও কায়স্থ এবং নবশাখদিগকে যাজনের গণ্ডীভুক্ত করিয়া, হিন্দুসমাজের সীমা স্থির করিয়াছিলেন। তদবধি "ভদ্র" "অভদ্র"-ভেদ চলিয়া আসিতেছে। এখন বঙ্গদেশে হিন্দুসংখ্যা দুইকোটি এবং মুসলমান্সংখ্যা ২॥০ আড়াইকোটি। হিন্দুদের অনেকেই আর প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দোহাই মানিতেছেন না। বহুশতাব্দী পরে কায়স্থাদি-জাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত "সংশূদ্র" নামে লজ্জা ও অপমান বোধ করিয়া, কেহ ২ ক্ষত্রিয়-নাম এবং অপর সকলে বৈশ্যনাম-গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—এইকথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রত্যেক (sensus) আদমসুমারীর সময়ে এই আন্দোলন এককোটি ত্রিশ লক্ষ হিন্দুকে অস্থির করিয়া তোলে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু, বৈশ্যের যে সকল জীবিকা বা পেশা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এই :—

পশূনাং রক্ষণং দানম্ ইজ্যাধ্যয়নম্ এব চ।
বণিক্পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিম্ এব চ॥ ১-৯০

ভগবান্, বৈশ্যদের জীবিকাজন্য পশুরক্ষণ, বাণিজ্য, কুসীদ (moneylending)

এবং কৃষি এই উপায়-চতুষ্টয় এবং দান, যজন ও অধ্যয়ন এই কর্ত্তব্যত্রয় স্থির করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ আপৎকালে ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের, এমন কি শূদ্রের জীবিকা অবলম্বন করিতে পারিবেন, কিন্তু বৈশ্য কখনও (বিপৎকালেও) ব্রাহ্মণের জীবিকা (যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ,) অথবা ক্ষত্রিয়ের জীবিকা (প্রজা-রক্ষণ) গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মনুস্মৃতির নবম অধ্যায়ের ৩২৬ হইতে ৩৩৩ শ্লোক পর্য্যন্ত বৈশ্যের জীবিকার সবিশেষ বর্ণনা আছে, যথা—বৈশ্যগণ উপনীত হইয়া অধ্যয়নান্তে (তাহার পূর্ব্বে নয়) দারপরিগ্রহ করতঃ কৃষিকার্য্য-সম্পাদনার্থ পশুপালনে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেন। প্রজাপতি অগ্রে পশু সৃষ্টি করিয়া তৎপালনার্থে তাহা বৈশ্যকে সমর্পণ করেন, এবং প্রজা অর্থাৎ বৈশ্য সৃষ্টি করিয়া তাহা ব্রাহ্মণ ও রাজাকে দান করেন। বৈশ্যেরা কখনও পশুপালনকে 'হেয় কর্ম্ম' বলিয়া বিবেচনা করিবেন না; যেহেতু সামর্থ্যবান্ বৈশ্য থাকিতে পশুপালনে অন্যের অধিকার নাই। বৈশ্যেরা মণি, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য ও লবণাদির মূল্য নির্ণয় করিয়া দিবেন। বৈশ্যগণ বীজ ও ক্ষেত্রের দোষগুণজ্ঞ হইবেন এবং পরিমাপক তুলামান, পরিমাণ ইত্যাদিতেও অভিজ্ঞ হইবেন। বৈশ্যগণ বস্তুর গুণাগুণ, দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যের লাভালাভ, এবং কি করিলে পশুপালন দ্বারা পশুবৃদ্ধি হয়, এ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হইবেন—আর দেশকাল-বিবেচনায় ভৃত্যদের বেতন-নির্ণয়ে, বহু-ভাষা-জ্ঞানে, এবং কোন্ দ্রব্য কোন্‌স্থলে রাখিতে হয়, ও কোন্ দেশে ক্রয়-বিক্রয় করিলে অধিক লাভ হয়—ইত্যাদি বিষয়ে পারগ হইবেন।

মানবধর্ম্মশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ে ৭৪ হইতে ৮০ শ্লোক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত ধ্যাননিষ্ঠ ও স্বকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া, জীবিকা-নির্ব্বাহ জন্য যথাক্রমে বেদাধ্যাপনা, বেদাধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। উক্ত ছয়টীর মধ্যে যাজন, অধ্যাপনা এবং সৎপরিগ্রহ জীবিকার্থ হইবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই তিনটী নিষিদ্ধ। উঁহারা মাত্র যজন, অধ্যয়ন ও দান করিতে পারিবেন। বৈশ্যের পক্ষেও যাজন, অধ্যাপনা এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটী নিষিদ্ধ; যেহেতু প্রজাপতি মনু ইঁহাদের জন্য উক্তকর্ম্মের ব্যবস্থা করেন নাই। জীবিকার্থে ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রধারণ ও প্রজাপালন এবং বৈশ্যের বাণিজ্য, পশুপালন, কুসীদ ও কৃষিকার্য্য, এবং ধর্ম্মার্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়ের পক্ষে অধ্যয়ন, যজন এবং দান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণের প্রশস্তকার্য্য

বেদাধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের প্রশস্তকার্য্য প্রজারক্ষা এবং বৈশ্যের প্রশস্তকার্য্য বাণিজ্যাদি।

বহু শতাব্দী হইতে কায়স্থ নবশাখাদি 'সৎশূদ্র' আখ্যা পাইয়াছেন, কিন্তু শূদ্রযাজন যে 'অসৎকার্য্য' এবং শূদ্র হইতে দানগ্রহণ যে 'অসৎপ্রতিগ্রহ',—মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের ঐ বিধি-লঙ্ঘনে এখনও অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্কুচিত। এজন্য যে সকল জাতি মূলতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইয়াও ব্রাত্যতাহেতু এতদিন 'সৎশূদ্র' নামে পরিতুষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তাহাতে লজ্জা বোধ করিতেছেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ এই সহস্র বৎসর 'সৎশূদ্র' যাজন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকে 'শূদ্রযাজন'রূপ পাপের পরিহারমানসে বা অধিক উপার্জ্জনলাভে স্বধর্ম্ম যাজন পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজগবর্ণমেণ্টের এবং ইংরেজ-বণিকদের চাকুরি গ্রহণ করিতেছেন। এই দিক্ হইতে দেখিলে বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ—হিন্দু-মাত্রেই আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। ভগবদ্গীতায় আছে যে, গুণ ও কর্ম্ম হইতেই বর্ণবিভাগ হইয়াছিল। ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি—ইহা বলিয়া স্বয়ং মনু বলিয়াছেন—

তপোবীজ-প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষং চ মনুষ্যেষিহ জন্মতঃ॥ ১০। ৪২

"শুধু জন্মান্তরে নয়, ইহজন্মেই, তপঃপ্রভাবে ও বীজপ্রভাবে (স্বজাতিজ এবং অনন্তরজ) মনুষ্যেরা জাত্যুৎকর্ষ এবং জাত্যপকর্ষ প্রাপ্ত হয়।" জাতির নাম-পরিবর্ত্তন-প্রার্থীরা এজন্য বলেন যে, গুণ ও কর্ম্মানুসারে কায়স্থাদি-জাতীয় লোককে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অপরাপর হিন্দুদিগকে "শূদ্র" বলিয়া গণ্য করিয়া, শূদ্রাচারে ও শূদ্রসংস্কারে আবদ্ধ রাখা উচিত নয়। বৌদ্ধাধিকারের পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা বংশানুক্রমে এখন বৈশ্যবৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকিলে, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে গণ্য হউন্ এবং শূদ্রেরা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তাঁহাদিগকে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করা হউক্। বর্ণ সম্পূর্ণরূপে জন্মগত না হইয়া আবার গুণগত এবং কর্ম্মগত হউক্। "কাণা-ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' কেন রাখা হইতেছে?" * মুসলমান্-অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৌদ্ধাধিকারের অবসানে বঙ্গদেশে যেমন কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরেরা

* "বঙ্গীয়বৈশ্য"—গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

'সৎশূদ্র' ও 'অশুদ্ধ-শূদ্র' নামে নূতন জাতিবিভাগ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মুসলমান্-অধিকারের অবসানে ইংরেজ-অধিকারে তেমনি নূতন-বর্ণভেদের প্রচলন করা আবশ্যক হইয়াছে কিনা, সুধীগণ বিচার করুন। দুইকোটি লোকের মধ্যে দেড়কোটি লোক যে পরিবর্ত্তনের জন্য প্রয়াসী, তাহা বাঞ্ছনীয় কিনা, বিচার করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করা, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে সঙ্গত ব্যবহার নয়।

শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের অধ্যাপকতা, যাজন এবং দান-গ্রহণ করিবেন না। এই হিসাবে ধরিলে, বাঙ্গালাদেশের কায়স্থ ও নবশাখেরা 'শূদ্র' নহেন; কারণ, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যাজনও করেন এবং দান গ্রহণও করেন, আর কোন কোন শাস্ত্র তাঁহাদিগকে পড়াইয়াও থাকেন। অপরন্তু শাস্ত্রমতে শূদ্রের অধ্যয়নে, যজনে ও দানে অধিকার নাই; শুধু ব্রাহ্মণের সেবা করিতেই শূদ্রের অধিকার। বঙ্গদেশের শূদ্রেরা অধ্যয়ন, যজন, দান সকলই করিতেছেন।

"অধ্যয়ন" ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে। ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিবার উপায় নাই। যদি 'অধ্যয়ন' শব্দের অর্থ বেদাধ্যয়ন হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা অনেকেই রীতিমত বেদপাঠ করেন না,—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। টোলের পরীক্ষায় প্রতিবৎসর প্রায় ৪০০০ চারি হাজার ছাত্র পরীক্ষার্থী হয়েন; তন্মধ্যে হারাহারি প্রতিবৎসর ২০ জন বেদ-পরীক্ষার্থী পাওয়া যায় না।

যদি 'অধ্যয়ন' অর্থ "লেখাপড়া জানা" হয়, তাহা হইলে অনেক তথাকথিত শূদ্রজাতির বৈশ্যত্বলাভ হইয়াছে। স্মরণ রাখা উচিত, সুবর্ণ-বণিক্‌দের মধ্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শিক্ষিত-লোকের সংখ্যা শতকরা অধিক। বাঙ্গালাদেশের শূদ্র ও অশূদ্র-জাতীয় লোকের মধ্যে শতকরা কয়জন লেখাপড়া জানেন, তাহার একটী তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। Subsidiary Table I, Part I 1911.

বৈদ্য	৭২	সুবর্ণবণিক্	৬৮
ব্রাহ্মণ	৬৪।	কায়স্থ	৫৭
গন্ধবণিক্	৫৬	তিলি	৩০
বারুজীবী	২৮	কর্ম্মকার	২৮
সাহা	২৭।	সদ্‌গোপ	২৬
তন্তুবায়	২৬	পোদ	২৪

বৈষ্ণব	২৩	নাপিত	২১
মাহিষ্য	২১	কলু	২০
সূত্রধার	১৬	কুম্ভকার	১৫
গোপ	১৪	রাজবংশী	১০
নমঃশূদ্র	১০	০	০

চাষী-কৈবর্ত্তের মধ্যে "লেখাপড়া জানা" লোকের সংখ্যা সোয়া দুই লক্ষ, নমঃশূদ্রদের মধ্যে ১ লক্ষ, রাজবংশীদের মধ্যে ৭৫ হাজার এবং সাহাদের মধ্যে ৫০ হাজার। সুতরাং, অধ্যয়নের হিসাবে "জলচল" সকল জাতিই এবং "জল-অচল" প্রধান ২ জাতি, বৈশ্যাধিকার পাইবার যোগ্য।

কায়স্থদের দানশীলতা বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। যে সকল কৃষিকারী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী জাতি 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের দানশীলতার পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক নাই। কলিকাতার সুবর্ণবণিক্ এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার সাহাবণিক্দের দানের কথা আমি আর কি বলিব! শাক্তদের অপেক্ষা বৈষ্ণবদের দেব-দ্বিজে ভক্তির পরিচয় অল্প নহে, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। দানশীলতার হিসাবে দেখিলে, এই সকল বণিক্জাতি বৈশ্যাধিকারের যোগ্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর গুরুমন্ত্র-গ্রহণ, ভগবানের ধ্যান-ধারণা এবং অহিংসা, 'জলচল' এবং 'জল অচল' শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিজীবী শ্রীচৈতন্যানুগামী সকল জাতিতেই যে অতি সাধারণ হইয়াছে, তাহা গোস্বামী প্রভুগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের ও ভক্তিভাবের শাসনে বঙ্গদেশে এই সকল জাতির মধ্যে দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প হইয়াছে, সেন্সাস্-রিপোর্টে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তথাপি ইহাদের শূদ্রাপবাদ দূর করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন!

পুরাকালের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে বৈশ্যদের জন্য যে সকল বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখন যে সকল জাতি, সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে "বৈশ্য" বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণাদিজাতির কি অনিষ্ট হইবে? শাস্ত্রানুসারে যেমন তপোবীজের হীনতায় জাত্যপকর্ষ হইত, তেমনি তপোবীজের প্রভাবে জাত্যুৎকর্ষও হইত। বেহারে "ভুঁইহার বাভন্"দের সংখ্যা ১১ লক্ষ হইবে। শাস্ত্রাধ্যাপনা ও যাজন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষত্রিয়দের ন্যায় জমিদারী করিতে গিয়া, তাঁহারা এখন "অব্রাহ্মণ" হইয়া পড়িয়াছেন। "জুজোটীয়া ব্রাহ্মণ" বলিয়া তাঁহারা আত্ম-পরিচয়

দেন। বাঙ্গালাদেশের কোন ২ বৈদ্য বলেন, তাঁহাদের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং আরও বলেন যে, শাস্ত্রাধ্যাপনা ও যাজন পরিত্যাগ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করাতে তাঁহারা 'অব্রাহ্মণ' হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা বংশানুক্রমে শাস্ত্রাধ্যাপনা ও যাজন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে 'অব্রাহ্মণ' হইয়া পড়িবেন কিনা, তাহার চিন্তা শুদ্ধশূদ্র ও অশুদ্ধশূদ্রের করিবার আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ-সমাজের পঙ্কিলতা দূর করুন, আর নাই করুন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবৃত্তিধারী শূদ্রেরা বলিতেছেন "আমরা আর ঘৃণিত 'শূদ্র' নামে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। আমাদের জাতির মধ্যে দুই আনা লোকও শূদ্রবৃত্তি বা শ্ববৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন না।" ব্রাহ্মণের মধ্যে (পুরুষ) পাচকাদির সংখ্যা ২৪০০০; * গৃহভৃত্যের মধ্যে কায়স্থদের সংখ্যা ১১০০০, কৈবর্ত্তের মধ্যে ১০,০০০, গোপের মধ্যে ৮০০০, নমঃশূদ্রের মধ্যে ৫০০৭, সদ্গোপের মধ্যে ৫০০০ দেখা যায়, সুতরাং ব্রাহ্মণদের মধ্যে domestic servants এর সংখ্যা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কোনও হিসাবে কম নয়।

সুবর্ণবণিক্, সাহা, তিলি, তাম্বুলী প্রভৃতি জাতি অন্ততঃ হাজার বৎসর বণিগ্-বৃত্তি করিয়া আসিতেছেন। সদ্গোপ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি জাতি বহুশতাব্দী অবধি কৃষিকার্য্যে লিপ্ত আছেন। তন্তুবায়, যোগী, কাংস্যকার, শঙ্খকার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতি বহুদিন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গোপ প্রভৃতি জাতি চিরকাল গোপালন করিয়া আসিতেছেন। এই সকল কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে লিপ্ত সম্প্রদায় যে নীতি ও চরিত্র বিষয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি জাতি অপেক্ষা নীচ নহেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাদেশে দশ সহস্র কায়স্থের মধ্যে ৭ জন এবং ঐ সংখ্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪ জন জেলে প্রবাস করেন। † আর তন্তুবায়, যোগী, মাহিষ্য, পোদ, সদ্গোপ, সাহা প্রভৃতি জাতির দশ সহস্র লোকের মধ্যে একজন বা তন্ন্যূন জেলপ্রবাসী লোক পাওয়া যায়। ১ লক্ষ রাজবংশীর মধ্যে জেলপ্রবাসী ২ জন মাত্র পাওয়া যায়। এই লোভমোহপূর্ণ সংসারে যে জাতি বা সম্প্রদায় যত প্রলোভন সংবরণ করিয়া চলিতে পারেন, তাঁহাদের নৈতিক আসন তত উচ্চ,—ইহা স্বীকার করিলে মনে হয়, বাঙ্গালাদেশে যে সকল জাতি পুরুষানুক্রমে বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও কুসীদবৃত্তি অবলম্বন

* Table XV, Heading X, Domestic servants.

† Bengal census Report part I P 555.

করিয়া আসিয়াছেন, শূদ্রাপবাদ যে তাঁহাদের পক্ষে অনেকটা অসহ্য হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ভারতবর্ষের লোকদিগকে ইংরেজেরা Indian না বলিয়া Native বলিলে তাঁহাদের অসহ্য হয় কেন? আফিষের সাহেব, কেরাণীবাবুকে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা জজ সাহেব, ডিপুটী বা মুন্‌সেফবাবুকে শুধু "বাবু" বলিলে, তাঁহারা অপমান বোধ করেন কেন? নামপরিবর্ত্তন-প্রার্থীরা বলেন যে, ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের সহবাসে যেমন ইংরেজীশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাদির আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের পরিস্ফুরণ হইয়াছে, শূদ্রনামধারীরা তেমনি লেখাপড়া শিখিয়া এবং "অশূদ্র" ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সংসর্গে আসিয়া এবং অনেকস্থলে তাঁহাদের সঙ্গে একই শিক্ষা পাইয়া ও একই নৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, এখন "শূদ্রাভিধান" অপমানকর বোধ করিতেছেন। সুতরাং সুবর্ণবণিক্, সাহাবণিক্, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি জাতীয়-লোকেরা, তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল এখনও ব্রাহ্মণাদির স্পর্শের অযোগ্য—জানিয়া, উচ্চশ্রেণীর উপর বিরক্ত হইতেছেন।

নামপরিবর্ত্তন-প্রার্থীরা বলেন যে, ব্রাহ্মণাদিরা ইংরেজের মত ইংরেজীবিদ্যা শিখিয়া যেমন ইংরাজের সমান হইতে চাহেন এবং দেশে Home Rule বা Self Government প্রচলনের জন্য চেষ্টা করেন, Hewars of wood and Drawers of water অবস্থায় থাকিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল বহন করিতে চাহেন না, শূদ্রনামধারী হিন্দুদের মানসিক অবস্থাও তদনুরূপ। যে সকল ব্রাহ্মণ, বেহারের "ভুঁইহার বাভনের" ন্যায় অথবা বাঙ্গালার বৈদ্যদের ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপন ও যাজনবৃত্তি পুরুষানুক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, গবর্ণমেণ্টের চাকুরি বা জমিদারী কিংবা বাণিজ্য বা শকটবাহন অথবা পাচকতা কি অন্য কোনপ্রকার অব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে অধ্যাপক ও যাজক ব্রাহ্মণেরা পংক্তি-ভোজন ও যৌনসম্বন্ধ বজায় রাখিতে চাহেন, রাখুন, তাহাতে শূদ্রনাম-ভিতিক্ষু ব্যক্তিদের কোন বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু যে সকল জাতি আজ সহস্রাধিক বৎসর হইতে ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত "প্রেমের ধর্ম্ম" অবলম্বন করিয়া শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে শূদ্রাপবাদ দিয়া উপনয়ন-সংস্কার এবং কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণদের যাজন হইতে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। শুধু ইংরেজের রমক্কেই Nationalismএর দোহাই দিব, অথচ দেশের চৌদ্দ আনা লোক

দোকানী, চাষী, তন্তুবায়, যোগী, সূত্রধর দেখিলে সেই Nationalism ভুলিয়া যাইব, ইহা কি সঙ্গত ব্যবহার ?

মনুস্মৃতির ১০ম অধ্যায়ে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, আপৎকালেও শ্রেষ্ঠবর্ণের জীবিকা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু আপৎকাল উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, নিকৃষ্টবর্ণের জীবিকা গ্রহণ করিবেন এবং আপৎশান্তি হইলেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বিধান। ঝড় উপস্থিত ; তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লই এবং ঝড় শান্ত হইলেই তথা হইতে চলিয়া আসি। একবার আশ্রয় পাইয়াছি বলিয়া "এই বাড়ী ছাড়িব না" বলিতে পারি কি ? সেন্‌সাস্‌রিপোর্টে ‡ জানা যায় যে, বঙ্গদেশে ৩৬৪০০০ ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের বাস। ইঁহাদের মধ্যে মাত্র ৮১০০০, অথবা রকম ৵১০ যাজকতা ও অধ্যাপনা করেন। অবশিষ্ট ৷৵১০ সাড়ে বার আনা 'পরধর্ম্ম' অথবা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ৫৪০০০ জমিদারীর উপস্বত্বভোগী, ৬৮০০০ কৃষিজীবী, ১৮০০০ নায়েব ও গোমস্তা, ১০০০০ শিল্পী, ২৪০০০ বাণিজ্যজীবী, ১৭০০০ গবর্ণমেণ্টের চাকুরীয়া, ২৩০০০ উকীল, মোক্তার ও ডাক্তার এবং ২৪০০০ পাচক ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেরা সাড়ে বার আনা বংশানুক্রমে 'পরধর্ম্ম' অথবা অপরবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। করুন, তাহাতে শুদ্ধশূদ্র ও অশুদ্ধশূদ্রদের কোন আপত্তি নাই। ব্রাহ্মণের 'স্বধর্ম্ম' যাজকতা, শাস্ত্রাধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহে ইঁহারা কোনরূপ ভাগ বসাইতে চাহেন না। যাঁহারা আজ সহস্র বৎসর হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়নাম ও বৈশ্যনাম-গ্রহণে এবং ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের আচার অবলম্বনে যদি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা কোন প্রকারে বাধা না দেন এবং বিঘ্ন না ঘটান ; তাহা হইলেই যথেষ্ট।

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা যে পরিমাণে 'পরধর্ম্ম' অবলম্বন করিয়াছেন, কৃষিকারী, শিল্পী ও বাণিজ্য-লিপ্ত জাতির লোকেরা তত করেন নাই। যে জাতির যত লোক 'স্বধর্ম্ম' অবলম্বন করিয়া আছেন, সেন্‌সাস্‌-রিপোর্ট ¶ হইতে তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

‡ Table XVI, Part II.

¶ Table XVI, Part II.

	জাতি	পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়	পশ্চিম-বাঙ্গালায়
১।	ব্রাহ্মণ	২৮	১৯
২।	বৈদ্য	১৫	
৩।	কায়স্থ		২৯
৪।	বারুজীবী	৬১	০
৫।	সদ্‌গোপ	০	৮১
৬।	কর্ম্মকার	৪৭	৬৩
৮।	কুম্ভকার	৭৫	৭২
৯।	সূত্রধর	৬৬	৫০
৯।	তন্তুবায়	০	৪২
১০।	মাহিষ্য	৭৭	৭৯
১১।	গোপ	২৮	৬২
১২।	নাপিত	৪৯	৫৭
১৩।	কাংস্যকার		৪২
১৪।	গন্ধবণিক্		৫৯
১৫।	রজক	৪৮	৬০
১৬।	চর্ম্মকার	২৩	৩৬

নাম-পরিবর্ত্তন প্রার্থীরা বলেন, যে সকল জাতি বিশুদ্ধিবৃত্তি বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও কুসীদ অবলম্বন করিয়াছেন, সুব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের যাজন করিলে তাঁহাদের মধ্যে জাতীয়তার এক নূতন বন্ধন দেখা দিবে। তাহা হইতে নাম-পরি-বর্ত্তন-প্রার্থীদের মধ্যে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বাড়িতে থাকিবে এবং তাঁহারা লেখাপড়া শিখিলেও চাকুরির জন্য এত লালায়িত হইবেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই সৎশূদ্রদের যাজন করেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকেই সাহা ও মাহিষ্যাদির যাজন করিতে হইবে, তাহা নয়। কিন্তু, যে সকল ব্রাহ্মণ, সাহা সুবর্ণবণিক প্রভৃতির যাজন করিবেন, ব্রাহ্মণ ডাক্তার ও ব্রাহ্মণ জমিদারের ন্যায় তাঁহারাও যেন 'ঘৃণার পাত্র' না হইয়া বরং সম্মানের পাত্র হয়েন। আর তাঁহারাও যেন অপর ব্রাহ্মণ-গণের সহিত পংক্তিভোজন করিবার অধিকার না হারান্।

এখন মানসম্ভ্রম-বৃদ্ধির জন্য বারুজীবী, সদেগাপ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, গোপ প্রভৃতি জাতির লোকেরা ইংরেজী শিখিয়া এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের ন্যায় চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া চাকুরীর বাজার নিতান্ত গরম করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহাতে

বাণিজ্য ও কৃষি লজ্জার বিষয় না হয়, সেই জন্য "শূদ্রদের" ক্ষত্রি -বৈশ্য-নাম-গ্রহণে এবং ক্ষাত্র-বৈশ্যাচার অবলম্বনে বাধা না দিয়া, স্বার্থের অনুরোধে, তাহাতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যগণের উৎসাহ দেওয়াই উচিত।

যে সকল তথাকথিত 'শূদ্র'জাতি বংশানুক্রমে ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'ক্ষত্রিয়' ও 'বৈশ্য' বলিয়া স্বীকার না করিলে এবং তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার-দান ও যাজনক্রিয়া না করিলে, মান্দ্রাজের 'ব্রাহ্মণ' ও 'অব্রাহ্মণে'র বিরোধের ন্যায় বঙ্গদেশে হয়তো 'জল-চল' এবং 'জল-অচলের' মধ্যে, 'যাজ্য' এবং 'অযাজ্যের' মধ্যে সময়ে তুমুল বিরোধ উপস্থিত হইবে। স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে এই 'জল-চল' এবং 'জল-অচলে'র বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখন শ্রীযুত লায়ন্ সাহেব, একজন বি-এ উপাধিধারী নমঃশূদ্রকে ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেটী পদ দিয়া কলহ থামাইয়া দেন। 'জল চল' হিন্দুর সংখ্যা সবে অর্দ্ধকোটি, এবং 'জল-অচল' হিন্দুর সংখ্যা দেড়কোটি। 'জল-চলে'র মধ্যে 'লেখাপড়া জানা' লোকের সংখ্যা ১০।১১ লক্ষ, এবং 'জল-অচল' হিন্দুর মধ্যে অধীয়ানের সংখ্যা ১২।১৩ লক্ষ। 'জল-অচল'সম্প্রদায় প্রধানতঃ বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদিগকে 'জল অচল' বা 'অযাজ্য' বলিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থায় আরও অধিকদিন রাখিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের চাকুরিসমূহে মুসলমানদের ন্যায় লোকসংখ্যার অনুপাত অনুসারে হিন্দুর প্রাপ্য হইতে অর্দ্ধাংশের অধিক দাবি করিবেন। তখন 'অশূদ্র' ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের কি অবস্থা হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। স্যার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, সংশূদ্র কায়স্থরা হিন্দু ও মুসলমান-রাজত্ব-সময় হইতে গবর্ণমেণ্টের Civil and military serviceএর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। উহা কায়স্থেরই জাতীয় পেশা; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের নহে। কায়স্থদের 'শূদ্রাপবাদ' বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত হাস্যজনক হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, অবস্থার তাড়নায় ৪ বর্ণ চারিশত জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং অবস্থার তাড়নায় আপনা হইতেই চারিশত জাতি স্থলে আবার ৪ বর্ণ হইয়া প্রাচীন অনুলোম-বিবাহপ্রথা পর্য্যন্ত প্রচলিত হইবে এবং সমগ্র হিন্দু-সমাজকে এক জাতি বা Nation করিয়া তুলিবে। এইজন্য জাতিবিভাগ-সংস্কারের কোন চেষ্টা ও উদ্যোগ করিতে হইবে না; কাহারও কোন প্রকার হৈ চৈ করিবার আবশ্যকতা নাই। সাহাজাতীয় লোক হাইকোর্টে 'জজিয়তি' করিয়াছেন।

তিলি ও সুবর্ণবণিকেরা সুপ্রীম্ কাউন্সীলে 'মেম্বরী' করিতেছেন; নমঃশূদ্র-সন্তান ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেছেন। সুতরাং 'সৎ-শূদ্র' হউক্ আর 'অশুদ্ধশূদ্র' হউক্, শূদ্রাপবাদ হইতে কোনও জাতির উন্নতির ব্যাঘাত হয় নাই। বিশেষতঃ অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলন অবধি জাতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের নিয়ম একঅর্থে উঠিয়া গিয়াছে। সুবর্ণবণিক্ ও সাহারা বৈশ্যের সমকক্ষ, কায়স্থ এবং বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের সমকক্ষ, তিলি বারুজীবী ও সদ্গোপেরা বৈদ্য ও কায়স্থের সমকক্ষ, নমঃশূদ্র ও মাহিষ্যেরা তিলি ও সদ্গোপের সমকক্ষ বলিয়া নিজেদের মনে করিতেছেন। ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যের গৌরব, ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই পরিত্যাগ করিতেছেন। পুরোহিতের দশা Hedge prist এর মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে পাচক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পুরোহিতকে অধিক শ্রদ্ধা করেন না। ব্রাহ্মণদিগের ৮১০ লোকের স্বধর্ম্মপরিত্যাগের ফলে তাঁহাদের অধিক দান করেন না। উদাহরণ দেখিয়া শূদ্রনামধারীরাও কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া, মানসম্ভ্রমবৃদ্ধির আশায় 'রাজসেবক' এবং উকীল মোক্তার হইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন। এই দেড়কোটি 'জল-অচল' লোক হিন্দুসমাজে থাকুক্ বা মুসলমান্-সমাজে যাউক্ বা খৃষ্টানসমাজে যাউক্, অথবা জাহান্নামে যাউক্, সেই কথা ব্রাহ্মণদের যেন ভাবিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

এই প্রকার ঔদাসীন্য বা নিশ্চেষ্টতা হইতে কি ব্রাহ্মণসমাজের মঙ্গল হইবে? ব্রাহ্মণেরা চিরকালই এইপ্রকার নিশ্চেষ্ট ছিলেন কি? অন্যান্য জাতির মঙ্গল সম্বন্ধে এইপ্রকার উদাসীন হইয়া এবং জন কয়েক 'সৎশূদ্র' লইয়া থাকিলে, ব্রাহ্মণেরা কি 'সকল জাতির শ্রেষ্ঠ' বলিয়া ভবিষ্যতে শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবেন? ৪।।০ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও 'সৎশূদ্রেরা' সংখ্যায় অর্দ্ধকোটি মাত্র। মুসলমান্দিগকেও ভুলিলে চলিবে না। অন্যান্য প্রদেশের কথা জানি না, বাঙ্গালায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের যে ব্রাহ্মণবংশ হইতে এই চারিশত বৎসর ধারাক্রমে এই সকল মহাত্মার ন্যায় বহুলোকের জন্ম হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণবংশের লোকেরা যে বিশুদ্ধ কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প-বৃত্তিতে নিযুক্ত জাতি-সমূহের উন্নতি ও আত্মমর্য্যাদা-বৃদ্ধি সম্বন্ধে চিরকাল উদাসীন থাকিবেন, অথবা তাঁহারা হিন্দুসমাজের এক বিরাট্ অংশ মুসলমান্ হইয়া যাইবে—এরূপ ইচ্ছা করেন, ইহা আমি মনে করি না। মনে করিলে এ প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতাম না।

আমি জানি, অনেক ইংরেজীশিক্ষিত ভদ্রসন্তান গর্ব্ব করেন যে, তাঁহারাই কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণ করিবেন। কলিকাতায় বাঙ্গালী দোকানদার অপেক্ষা মাড়োয়ারী, পশ্চিমা ও উড়িয়া দোকানদার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মাড়োয়ারীরা বাজারে বাজারে ছোট কল বসাইয়া ময়দা ও ডা'ল তৈয়ার করিতেছেন। চীনা ছুতার ও শিখ ছুতারে কলিকাতা ভরিয়া গিয়াছে। কৃষিকার্য্য অধিকপরিমাণে মুসলমানদের হস্তগত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি, কয়জন শিক্ষিত ভদ্রহিন্দু তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? আমি ভদ্রসন্তানদিগকে এজন্য কোন দোষ দেই না। পুরুষপরম্পরাগত সংস্কার পরিত্যাগ করা সহজ নয়। বিলাতে লর্ডদের পুত্রেরা কলকারখানার উন্নতি করেন নাই। বোম্বাইয়ে ভাটিয়ারা বণিকেরা (ব্রাহ্মণেরা নয়) কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

এজন্য আমি বলি, কৃষকের সন্তানকে উন্নত কৃষিপ্রণালী শিখাইয়া, তন্তুবায় ও যোগীদের সন্তানকে উন্নত তাঁতের সন্ধান শিক্ষা দিয়া, রংরেজের সন্তানকে রঙের বিদ্যা প্রদান করিয়া এবং কর্ম্মকারের সন্তানকে যন্ত্র-প্রস্তুতকরণে দীক্ষা দিয়া, তাঁহাদের দ্বারাই ঐ সকল ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইবে।

যাঁহারা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত নহেন, অন্ধের চক্ষুষ্মান্কে পথপ্রদর্শনের ন্যায়, তাঁহারাই কৃষকদিগকে বলিয়া থাকেন যে, "বিলাতী যন্ত্র ব্যবহার কর, বিলাতের এঞ্জিন্ দিয়া চাষ কর; Thrashing machine আনিয়া ধান, সরিষা, যব, গোম ঝাড়; Readping machine আনিয়া ধান্ কাট।" ধনাঢ্য লোকেরাই এই প্রকার ব্যয়সাধ্য যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন। বিলাতে এবং আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে এক একটী ক্ষেত্রের পরিমাণ ৪০।৫০ বিঘা; আর আমাদের দেশে একএকটী ক্ষেত্র ৪।৫ কাঠা মাত্র। এজন্য বেহারের নীলকরেরাও ধান্, গোম প্রভৃতির চাষে বিলাতের যন্ত্র ব্যবহার করেন না। বিলাতের কৃষিপ্রণালী আমাদের দেশে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। আলু, পটোল, পাট, বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চাষের উন্নতি, ইংরাজের বা দেশীয় ভদ্রলোকদের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই এদেশের কৃষকেরা সম্পাদন করিয়াছেন। ধনাঢ্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-বৈদ্যেরা কয়টা পাটের কল করিয়াছেন? কয়টা চাবাগান খুলিয়াছেন, অথবা কয়লার খনি করিয়াছেন? তাঁহারা (সমুদ্র দূরে থাক্) বাঙ্গালার নদীসমূহে কয়খানি জাহাজ চালাইতেছেন? শিক্ষিত ভদ্রলোকের বড়াইর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। চিরন্তন-ব্যবসায়-প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন করা

সহজ নয়। কৃষক, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতির দ্বারাই কৃষির ও কলের উন্নতি করিতে হইবে। এজন্য তাঁহাদের বৃত্তি "ঘৃণার বৃত্তি" না হইয়া "শ্রদ্ধার বৃত্তি" হওয়া আবশ্যক।

আসলকথা এই যে, বর্ণগত-ভেদ হইতে এতদিন যে জাতিতে জাতিতে দূরত্ব ছিল, ইংরেজীশিক্ষার প্রবর্ত্তন অবধি শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের মধ্যে ইংরেজীশিক্ষার বহুল প্রচলন এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার সবিশেষ উন্নতি-সাধন হওয়ায়, ঐ চিরন্তন ভেদ, দিন দিন অধিকতর বিস্তার লাভ করিতেছে। বিবেচ্য, এই কথা সত্য কিনা? যদি সত্য হয়, তবে যথার্থই আশঙ্কার বিষয়। "জল-চল" এবং 'জল-অচল' যে সকল জাতি এখনও প্রধানতঃ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারা এই বর্দ্ধমান বিপদের প্রতীকারার্থ সেন্সাস্-অফিসারদিগের নিকট দশবৎসর অন্তর যে প্রস্তাব করিয়া আসিতেছেন, তাহা আপনারা বিদিত আছেন। সেই সকল প্রস্তাব সঙ্গত কিনা, বিচার করুন। যদি এ সকল জাতির উদ্ভাবিত প্রতীকার-প্রস্তাব অপেক্ষা আপনারা অধিকতর সদুপায়-প্রস্তাব চিন্তা করিয়া থাকেন, তাহা প্রকাশ করিয়া, ঐ সকল জাতির 'অবুঝ' লোকদিগকে বুঝাইয়া বলুন। স্যার নারায়ণচন্দ্রভর্কার যথার্থই বলিয়াছেন যে, "শ্রীযুক্ত তিলক, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি লোকদিগের সম্পর্ক ও সহবাস একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষের Viceroy, Governor প্রভৃতি শাসনকর্ত্তারা ভুল বুঝিতেছেন।" ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতীয় লোকেরাও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রাজবংশী, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ও সদ্গোপ প্রভৃতির এবং বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত সাহা, তিলি, কলু, গোপ প্রভৃতির সংসর্গ অধিকরূপে বর্জ্জন করিয়া তেমনি ভুল করিতেছেন কিনা—তাহা শান্তচিত্তে ভাবিয়া দেখুন।

আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যেমন জাতিসমন্বয়ের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, অধুনাতন যাজনমূলক (জাতিমূলক) ভেদনীতি-পরিহারের জন্য ব্রাহ্মণসমাজের তেমনি প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। এদদুত্তরে ব্রাহ্মণেরা বলিবেন যে, "জল-অচল" ১॥০ কোটী হিন্দুর উপর তাঁহাদের কোন প্রভুত্ব নাই। 'জল-চল' অর্দ্ধকোটি হিন্দু, প্রায় ২০ কি ২৫ "সৎশূদ্র"জাতিতে বিভক্ত; তাঁহারা সকলেই স্ব ২ প্রধান। শুধু প্রতিমাপূজায় ও বিবাহ-শ্রাদ্ধাদির সময়ে এবং অন্নপাকের সময়ে তাঁহাদের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। নতুবা ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা "জলচল" নহেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে "জলচল" করিতে চেষ্টা করিলে, বৈদ্য-কায়স্থ-নবশাখাদি "জলচল"-জাতীয়েরা বোধ

বিরোধ ঘটাইতেন। আপনারা অনেকে "হিন্দুপত্রিকা"র সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়কে জানেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিবেশী নমঃশূদ্রেরা "জলচল" হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, তিনি নমঃশূদ্র, পোদ, চর্ম্মকার প্রভৃতি জাতির লোককে এক সভায় আহ্বান করেন। সেই সভায় দেখা গেল যে, নমঃশূদ্রেরা চর্ম্মকার প্রভৃতির জল গ্রহণ করিতে অসম্মত। যিনি নিম্নজাতির জলগ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, উচ্চজাতির লোকে তাঁহার জলগ্রহণ করিবেন, কি করিয়া তিনি তাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন ?

এই যে জাতির নাম-পরিবর্ত্তনের আন্দোলন—ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, ও বৈশ্যত্ব-লাভের চেষ্টা—তাহার মূলে এই একটী ভাব রহিয়াছে যে "আমি বড় জাতি হইব, কিন্তু আমার জাতিতে ছোটজাতির কাহাকেও উঠাইব না।" অমিশ্র স্বার্থপরতা যে চেষ্টার মূলে থাকে, তাহা সফল হওয়া সম্ভব নয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন হরিদাসকে প্রেমালিঙ্গন দেন, তখন হরিদাস তদপেক্ষা নিকৃষ্টজাতীয় লোককে আলিঙ্গন দেন কিনা, তাহার অপেক্ষা করিয়াছিলেন কি ? রাজা রামমোহন রায় যখন কায়স্থকে ব্রাহ্মসমাজে একসঙ্গে বসাইয়া ভগবানের মিলিত উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন, তখন কায়স্থেরাও তদনুরূপ তন্তুবায় প্রভৃতিকে একাসনে বা একপংক্তিতে বসান কিনা, তাহার অপেক্ষা করিয়াছিলেন কি ? কবি বলেন—আপন্নার্ত্তি-প্রশমনে সৎলোকের সম্পদের সার্থকতা হয়! * নীচজাতিকে উৎকর্ষ-লাভে সহায়তা করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব সফলতা লাভ করে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণের এই উদাহরণ, ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব-প্রার্থীদের সর্ব্বাগ্রে অনুকরণীয়।

কি উদ্দেশ্যে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট সেন্‌সাস্-গণনা করেন, আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝি না। মোটের উপর দেখিতে পাই যে, ভাষার সংখ্যা ও জাতির সংখ্যা যত বেশী বাহির হয়, ততই যেন সেন্‌সাস্-কর্ত্তারা আহ্লাদে আট্‌খানা হয়েন। বাঙ্গালা-দেশে একটা ভাষা নয়, দুই তিনটা ভাষা ; বেহারে একটা ভাষা নয়, তিনচারটা ভাষা। জাতি সম্বন্ধেও ব্রাহ্মণেরা একজাতি নহেন ; নবশাখেরা একজাতি নহেন। যেখানে বিবাহের স্বতন্ত্র গণ্ডী, সেইখানেই এক নূতন জাতি হইল—সেন্‌সাস্-কর্ত্তাদের এই ধারণা। বাঙ্গালার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত মুসলমানেরা—(চাষী, জোলা, খালাসী, দোকানীরা) সকলেই

* আপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্। মেঘদূত

"শেখ" বলিয়া পরিচয় দিয়া, প্রায় ২।০ সোয়াদুই কোটি লোক একসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছেন। যদি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত আধুনিক নবশাখ ও অন্যান্য জাতি বৈশ্যনাম গ্রহণ করেন, অথবা বৈদ্য ও কায়স্থেরা ক্ষত্রিয়-নাম গ্রহণ করেন, তবে সেন্‌সাস্‌-অফিসর্‌দের তাহাতে কোন আপত্তি করিবার কারণ নাই। বিশেষতঃ তাহাতে হিন্দুসমাজে কোন বিপ্লব (Catastraphic changes) ঘটিবে না। বিবাহাদির নিয়ম তেমনি চলিবে, যাজনাদি তেমনি থাকিবে, পাংক্তেয়তার নিয়মরক্ষার কোন বাধা পড়িবে না। নৈকষ্যের কুলীনত্ব যাইবে না, বংশজ বা শ্রোত্রিয়ও কুলীনত্ব পাইবে না। তবে আপনারা ঘরে ২ বিবাদ করিয়া, ক্ষত্রিয়নাম-প্রার্থী ও বৈশ্যনাম-প্রার্থীদের বিরাগভাজন হয়েন কেন? সৈয়দ্‌ ও পাঠান প্রভৃতি অভিজাত মুসলমানেরা ত অন্যান্য মুসলমান্‌দের "শেখ" বা "আরববাসী" নাম-গ্রহণে বাধা দেন নাই? তবে সেন্‌সাস্‌-সময়ে বাঙ্গালাদেশে কায়স্থদের ক্ষত্রিয়-নাম-গ্রহণে এবং অন্যান্য জাতির বৈশ্যনাম-গ্রহণে এবং উপবীত-ধারণে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যেরা অসন্তুষ্ট হয়েন কেন, এবং ঐ সকল জাতির আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করেন কেন?

নাম-পরিবর্ত্তন ঘটিলে কায়স্থেরা তরবারি ধরিবেন এবং দেশরক্ষা করিবেন, অথবা চাষীরা চাষে নিযুক্ত থাকিবেন না, মুদী দোকান ছাড়িবেন, তন্তুবায় ও যোগী তাঁত ছাড়িবেন, সদেগাপ ও মাহিষ্য লাঙ্গল ছাড়িবেন—এই সকল কথা সত্য না হইলেও যখন এই সকল জাতির লোক 'শূদ্র' নামে লজ্জিত হইয়াছেন এবং স্বদেশীয়ের নিকট বিফলযত্ন হইয়া, বিদেশীয় সেন্‌সাস্‌-অফিসর্‌দের নিকট শূদ্রাপবাদ হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করিতেছেন, তখন দেশের লোকেরা ঘরে ২ বিবাদ করিয়া জাতীয়ঘনিষ্ঠতা-লাভের পথে কণ্টক-রোপণ করেন কেন?

যদি সেন্‌সাস্‌-অফিসারের নিকট নূতন নাম রেজেষ্টারী করিয়া, কায়স্থ বা সদেগাপেরা ব্রাহ্মণকে বলেন যে—"আমাকে উপবীত দেও এবং ১২ দিনে মৃতাশৌচ-শান্তি কর—" তখন তাহার বিচার, পুরোহিত ঠাকুর যাহা হয় করিবেন। তাহার সঙ্গে এই সেন্‌সাস্‌-সময়ে নামজারির কি সম্পর্ক? ইংরেজের সমক্ষে এই গৃহবিবাদ কেন?

জাতির নাম-পরিবর্ত্তনের বিরোধীরা বলেন যে, লোকে বাণিজ্য ও কৃষিকে অধিক অবজ্ঞা করে, একথা ঠিক্‌ নয়। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি এবং বিদ্যার আদর, বঙ্গদেশে কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির অস্থিমজ্জাগত।

বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

ঋষিদের বংশধরেরা যতদিন সৎপ্রতিগ্রহ ও ব্রহ্মোত্তর জমির উৎপন্ন হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ততদিন পাণ্ডিত্যের সংস্পর্শে কৃষিবৃত্তিও গৌরবের বিষয় ছিল। 'লেখাপড়াজানা' লোক মোক্তার, উকীল ও কেরাণী হইতেছেন এবং বিলাতী কাপড় ও জুতা বিক্রয় করিতেছেন বলিয়া, মোক্তারী, ওকালতী, কেরাণী-গিরি এবং কাপড়-বিক্রয় ও জুতা-বিক্রয় সম্ভ্রান্তলোকের বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতেছে। নাপিতের পরিবর্ত্তে ফোঁড়া-ফুস্কুড়ী কাটিবার ভার শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতেই সার্জ্জরী (surjery) সম্মানের ব্যবসায় হইয়াছে! বিদ্যার এমনি গৌরব! বিদ্বান্‌দের কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইবার এক অলঙ্ঘনীয় বিঘ্ন রহিয়াছে।

এদেশে এতদিন প্রবাদ ছিল—

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥

কিন্তু ইংরেজের অধিকার হইতে রাজসেবায় এবং ইংরেজীবিদ্যাসাধ্য ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসায়ে বাণিজ্য অপেক্ষাও লক্ষ্মীর দৃষ্টি অধিক। ২৪০০০ ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ বাণিজ্য করিয়া এবং ৫৮০০০ ব্রাহ্মণ গবর্ণমেণ্টের ও জমিদারের চাকুরি এবং ওকালতী ডাক্তারী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। সুতরাং লাভের পর্য্যায় হিসাবে রাজসেবা এবং তদানুষঙ্গিক ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসায় প্রথম-স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষিকর্ম্ম সকলের নীচে স্থান পাইয়াছে। রাজসেবাকারীদের মধ্যে বিদ্বানের সংখ্যা অধিক এবং কৃষিজীবিদের মধ্যে বিদ্বানের সংখ্যা এখন অল্প হইয়াছে। "রাজসেবা" অপেক্ষা কৃষিতে লাভ কম এবং কৃষিকার্য্যে লিপ্ত লোকের মধ্যে বিদ্বানের অভাব—এই উভয় কারণে কৃষির অনাদর এবং কৃষিজীবীর অসম্ভ্রম।

ইংরেজগবর্ণমেণ্ট উচ্চবেতনের প্রলোভন দেখাইয়া দেশের বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে চাকুরী দিতেছেন। ইংরেজগবর্ণমেণ্ট যত চাকুরির সৃষ্টি করিয়াছেন, হিন্দুরাজাদের অধিকারসময়ে অথবা মুসলমান্-বাদসাহের অধিকার-সময়ে তাহার একদশমাংশ ছিল কিনা, তাহাও সন্দেহ-স্থল। সকল জাতির লোকই এই চাকুরির জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন। ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য ও যাজকতা ছাড়িতেছেন, বৈদ্যেরা কবিরাজী পরিত্যাগ

করিতেছেন, সুবর্ণবণিক্, সাহা, তিলি প্রভৃতি বাণিজ্যজীবীরা দোকানদারি ছাড়িতেছেন; সদ্গোপ, বারুজীবী, মাহিষ্যেরা চাষবাস পরিত্যাগ করিতেছেন। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, গবর্ণমেণ্টের চাকরদের বেতন অর্দ্ধেক হইয়া যাইবে; তখন আর শিক্ষিতব্যক্তিরা "রাজসেবার" জন্য পাগল হইবেন না—কেহ কেহ এই কথা বলেন। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে চাকুরীর সংখ্যা কমিবে না, অথবা চাকরদের বেতন কমিবে না, তবে শিক্ষিত লোকেরা ॥৴ আনা চাকুরি না পাইয়া কৃষি ও বাণিজ্যে যাইবেন, ইহা সম্ভব। যতদিন বাণিজ্যের লাভ বা চাষের লাভ চাকুরির লাভের অপেক্ষা অধিক না হইবে, ততদিন বাণিজ্যের ও চাষের অনাদর বাড়িতে থাকিবে।

এই কথা যদি ঠিক হয়, তবে তাহার প্রতীকার-চেষ্টা করা উচিত। যে সকল জাতি প্রধানতঃ শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে লিপ্ত, তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, বৈশ্যনাম ও বৈশ্যাচারানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইলে, তাঁহাদের জাতির সম্মান বাড়িবে, কৃষি-বাণিজ্য পরিত্যাগ করিবার একটী প্রলোভন দূর হইবে এবং লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহারা কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন। তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত হইলেও ব্রাহ্মণাদি হিন্দুর কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের মনোমত-সিদ্ধি-লাভের পক্ষে আগামী আদমসুমারি-সময়ে শত্রুতা না করিয়া, তাঁহাদের সহায়তা করেন। ব্রাহ্মণ্যরাজনীতির অনুকরণে ইংরাজেরা নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া এবং এদেশের জনকয়েক লোককে লেখাপড়া শিখাইয়া ও ২। ৪ জনকে চাকুরি দিয়া "জলচল" সৎশূদ্র করিয়া রাখিয়াছেন; (ইঁহাদের অপর নাম Educated class) এবং অবশিষ্ট সকল লোককে নিরেট্ মূর্খ (illiterate) রাখিয়া, বিলাতের কল কারখানার Raw materials যোগাইবার জন্য, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে Agricultural Department বা কৃষিবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। এই মূর্খ দলের অপরনাম "জল-অচল" অথবা uneducated class. বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট ইংরেজের রাজনীতি-শিক্ষা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজদের এই প্রকার রাজনীতির বিরুদ্ধে, আমরা কেহ ২ Congress, League, Conference করিয়া প্রতিবাদ করিতেছি। ইংরেজরা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না বলিয়া রোষ করিতেছি। কিন্তু, এই হাজার বৎসর হইতে বঙ্গদেশে যে সকল লোক 'শূদ্র' হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের শূদ্রাপবাদ-মোচনের প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করি না। ইহা কি অসঙ্গত ব্যবহার নয়? ইংরেজরাজের অধীনে পুনঃ পুনঃ স্বায়ত্তশাসনের প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইয়া কেহ ২ স্বরাজ্য-স্থাপনের

কল্পনাও করিতেছেন। শূদ্রদের বৈশ্যত্বলাভের প্রার্থনায় অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে আজ নমঃশূদ্রেরা ব্রাহ্মণত্বের এবং রাজবংশী, প্রামাণিক, কোঁচ ও পোদেরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব স্বীকার না করিয়া, তথাকথিত শূদ্রদের যত অনিষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা নিজের ততোধিক অনিষ্ট করিতেছেন কিনা, ধীরচিত্তে তাহাও তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়া অসম্ভব হয়, তবে বঙ্গদেশে হিন্দুদের ৸৵ আনা লোকের শূদ্রাপবাদ-মোচন না করিয়া, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বজায় রাখাও তেমনি অসম্ভব। সুতরাং "অশূদ্র" এবং "শূদ্র" উভয়-সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থে এই শূদ্রাপবাদ-মোচন করা উচিত।

পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ; হে ভগবন্, তুমি আমাদের সকলের পিতা হইয়া পালন করিতেছ; তুমি আমাদিগকে ধী, বুদ্ধি, সুমতি প্রেরণ করিতেছ; আমরা বিনাশের পথে চলিয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। *

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥১০

সান্বয়ব্যাখ্যা। অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং (বিশ্বং) সূয়তে (প্রসূয়তে, জনয়তি, উৎপাদয়তি) (অহং তু তত্তৎপ্রবৃত্তেঃ সাক্ষিমাত্রঃ) হে কৌন্তেয়, অনেন (মদধিষ্ঠানেন) হেতুনা ইদং জগত্ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃপুনর্জায়তে) (বিসৃজাম্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধভাবমুক্তম্ তত্পরিহারার্থং সান্নিধ্যমাত্রেণ অধিষ্ঠাতৃত্বাত্ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বং চাবিরুদ্ধমিত্যুচ্যতে। ১০

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করেন এবং আমার অধিষ্ঠান-জন্য এই জগৎ বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১০

---

* শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় কলিকাতায় 'দেবালয়ে' এই প্রবন্ধ পাঠ করেন।
হিঃ পঃ সঃ।

আলোচনা। ভগবান্ ৭ম শ্লোকে বলিয়াছেন—"প্রলয়কালে ভূতসকল আমার প্রকৃতিতে লীন থাকে, কল্পাদিতে আমি ঐ সকল পুনঃ সৃজন করি।" ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন—"আমি নিজ মায়া-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রভাবে ভূতগণকে বারংবার সৃজন করি।" ৯ম শ্লোকে—বলিয়াছেন "আমি উদাসীনবৎ থাকি, আমি কিছুতেই আসক্ত নই; আমি কিছুই করি না।" এই পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে—তাহার মীমাংসার্থ বলিতেছেন যে, "আমার অধিষ্ঠানবশতই প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব করেন।" ৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে ভগবান্ তাঁহার 'পরা' ও 'অপরা' প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। পরাপ্রকৃতি চৈতন্যময়ী, অপরাপ্রকৃতি জড়া। পরাপ্রকৃতি নিমিত্তকারণ, জড়া প্রকৃতি উপাদানকারণ। ইহারা কেহ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না। ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি কোন কার্য্যেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করি না; আমি উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি মাত্র। পরাপ্রকৃতি বা চৈতন্যের সান্নিধ্য বা অধিষ্ঠান-হেতু অপরা জড়াপ্রকৃতি হইতে জগদ্রূপ কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রকৃতি ঈশ্বরে অবস্থিত আছেন, অথচ নিজ স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিতেছেন; অতএব ঈশ্বর 'কর্ত্তা' হইলেও তাঁহাকে 'উদাসীন' বলা অসঙ্গত হয় না। এই ব্যাপারটী বুঝাইবার জন্য "গীতার্থ-সন্দীপনীতে" একটী সুন্দর উপমা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই—

"সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশ-গুণে লোকে ভাল-মন্দ কার্য্য সম্পাদন করিলে, সূর্য্যকে যেমন সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া গণনা করা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ বিকাশিত হইলে এবং সুখ-দুঃখাদি নানা ক্রিয়া সম্প্রাদিত হইলেও পরমাত্মা তত্তাবতের কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হন না।" এতদর্থে ভগবান্ ৫ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমার যোগপ্রভাব দর্শন কর—আমার অঘটনঘটনচাতুর্য্য অবলোকন কর—অর্থাৎ আমাতে সকলই সম্ভব। ভগবানের এই অসম্ভব-সম্পাদন-শক্তি লক্ষ্য করিয়া ভক্তকৃত একটী গীতে বলা হইয়াছে—"অসম্ভব যত তোমাতে সম্ভব।" ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ। ১২

সান্বয়ব্যাখ্যা। মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশকরী মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং) রাক্ষসীং (রক্ষসাং প্রকৃতিং হিংসাদিপ্রচুরাং তামসীং) আসুরীং (অসুরাণাং প্রকৃতিং রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং) চ প্রকৃতিং এব শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ সন্তঃ) (মত্তঃ অন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীতি বিশ্বস্তাঃ) মোঘাশাঃ (নিষ্ফলাশাঃ) মোঘকর্ম্মাণঃ (বিফলকর্ম্মাণঃ) মোঘজ্ঞানাঃ (জ্ঞানহীনাঃ নানা-কুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে) (অতএব) বিচেতসঃ (বিগত-বিবেকাঃ বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) মূঢ়াঃ (মূর্খাঃ) ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবং (সর্ব্বভূত-মহেশ্বররূপং মদীয়ং প্রকৃষ্টং ভাবং) অজানন্তঃ মানুষীং তনুং আশ্রিতং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং বিহায় ভক্তেচ্ছাবশাৎ মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তং) মাং অব-জানন্তি (অবমন্যন্তে)। ১১।১২

বঙ্গানুবাদ। যাহারা বুদ্ধিভ্রংশকরী রাক্ষসী-আসুরী প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাহারা বিফল-আশাসম্পন্ন বিফলকর্ম্মা ও বৃথাজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায়, সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বর স্বরূপ আমার যে পরম তত্ত্ব তাহা অবগত না থাকায়, মানুষ-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।১১।১২

আলোচনা। ভগবান্ চতুর্থ অধ্যায়ের ৭ম ও ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন "যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে শরীর-ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই।" সত্যই ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং নিজ যোগমায়া-বলে মনুষ্যাদি-বিগ্রহ-ধারণ-পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া 'রাম' 'কৃষ্ণ' আদিকে সাধারণ-মনুষ্য-বোধে অনাদর করিয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় হিংসা-প্রবণ, যাহাদের মন কামদর্পাদি দ্বারা কলুষিত, তাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া, বৃথা আশা, বৃথা জ্ঞান, বৃথা কর্ম্মে আপনাদিগকে নিয়োজিত করে। তাহারা আশুলভ্য সুখ-প্রাপ্তির আশায় অন্যদেবতার আরাধনায় নিযুক্ত হয়। ভগবান্ সর্ব্বভূতের অধিপতি—এই পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া তাহারা ভগবানের মনুষ্য-মূর্ত্তির অবমাননা করে। ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছা-বশতঃ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময় ভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহ অবলম্বন করেন—এ তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না। ১১।১২

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পার্থ, দৈবীং (দেবানাং প্রকৃতিং শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদি-লক্ষণান্বিতাং) প্রকৃতিং (স্বভাবং) আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ (ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে [illegible] প্রবৃত্তাঃ, কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ) তু অনন্যমনসঃ (অনন্যচিত্তাঃ সন্তঃ) [illegible] জগৎকারণং) অব্যয়ং (নিত্যং) মাং (পর-ব্রহ্মরূপং) জ্ঞাত্বা ভজন্তি ।১৩

[illegible] হে পার্থ, দৈবপ্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মারা আমাকে জগৎকারণ, [illegible] আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যচিত্তে ভজনা করেন।১৩

আলোচনা। আমরা পূর্ব্বে কোন কোন শ্লোকের আলোচনায় দেখিয়াছি, পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস ও সংস্কারের আদর্শে ইহজন্মের প্রকৃতি গঠিত হয়। যাঁহারা জন্মজন্মান্তরের কৃত তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণ-যুক্ত হইয়া মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত হন এবং কামাদি-বিষয়ে অনভিভূত হইয়া, দৈবী সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই শাস্ত্রার্থে গুরুবাক্যে বিশ্বাসী হইয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন।১৩

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত।

অপ্রকাশিত পদাবলী।

(অনন্ত দাস)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

রাই কহে ভাই, কহি তব ঠাঁই
প্রথমে করিলি চুরি।
রূপেতে এখন, হয়েছে মদন
হরিলি পরের নারী॥
শুনিয়াছি আমি ভানুর নন্দিনী
বিন্ধিলি নয়ন-বাণে।
তোমার লাগিয়া দিশে হারাইয়া
পড়ি আছে ঘোর বনে।

এত শুনি হরি নয়নেতে বারি
গদগদ-স্বরে কয়।
শুন হলধারি, নিবেদন করি
আর কিবা লাজ-ভয় ॥
রাধিকার গুণ, জাগে নিশিদিন,
জীবনে ঔষধ রাই।
রাধিকা মরিল খেলা ফুরাইল
রহিব কাহার ঠাঁই ॥
ঘুচাও বন্ধন ত্যজিব জীবন
হেরিব রাধিকা-মুখ।
এ বলি মুর্চ্ছিত নাহিক সম্বিত
অনন্তদাসের দুঃখ ॥

(১১)

প্রাণবঁধু হে, হাম তোমার দাসী।
(তখন) আপনার বেশ ধরি, বঁধুয়ারে কোলে করি,
বিধু-মুখে সুধা-রসে ভাসি ॥
তোমারে পাইবার তরে বাঁধিলাম তোমার করে
ক্ষমা কর চরণ পরশি ॥ *

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কার্য্য-কুশল মায়াবীর নাম শুনিয়া, তাহার "যাদুবিদ্যা" দেখিতে প্রথমতঃ লোকের বাসনা হয়; পরে তাহার হস্তকৌশল দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, লোকে ক্রিয়ার দিকে আর দৃষ্টি না করিয়া, তাহারই প্রিয়পাত্র হইতে ইচ্ছা করে,

* উপরোক্ত পদগুলি বাঁকুড়াজেলান্তর্বর্ত্তী 'দাঁতনে'-নিবাসী অধুনা গোলোকবাসী ধনঞ্জয় গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। লেখক।

সেইরূপ ভগবন্মন্ত্রজপাদি দ্বারা সুনিপুণমনও ক্ষণভঙ্গুর অথচ সুসজ্জীকৃত জগদ্ভাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া, শাস্ত্রে অনুপমলীলাবর্ণনা শ্রবণ করিয়া ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া, ক্রমশই সেই পরমমায়াবীর সমীপে অগ্রসর হইতে থাকে, আর যতই আশ্চর্য্য পদার্থ দর্শন করিতে থাকে, ততই নিজেকে মায়াবীর নিকটস্থ বলিয়া মনে করিতে থাকে। তখন আর মায়ার কার্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হয় না, কেবল রুচি-লক্ষণা ভক্তি অবলম্বন করিয়া, ভক্তিসহকারে অগ্রসর হইয়া, আত্মনিবেদন করে। তখনই "প্রণিধান" করিবার সময় উপস্থিত হয়। তখন আত্মাভিমান, দেহাভিমান ও পুরুষকারে জলাঞ্জলি দিয়া, প্রেমরসে মাতোয়ারা হইয়া, ভক্ত-ভাবে অবস্থান করে। কর্ম্মের দ্বারা ভক্তি গঠিত হয় না; ভক্তি স্বভাব-সম্পত্তি। ব্যবহারদোষে উহা কুৎসিত হইয়া বিষের ন্যায় কার্য্য করে, আবার ব্যবহারগুণে অমৃততুল্য হইয়া কালকুট-বিষ হইতেও রক্ষা করে। ঈশ্বরে নিষ্কাম ভক্তি জন্মালে চতুর্ব্বর্গ-ফলেরই সম্যক্ সিদ্ধি হয়। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল মোক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে, কারণ, ভগবৎ-কৃপালাভ হইলে, উহা, সর্ব্বপ্রকার ভোগ সম্পাদন করিয়া নিবৃত্তি-মার্গের দ্বার উদ্ঘাটন করে, অধিকন্তু ইন্দ্রিয়াদিতে বিচারশক্তি প্রদান করে। বিচারবলে ভোগ্য-পদার্থে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ অনুভূত হয় এবং ভগ-বদ্ভক্তির উচ্ছ্বাসই সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়। অর্থে মন তত মগ্ন হয় না। তখন অন্য যে কিছু বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য মন লালায়িত থাকে, তাহাকেই 'কাম' কহে। কাম জীবমাত্রেরই আছে; কামপ্রাপ্তির জন্য আর শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন করে না। কামকে তৃতীয়স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং কামকে একটু প্রশস্তভাবে দেখিতে হইবে। ভোগ্য-বিষয় লাভ করিয়া অন্ধের ন্যায় ভোগ করাই কামের কার্য্য নহে। সাধারণতঃ বিষয়লাভে তাহার বাহ্যদৃশ্য-পরিদর্শনে তৃপ্ত না হইয়া বিষয়ান্তর-লাভেচ্ছা হইলে তাহা কাম। কাম সামান্য নহে, উহা অবিতৃপ্ত, সুতরাং উহাকে পণ্ডিতগণ ভয় করেন। যে কাম একটী বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার না করিয়াই বিষয়ান্তর গ্রহণ করে, তাহাকে "তামসিক কাম" কহে। বিষয়ের আপাতমনোরঞ্জন ভাব বিচার করিয়া অবিতৃপ্ততাবশতঃ যে বিষয়ান্তর গ্রহণ করে, তাহাকে "সাত্ত্বিক কাম" কহে। সাত্ত্বিক অত্যন্ত আদরণীয়, এ জন্যই পণ্ডিতগণ মোক্ষের অব্যবহিতপূর্ব্বে কামের স্থান-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, নষ্ট প্রিয় মণির অন্বেষণ করিতে হইলে, পথ ঘাট চিনিবার জন্য এবং প্রার্থিত মণি ও অন্যান্য দ্রব্য

দেখিবার ও চিনিবার জন্য সূর্য্যোদয়ের বিশেষ আবশ্যক, তদ্রূপ ভগবৎ-কৃপা-সূর্য্যের উদয় ব্যতীত ঘোর বিষয়-বনের পথ ঘাট চিনিয়া হৃদয়ের মণি-স্বরূপ ভগবচ্চরণারবিন্দ অন্বেষণ করার সুবিধা ঘটে না। অতএব তাঁহাকে খুঁজিয়া লইতে হইলে, নির্ভয়ে তীক্ষ্ণ অধ্যবসায়সম্পন্ন "সাত্ত্বিক কাম"রূপ কর্ণধারের হস্তে আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক। তাহা হইলে অনায়াসেই মোক্ষরূপ পরপারে গমন করিতে পারা যায়। আর তাহা হইতেই দুর্লভ মানবজীবন সফলতা লাভ করিতে পারে। নদীসকল সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজ ২ রূপাদি পরিত্যাগ করতঃ যেমন তাহাতে অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়, সেইরূপ জীবসমূহ সর্ব্বতত্ত্বাতীত চৈতন্য-তত্ত্বে চিত্ত সংযত করিয়া, দেহাদি-উপাধির বিসর্জ্জনে, অভেদে পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। অদ্বিতীয় জ্ঞান-সমুদ্রই পরমাত্মা। ভক্তগণ কাতর-কণ্ঠে সর্ব্ব-হৃদয়চারী সর্ব্বকর্ম্মস্রষ্টা, সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, সর্ব্ব-জীবমোক্ষদাতা পরমকারুণিক অদ্বিতীয় ভগবানের উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষট্‌শক্তি অনাদিকাল হইতে যাঁহাকে বীজরূপে আশ্রয় করিয়া আছে, যিনি ভক্তহৃদয়ানুরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া কখন দ্বিভুজ, কখন চতুর্ভুজ, কখন শিব, কখন শ্যামা, কখন কালী, কখন কৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যাঁহার আকারে নির্ভর দিয়াই এ জগৎ আকারিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বকারণকারণ অখণ্ডানন্দ-চৈতন্যই ভজনীয়। জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এই তিন জনেই সেই পরমতত্ত্ব লাভ করেন বটে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তির পথ সরল ও সুখ-সেব্য। পিতার নিকট পুত্রত্রয়ের ইতর-বিশেষ না থাকিলেও যেমন কৃতী ও অকৃতীর মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ঘটে, সেইরূপ জগৎপিতার জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত পুত্র সম্বন্ধে কৃপার কিছু ইতর-বিশেষ হয়। জ্ঞানিগণ স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি-বলে "তত্ত্বমস্যাদি" মহাবাক্য-বিচার-পূর্ব্বক 'ত্বং'-পদবাচ্য নিজস্বরূপকে মায়ো-পাধি-ভ্রমপ্রমাদাদি হইতে নিষ্কাসিত করিয়া, 'তৎ'পদলক্ষ্য অদ্বয় পরমব্রহ্মে স্থাপন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। যোগিগণ, অষ্টাঙ্গযোগসাধনা দ্বারা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে চিত্তসংযম অভ্যাস করিয়া, অবশেষে অন্তর্যামী পরমাত্মাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া, চরিতার্থতা লাভ করেন। ভক্তের সম্বল প্রেমলক্ষণ পদার্থ মাত্র। যেমন বালকের ক্ষুধার উদয়ে সে সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক হইতে নিবৃত্ত হয় ও মাতৃক্রোড় শান্তিনিকেতন এবং মাতৃস্তনসুধা ক্ষুধানিবারণের উপায় জানিয়া, রোদন মাত্র সম্বল করিয়া, মাতৃসন্নিধানে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা

করে, তদ্রূপ ভক্ত, গুরুমুখে ভক্তবৎসলের উদ্দেশ পাইয়া, নিজতৃপ্তি-সাধনের জন্য, বৈরাগ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া, কাতর-হৃদয়ে তাঁহাকেই মর্ম্মবেদনা জানাইতে থাকেন। জননী যেমন রোদননিবৃত্তিজন্য স্তন্যপান করান ও নানা প্রকার আব্দার সহ্য করেন, ভগবান্‌ও তদ্রূপ ভক্তের হৃদয়মন্দিরে উপনীত হইয়া, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বাহিরেও নিজলীলা—ঐশ্বর্য্যাদি অনুভব করান। এইজন্য, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এই তিনের মধ্যে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনার্থ গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমোমতঃ।

জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী উত্তম, যোগী অপেক্ষাও ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ, জ্ঞানী ও যোগীর চরম অবস্থায় ভক্তি না জন্মিলে পুনঃপতনের সম্ভাবনা, কিন্তু ভক্তের ভার ভগবান্‌ই বহন করেন। মধুহীন কুসুম যেমন মনোহর হইলেও আদরণীয় হয় না, সেইরূপ ভক্তিশূন্য জ্ঞান ও যোগ সম্যক্ আদরণীয় নহে। ভক্তি দ্বারাই জ্ঞান ও যোগের ফল পাওয়া যায়। জলের সাহায্যে কৃষক যেমন ক্ষেত্রে বিবিধদ্রব্য উৎপাদন-পূর্ব্বক নিজের ও জগতের উপকারসাধনে সমর্থ হয়, আবার জলের অভাবে তাহার সকল দ্রব্যই নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ এক ভক্তিবারি সিঞ্চনেই সাধন-লতায় চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে, আবার উহা ভিন্ন সকল সাধন-লতিকাই বিশুষ্ক হইয়া যায়। নিষ্কাম-ভক্তির উদয়ের জন্যই কর্ম্মের প্রয়োজন। ভক্তির উদয় হইলে, কর্ম্ম না করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেনঃ—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ননির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে

যতদিন পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় না হইবে, বা যতদিন আমার কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। ভগবানের শেষ কথা—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" অর্থাৎ যদি অশেষপাপে পাপী হও, উদ্ধারের কোন উপায় না দেখ, তবে কেবল আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত করিয়া নিজ সমীপে আনয়ন করিব। ইহাতে বুঝা গেল, ভক্তির নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নহে। অশ্রদ্ধাসহকারে হোম, দান, তপস্যাদি যে কিছু কর্ম্ম করা যায়, তাহা ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি উপকারপ্রদ হয় না। এ সব অলৌকিক রহস্য বুঝিতে

হইলে অলৌকিক জ্ঞানের প্রয়োজন, তজ্জন্য গুরু ও শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। মহাত্মগণ বলিয়াছেন যে, সেই সকল লোকই ভগবৎ-কথাশ্রবণের প্রকৃত অধিকারী, যাঁহারা বিশ্বাসের সহিত গুরুবাক্যে ও শাস্ত্র-বাক্যে নির্ভর করিতে সমর্থ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা হিন্দুর মহামহোৎসব, কলির অশ্বমেধযজ্ঞ। শ্রীদুর্গোৎসবের মত ব্যাপক উৎসব আর বুঝি কোনওটাই নয়। এ উৎসব পরমপ্রাচীন হইয়াও চিরনবীন। সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত এ উৎসবের অধিকার। শ্রীদুর্গাদেবীর পূজার প্রথমপ্রবর্ত্তক পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। পরে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, ত্রিপুরারি মহেশ্বর, সুরেশ্বর ইন্দ্র, এই দেবীর পূজা করেন। তখন সিদ্ধ, দেব ও ঋষিগণের মধ্যে ইহার প্রচার হয়; পরে মনুষ্যমণ্ডলে এই পূজার বিস্তার হয়। এ উৎসব সাম্প্রদায়িক নয়, হিন্দুর পক্ষে ইহা সার্ব্বজনিক। ইহা যেমন শাক্ত-ভক্তের প্রাণপ্রিয়, তেমনি বৈষ্ণবাদি-ভক্তেরও প্রীতিপ্রদ; সুতরাংই এ উৎসব অতুলনীয়।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে আমরা পাঠ করি—

প্রথমে পূজিতা সাচ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে।১
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুর-প্রেরিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা।২
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী।
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ দেবৈশ্চ মুনিপুঙ্গবৈঃ।
পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা।
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং সাবির্ভূতা পুরা মুনে
সর্ব্বে দেবাঃ দদুস্তস্যৈ শস্ত্রাণি ভূষণানি চ॥

দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতম্।
কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময়্যাঞ্চ সরিত্তটে।

উদ্ধৃতাংশের প্রথমশ্লোকে প্রকাশ,—সৃষ্টির আদিকালে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাসমণ্ডল গোলোকে ও শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীদুর্গা পূজিতা হইয়াছিলেন। গোলোক ও বৃন্দাবন দুই নিত্যধাম, দুইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতীর নিত্যলীলা-বিলাস। ঐ দুইস্থানেই রাসরসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদুর্গা-পূজা করেন। ষড়ৈশ্বর্য্য-শালী ভিন্ন অন্য কে মহাশক্তির অর্চ্চনার আবিষ্কারক হইতে পারেন? দ্বিতীয়-শ্লোকে প্রকাশ,—(১) মধু-কৈটভ অসুরদ্বয় যখন ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ব্রহ্মা আত্মরক্ষণ, শ্রীভগবানের প্রবোধন ও অসুর-দলনের জন্য শ্রীদুর্গার আরাধনা করিয়াছিলেন এবং (২) ত্রিপুরাসুর-ভয়ে মহেশ্বরও মহা-দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। মহাশক্তির অনুগ্রহ-লাভ ব্যতীত মহাসত্ত্বের স্ফুরণ হয় না, প্রতিকূল-শক্তির প্রভাব বিলুপ্ত হয় না, সৃষ্টির বিকাশ হয় না, সুতরাং স্রষ্টা ব্রহ্মা মহাশক্তির অর্চ্চনায় ব্রতী হন। এই দেবীর দ্বিতীয় পূজা। আর ত্রিপুরারি মহেশ্বর যে ত্রিপুরনাশের জন্য দেবীর (তৃতীয়) পূজা করেন, তাহার রহস্য এই,—ত্রিপুর বা সৃষ্টিস্রোত উচ্ছৃঙ্খল অসংযত-ভাবে চলিতে থাকায় সামঞ্জস্যের অভাব হওয়ায় সংহারমূর্ত্তি মহেশ্বরকেও সংহার-কার্য্যসাধনে মহাশক্তির কৃপাভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। সংহার ভিন্ন সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকে না; সংহারই সৃষ্টির নবীনতা ও মধুরতা সম্পাদন করে। অবিশ্রান্ত অনন্ত অতৃপ্ত সৃষ্টিস্রোত যেন অসীমমরণ অপেক্ষাও ভীষণ এবং নির্ম্মম! তাই মহাশক্তির কৃপায় অন্তহীন ত্রিপুর—ত্রিলোক বা ত্রিশক্তিবিকাশ বিশ্বমণ্ডলে কালের খেলা—ধ্বংসলীলার বিস্তার—কালচক্রের নিষ্পেষণে ত্রিপুরাসুরের বিনাশ। তৃতীয়-শ্লোকে প্রকাশ,—যোগবিভূতিসম্পন্ন অসহিষ্ণু ঋষি দুর্ব্বাসার শাপে ভ্রষ্টশ্রী সুরপতি ইন্দ্র, ভক্তিভরে ভগবতীর (চতুর্থ) পূজা করেন। শাপের ফলে ইন্দ্র শ্রীহীন হন, পূজার ফলে শ্রী—সম্পৎ লাভ করেন। ইন্দ্র দেবরাজ—দেবশক্তির অধীশ্বর, সুতরাং সাত্ত্বিকসম্পদের অধিকারী। গোমূত্রস্পর্শে দুগ্ধে বিকৃতি উপস্থিত হয়, অহমিকাস্পর্শে সাত্ত্বিকসম্পৎও বিকৃত হয়। সন্তান, দৈবী-সম্পৎ হারাইয়া মাতার শরণাপন্ন হইল, জননীর দয়া হইল। জননীর দর্শন পাইয়া ও কৃপা লাভ করিয়া, সন্তান, অভিমান হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিল—দৈবীসম্পৎ প্রকাশ

পাইল। তীব্রত্যাগ ও অতিভোগের সামঞ্জস্য হইল—মধ্যপন্থার উভয়ভাবের সমন্বয় হইল—চতুর্থ পূজার ইহাই রহস্য। চতুর্থ-শ্লোকে প্রকাশ;—তখন সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র, দেবগণ ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ সমস্ত বিশ্বে বিশ্বজননীর পূজা করিলেন। [illegible] ভোগের ও ত্যাগের সামঞ্জস্য হইল, সত্ত্বনাধিকারী সম্পৎ লাভ করিলেন—[illegible] সম্প্রদায়ের দেব, ঋষি, সিদ্ধ প্রভৃতিরা তদনুসরণে শ্রেয়োলাভের পথে অগ্রসর হইলেন। বিশ্ব জুড়িয়া মহাদেবীর মহাপূজার ধুম লাগিল। পঞ্চম-শ্লোকে বলা হইয়াছে,—এই মহাদেবী দুর্গা, সমস্ত দেবশক্তির সম্মেলনের ফলে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; দেবতারা তাঁহাকে নিজ অস্ত্রশস্ত্র ভূষণাদি প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডীতে এতত্ত্ব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাদেবীর স্বরূপের পরিচয়ে "সর্বশক্তিসমবায়রূপা" ভিন্ন অন্য কি বলা যাইতে পারে? দেবীমাহাত্ম্যে একটা শ্লোকে এই তত্ত্ব সংক্ষেপেও বলা হইয়াছে যথা—"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে। স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।" ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—মহাদেবী দুর্গা, দুর্গ প্রভৃতি অসুরদের বিনাশ করিয়াছিলেন এবং দেবগণকে স্বরাজ্য বা দেবসম্পৎ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাদেবী হৈমবতী উমা যে [illegible] বা অসুরগণের বহির্দৃষ্টিসম্পন্নগণের কবল হইতে দেবসম্পৎ বা [illegible] করিয়া, দেব বা সাত্ত্বিকবৃত্তিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ সাধকগণের [illegible] রাজকে এবং দেবগণকে চিরদিনই তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, [illegible] এ কথা অবগত আছেন। অধ্যাত্মপ্রস্থান, নৈরুক্তপ্রস্থান ও [illegible] যেটীকেই গ্রহণ করিনা কেন, দেখিব, দেবাসুরসংগ্রামে [illegible] দৈত্যদলন ও দেবতার কল্যাণ সাধিত হয়। সপ্তমশ্লোকে বলা [illegible] কল্পান্তরে মেধস-মুনির শিষ্য মহাত্মা সুরথ রাজা, নদীতীরে [illegible] এই দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। চণ্ডীর এ উপাখ্যান সাধারণের নিকট পরিচিত। নানাপুরাণে মহাদেবীর পূজার নানারূপ বর্ণনা আছে। [illegible] রাজার এবং রঘুরাজ রামচন্দ্রের 'শ্রীদুর্গা-পূজা'ই সাধারণের নিকট পরিচিত। শ্রীদুর্গার শারদীয়-পূজা এবং বাসন্তীপূজা উভয়ই শাস্ত্রে পাওয়া যায়। শারদীয়পূজার তুলনায় বাসন্তীপূজার প্রচার অতি অল্প। [illegible] এবং সুমধুর বসন্ত—উভয়ত্রই জগজ্জননীর পূজায় কলনাত হয়। এ পূজার মধ্যে সাধনজীবনের ক্রম বা স্তর-সমুদয় এত সুবিন্যস্তভাবে বিদ্যমান যে, ইহাকে শুধু 'শক্তিপূজা' না বলিয়া 'মহাপূজা' বলাই সঙ্গত হইয়াছে। জানিনা, কোন্ সন্তান মায়ের পূজা ভালবাসেন না; যাহাই হউক, এ পূজার আরম্ভে

যখন শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছি, তখন যদি ইহার শেষ হওয়া কখনও সম্ভব হয়, তাহা হইলে শেষেও সেই শ্রীভগবান্‌কেই পাওয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রী———ভারতী।

হিন্দুজ্যোতিষ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

রবিমার্গ।

গুরু। যে ছায়াপথ যজ্ঞসূত্ররূপে বিশ্ব বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে এবং যাহা দ্বিজগণের যজ্ঞসূত্রের মূল আদর্শ, আদি হিন্দুজ্যোতির্ব্বিৎ সেই দেবপথকে "রবিমার্গ" মনে করিতেন।

শিষ্য। সে ত ঠিক্ নহে।

গুরু। আমরা (১। ২৪। ৮) ঋকে পড়ি;—

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থা মন্বেত বাউ ॥

তৎকালে উভয় ক্রান্তিপাত এই দেবপথে অবস্থিত ছিল এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এই দেবপথে হইত, সুতরাং আদি জ্যোতির্ব্বিৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা বলা যায় না।

শিষ্য। কোন্ হিন্দুজ্যোতির্ব্বিৎ প্রথমে 'রবিমার্গ' রাশিচক্রে স্থাপন করেন ?

গুরু। আমরা (১। ৮৩। ৫) ঋকে পড়ি;—ঋষি অথর্ব্বা প্রথম পথ রাশিচক্রে স্থাপন করিলে, ব্রতপালক কান্তসূর্য্যের জন্ম হইল যথা,—

যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্ততে ততঃসূর্য্যো ব্রতপা বেন আজনি।

বুঝিতে হইবে যে, নূতনবর্ষগণনার আরম্ভ হইল। কারণ, আমরা জানি যে, বেদমতে সূর্য্য বৎসরের প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৎসরের অবসানে সূর্য্যেরও অবসান হয়।

শিষ্য। আমরা (১। ১৬৩। ৫) ঋকে পড়ি :—সূর্য্যদেব, বৎসবস্কয় অর্থাৎ একহায়ন বৎস।

গুরু। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিক লেখকগণ বলিতে পারেন যে, কোন্ যুগে কোন্ ব্যক্তি রাশিচক্রে "রবিমার্গ" স্থাপন করিয়াছিলেন ?

শিষ্য। আজ্ঞা, এ দফা মাপ করিতে হইবে।

সৌম্য ধ্রুবচক্র।

গুরু। সুমেরুবাসীর ঠিক মাথার উপর ধ্রুবতারা থাকে। অয়নাংশ-গতির ফলে যখন সেই ধ্রুবতারা মহামেরুসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হয় এবং ক্রমে নিম্নে নামিয়া পড়ে, তখন অন্য একটী তারা মহামেরুসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ২৭০০০ বর্ষে ন্যূনাধিক ১৪টী তারা একে একে মহামেরু-সিংহাসনে আরোহণ করে এবং তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। এই ধ্রুবতারাগুলি একটী রেখায় সংযোজিত করিলে একছড়া তারাহার হয়। এই ধ্রুবতারাহারকে "সৌম্যধ্রুবচক্র" বলে। এই ধ্রুবতারাহার, গোলাকার স্বর্গধাম উত্তানপাদ বা পরমপদ বেষ্টন করিয়া থাকে। এই উত্তানপাদের কেন্দ্রকে "কদম্ব" বলে। এই "কদম্ব" হিন্দুশাস্ত্রের "ব্রহ্মরন্ধ্র" এবং এই উত্তানপাদ হইতে আমাদের "ব্রহ্মতালু"র নাম। পুরাণে এই ধ্রুব-তারাগণের কোন উল্লেখ পাও ?

শিষ্য। পুরাণে ধ্রুবতারাগণ সকলেই 'মনু'নামে খ্যাত। পুরাণমতে এক এক মনু মহামেরু-সিংহাসন-চ্যুত হইলে এক এক 'মন্বন্তর' হয়। এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক 'কল্প' হয়।

গুরু। দক্ষিণাকাশের ধ্রুব-চক্রের কোন উল্লেখ কোথাও পাও ?

শিষ্য। বাল্মীকির মতে উত্তরাকাশের বা দেবভাগের অনুকল্পে মহর্ষি বিশ্বামিত্র দক্ষিণাকাশে অর্থাৎ অসুরভাগে যাম্যধ্রুবচক্র এবং অপরনক্ষত্রগণ সৃষ্টি করেন।

নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ।
যাবৎ লোকাধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্যেতানি সর্ব্বশঃ॥

আদিকাণ্ডম্।

গুরু। এই ধ্রুব-চক্রদ্বয়ের জ্ঞান, ইয়ুরোপে কোন্ সময়ে প্রচারিত হইয়াছে বল ?

শিষ্য। ৪০০ বর্ষ হইবে, নিকলাস্ কোপার্নিকস্ এই জ্যোতিস্তত্ত্ব ইয়ুরোপে প্রচার করেন।

গুরু। সুস্পষ্টভাবে যে সকল ধ্রুবতারার প্রসঙ্গ ঋগ্বেদে পাও, তাহাদের প্রথম কোন্টী ?

শিষ্য। প্রথমটীর নাম "বশিষ্ঠ" তারা। এই তারার অপর নাম 'অভিজিৎ' বা 'বজ্র'। তারাটী ইন্দ্রনীলবর্ণ, তাই ইহার নাম 'নীলমণি'।

গুরু। বসিষ্ঠ বা বসিষ্ঠের হস্তস্থিত ব্রহ্মাস্ত্র বা বজ্র কোন্ সময়ে ধ্রুবতারা ছিল?

শিষ্য। প্রায় ১৭০০০ বর্ষ পূর্ব্বে উত্তর-আকাশে এই বসিষ্ঠতারা এবং দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্যতারা ধ্রুবসিংহাসনে ছিল। আমরা (৭।৩৩।১৩) ঋকে পড়ি;—

সোমধারা মিত্র বরুণ করিয়া যে ত্রিকুম্ভ গঠন করে, সেই কুম্ভে, মিত্র ও বরুণের ঔরসে কুম্ভের মুখ হইতে অগস্ত্য এবং মধ্য হইতে বসিষ্ঠ ঋষির জন্ম হয় যথা;—

সত্রেহ জাতা বিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্।
ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাতমৃষিমাহুর্বসিষ্ঠম্॥

গুরু। অগস্ত্য, 'মান', 'মান্য' ও 'মান্দার্য্য' নাম কিসে পাইলেন?

শিষ্য। অগস্ত্যের মানদণ্ড বা মন্দমেরু ও অর্থাৎ ধ্রুবযষ্টির অগ্রে মহামেরু-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য 'মান' বা 'মান্য' উপাধি ধারণ করেন এবং এই ধ্রুবযষ্টির পৌরাণিক নাম 'মন্দরগিরি' হইতে মহর্ষি অগস্ত্য 'মান্দার্য্য' নাম প্রাপ্ত হন।

আমরা (১।১৬৫।১৪) ঋকে পড়ি;—

এষ বঃ স্তোমো মরুতঃ ইয়ং গীর্মান্দার্য্যস্য মান্যস্য কারোঃ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্;

কামরূপ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আমি নাগা-সম্প্রদায়ের বিবরণ জানিতে চাহিলে সাধু বলিলেন,—"বাবা! যত সন্ন্যাসীই বল, নাগার মত কেহই নহে; সকলেরই গুরু নাগা। নাগাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইঁহারা সাক্ষাৎ শঙ্কর। পূর্ব্বকালে গৌরাঙ্গ-নামক জনৈক ধর্ম্ম-প্রচারক নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্ত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশটাকে ম্লেচ্ছ করিয়া ফেলেন। তখন দেবতাগণের প্রার্থনায় দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্করাচার্য্য-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নাগাধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত শাক্তধর্ম্ম

দেশ হইতে একেবারে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।" আমি বলিলাম—"গৌরাঙ্গদেব ত শাক্তধর্ম্মের প্রচারক নন; তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীগৌরাঙ্গের পদরেণু পূত হইয়া শ্রেষ্ঠতারাপন্ন দেশ পবিত্র হয়। আপনি এরূপ অসত্য কথা কাহার কাছে শুনিলেন?" সাধু বলিলেন, "তা হবে বাবা! হবে! ঐ রকম একটা কি হবে; আমার ঠিক মনে নাই।" এইরূপ বহু কথোপকথনের পর রাত্রি প্রায় একটার সময় সাধু নূতন দগুনা, চাউল, ডাউল, আলু, পবান্ন? মসলা প্রভৃতি দিলেন। আমি খিচুড়ী পাক করিলাম। পাক করিয়া সাধু কর্ত্তৃক আনীত "কলার পোলা"য় ঢালিয়া আমরা আহার করিলাম। সাধু স্বয়ং একটী অতিস্থূল বংশপর্ব্ব হইতে (এটাতে দশনের জল থাকে) জল দিলেন, আচমন করিলাম। এইরূপে সাধু তাঁহার অতিথির সৎকার করিয়া পরে নিজে আহার করিতে বসিলেন। আমি ধুনীর নিকট বসিয়া পাণ-বিড়ির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম। সাধুর আহার হইলে পর ডাকবাঙ্গালায় শয়ন করিতে গেলাম। ডাকবাঙ্গালার চাল টীনের, অন্য সব ইষ্টকের। একটি ঘরের মাঝখানে ভিত্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি ঘর করা হইয়াছে। দুই ঘরে দুইখানা তক্তপোষ ও চারিখানা চেয়ার আছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন আসবাব্ নাই। সাধু রাত্রিতে ধুনীর কাছেই পড়িয়া থাকিলেন। আমি ও স্বামীজি সেই ঘরে গেলাম। দুই ঘরের তক্তপোষ একঘরে আনিয়া আমরা উভয়েই একঘরে থাকিলাম। আমার সঙ্গে বিছানাপত্র কিছুই নাই; গায়ে একটী জামা ও বালাপোষ মাত্র। স্বামীজি আমার এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—"যদিও সন্ন্যাসীর বিছানা গৃহীকে দিতে নাই, তবু আপনি শীতে কষ্ট পাইবেন, আর আমি সুখে বিছানায় শয়ন করিব, ইহাও কর্ত্তব্য হয় না, সুতরাং আমার নিকট অতিরিক্ত একটি কম্বল আছে, ইহাই আপনি গ্রহণ করুন। অদ্য আপনি আমার নারায়ণ, আমি আপনাকে সেবা করিব।" আমি বলিলাম—"আপনি সন্ন্যাসী, আমি গৃহী; আপনারাই আমাদের সেব্য। ওরূপ কথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করিবেন না। সেবকজ্ঞানে স্নেহ করিয়া যদি কম্বলটি আমাকে দেন, তাহা হইলে লইতে সাহস হয়।" এরূপ নানাবিধ বিনয়ালাপের পরে স্বামীজির কম্বল গ্রহণ করিয়া তক্তপোষের উপর পাতিলাম এবং জামা ও বালাপোষ গায়ে দিয়া শয়ন করিলাম, তাহাতে শীতের কষ্ট থাকিল না। সমস্তদিন পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত ছিলাম, শয়ন মাত্রেই গাঢ়নিদ্রা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই বজ্রগম্ভীর বৃংহিতধ্বনিতে

সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই পাহাড়ে প্রচুর হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু আছে। পূর্ব্বে সিংহও ছিল, বর্ত্তমানে সিংহ আর বড় একটা দেখা যায় না। সাধুর মুখে শুনিলাম, আশ্রমের উপরে অন্য কোনও জন্তু যায় না, তবে সময় সময় দুটি একটি ব্যাঘ্রের গতিবিধি হয়, কিন্তু আশ্রমের পর হইতে কাহাকেও কোনদিন হিংসা করিয়াছে এরূপ শুনা যায় না। বশিষ্ঠ-দেবের তপঃপ্রভাবে আজও যেন স্থানটি "প্রশান্ত-শ্বাপদাকীর্ণ" বলিয়া মনে হয়।

আমি যখন জাগ্রত হইলাম, তখন বন্যহস্তীগণ পর্ব্বত হইতে উঠানামা করিতেছে বা পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। দরজা খোলা দূরে থাকুক, জানালা খুলিতেও সাহস হইল না। মনে হইতে লাগিল, যেন পর্ব্বতের উপর তুমুল ঝটিকারম্ভ হইয়াছে। সেই আরণ্য-বারণগণের চরণদলনে, করাকর্ষণে, কখনও বা দশনঘর্ষণে বিদীর্য্যমান পতনশীল বৃক্ষগণের মড় মড় ধ্বনি—সেই সঙ্গে সঙ্গে রণবিজয়ী সৈন্যগণের জয়-ধ্বনির ন্যায় বর্ব্বজয়ী হস্তীগণের বৃংহিতধ্বনি ও মধ্যে মধ্যে মহাকায় ব্যাঘ্রগণের লোকবিদ্রাবী ভীষণ গর্জ্জন। মনে হইল, যেন যুগপৎ সহস্র সহস্র কুলিশধ্বনিসমন্বিত প্রলয়-প্রভঞ্জন প্রবাহিত। ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলাম। সাধু কিন্তু বাহিরে ধুনীর কাছেই আছেন, মাঝে মাঝে বলিতেছেন "ভয় নাই বাবা! উহারা কেহ বশিষ্ঠ মহারাজের আশ্রমের উপর আসিবে না।" সাধুর অন্যগুণ থাকুক বা না থাকুক, ধন্য তাঁহার সাহস! ধন্য তাহার নির্ভরশীলতা! তিনি যতই সাহস দিন, আর আমাদের গৃহ যতই সুদৃঢ় হউক্ না কেন, কতক ভয়ে, কতক কৌতুহলে, কতক ভাবনায়, সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না। স্বামী জাগিয়া ছিলেন, তিনিও "মাভৈঃ" বলিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় নিদ্রা গেলেন। আমি কিন্তু অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। পর দিন রৌদ্র উঠিলে দরজা খুলিয়া শৌচ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ-দেবের আসন দর্শন করিতে গেলাম।

যেখান দিয়া বরুণঃ তিনটি প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, ঠিক্ তাহার মধ্যখানে তিনখানা বড় পাথর আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার পর বসিয়া বশিষ্ঠদেব ত্রিসন্ধ্যা করিতেন। ঠিক্ তাহার উত্তরতীরে আট দশ হাত দূরে আর একখানা বৃহদায়তন পাথর আছে, ইহারই পরে বসিয়া বশিষ্ঠদেব তপস্যা করিতেন। এই পাথরের উপর একটি পাকা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দির ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছিল, সম্প্রতি পুনঃ সংস্কার হইয়াছে। এই মন্দিরের

সংলগ্ন উত্তর-দক্ষিণ-লম্বা নাট-মন্দিরের অনুরূপ একখানা বৃহৎ টীনের ঘর আছে, ইহাতে বেড়া নাই। সাধারণ যাত্রীগণ এখানে থাকিতে পারে। এই ঘরের উত্তর দিয়া বরাবর উত্তর ও পশ্চিম এই উভয় দিকে অনতি উচ্চ পাকা প্রাচীর। পশ্চিমের প্রাচীরের পশ্চিমপার্শ্বে ডাকবাঙ্গালা, তৎপশ্চিমে উচ্চ পাহাড়। মন্দিরের দক্ষিণে ঝরণা, তাহার দক্ষিণ তীরে উত্তুঙ্গ গিরিমালা। মন্দিরসংলগ্ন গৃহের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানা খড়ের ঘর, তাহাতে পাণ্ডারা থাকেন। ইহার ঈশান-কোণে আশ্রম-প্রবেশের দ্বার। উত্তরের প্রাচীরের উপর দিয়া ভিতর দিকে একখানা চালা দেওয়া আছে, সেইখানেই প্রোক্ত সাধু থাকেন; সে চালাও ঘেরা নহে, খোলা। বায়ুকোণে উত্তরাংশে প্রাচীরের বাহিরে একখানা খড়ের ঘর। তাহাতে ডাকবাঙ্গালার চৌকিদার থাকে। মন্দির-সংলগ্নগৃহের দক্ষিণ অংশে একটি শালগ্রামশিলা ও ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি সম্প্রতি যাত্রীগণের নিকট হইতে প্রণামী-আদায়ের উদ্দেশ্যে পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দনা পূর্ব্বক বশিষ্ঠাসন-দর্শন, স্পর্শন, ও প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলাম ও সাধু বাবাজির আতিথ্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া স্বামী যোগানন্দের সহিত একত্রে পুনরায় গৌহাটী আসিলাম। প্রথম দিন শীত-ভয়ে ব্রহ্মপুত্র-স্নান হয় নাই; অদ্য শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়া ব্রহ্মপুত্র-স্নানের বাসনা হইল; তাই গৌহাটীতেই সে দিন মাধ্যাহ্নিক-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া ১৷৹টার ট্রেণে কামাখ্যায় পৌঁছিলাম। সে দিবস কামাখ্যায় থাকিয়া তৎপর দিবস বেলা ২৷৷৹টায় ট্রেণে দেশের দিকে রওনা হইলাম।

কামাখ্যা-তীর্থের উৎসব সকলের মধ্যে অম্বুবাচী দেবধ্বনি, দুর্গোৎসব, পুংসবন, ও বাসন্তিকই প্রধান, তন্মধ্যেও আবার অম্বুবাচী ও দুর্গোৎসবই সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু ইহার কোনটিই আমি দেখি নাই, সুতরাং উহাদের কোন বিবরণই দিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বে এই তীর্থ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, কিন্তু এখন রেল-লাইন্-বিস্তারের ফলে আর কোনই কষ্ট নাই। কলিকাতা বা যশোহর হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছান যায়। কলিকাতা হইতে কামাখ্যা পর্য্যন্ত থার্ড ক্ল্যাসের ভাড়া ৬৷৴৹ ও যশোহর হইতে ৭৵১০ মাত্র। (সম্প্রতি বৃদ্ধি হইয়াছে।) শান্তাহারে একবার মাত্র গাড়ী বদলাইতে হয়, আর কোথাও গাড়ী বদল নাই, তবে আমীনগাও ষ্টেশনে গিয়া রেল হইতে নামিয়া ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পুনরায় পরপারে পাণ্ডুষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিতে হয়। তৎপরবর্ত্তী ষ্টেশনই কামাখ্যা ও তৎপরবর্ত্তী ষ্টেশন গৌহাটী,—এইখানেই ই, বি, রেল শেষ হইল। কামাখ্যার পাণ্ডাগণ অতি ভদ্র ও নির্লোভ। তাঁহারা যাত্রীদিগকে যত্ন করিয়া আহার ও বাসস্থান দেন, তজ্জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। দক্ষিণা প্রণামী ইত্যাদি বলিয়া সাধ্যানুসারে যিনি যাহা দেন, তাহাতেই তাঁহারা তুষ্ট হন।

সাধারণ তীর্থ-কৃত্য অর্থাৎ তীর্থ-প্রাপ্তি-নিমিত্তক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, মুণ্ডন, উপবাস, তীর্থ-দেবতার পূজা, ইহা ছাড়া কুমারী ও সধবা-পূজা করিতে হয়। এই সমুদায়

কার্য্য সংক্ষেপে অনুকল্প করিয়া দুইটাকা ব্যয়েও হইতে পারে, বিস্তার করিয়া দুই হাজার টাকাও ব্যয়ে করিতে পারেন, তাহাতে পাণ্ডাদের কোনও আপত্তি নাই। এ তীর্থের একটু বিশেষত্ব দেখিলাম, এখানে কাঙ্গালী নাই। যোগ-যাত্রার সময় কি হয় বলিতে পারি না।

একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি। এদেশে একরূপ চাউল পাওয়া যায়, তাহার নাম "বোকা চাউল"। চাউলগুলি এতই বোকা যে, তাহাদের অঙ্গে একটু শীতল জল দিলেই অমনি একেবারে গলিয়া যায়।* কিন্তু উহার জ্ঞাতিদের গলাইতে হইলে কত কাট খড় লাগে! আ'জ কা'লকার বাজারে অত সহজে গলা 'বোকামি' নয় কি? তাই বোধ হয় উহাদের নাম 'বোকা'। আবাদ করিলে ঐ ধান আমাদের দেশে হয় কি না, পরীক্ষার্থে কিছু বীজধান সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আমার বিশ্বাস, ধান হইবে, তবে বাংলার জল-বায়ুর গুণে বোকা থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না। কারণ, অনেক বোকা এদেশে আসিয়া চতুর হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহা আমারা প্রত্যহ দেখিতেছি। সমাপ্ত।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভূস্বামিসম্মেলন। আগামী শীতকালে বঙ্গীয়-ভূস্বামিবর্গের যে সম্মেলনসভা বসিবে, তাহার উদ্‌যোগ-আয়োজনের ব্যবস্থা করিবার জন্য মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি "বৃটিশইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন"-গৃহে এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-ভূস্বামিবর্গের সম্মেলন প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই।

শোকপ্রকাশ-সভা। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কাশীস্থ মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-প্রয়াণ উপলক্ষে সে দিন কলিকাতার সংস্কৃতকলেজে মাননীয় বিচারপতি স্যার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে—স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবরের স্বজনগণের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরিত হইবে, এবং কলিকাতাসংস্কৃত-কলেজগৃহে পণ্ডিতপ্রবরের এক তৈলচিত্র স্থাপিত হইবে। পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সংস্কৃতকলেজের কর্তৃপক্ষের ও স্যার্ আশুতোষের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বন্যাবিপ্লব। সংবাদপত্রে প্রকাশ—চীনের টিয়েন্‌শিনের বহুস্থান বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। বাণিজ্য-সম্ভার-রক্ষার্থে দ্রব্যাগারগুলির চতুষ্পার্শ্বে উন্নত প্রাচীর রচিত হইয়াছে। ভগবদিচ্ছা কি!

* এ দেশে "বোকা চা'ল" বলিয়া যে একরূপ চা'ল পাওয়া যায়, উহা জলে ভিজাইয়া রাখিলেই উত্তম ভাত হয়। লেখক।

Reg. No. C.

২৪ বর্ষ। অগ্রহায়ণ। ৮ম

হিন্দু-পত্রিকা

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
সহকারি-সম্পাদক
স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর
হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইং—৩০শে নভেম্বর ১৯১৭।
বাং—১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২৪।
শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

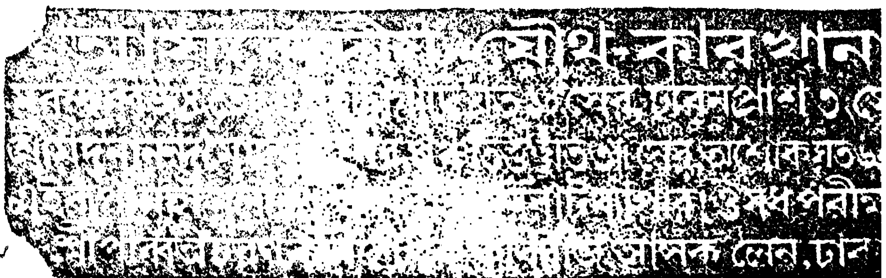
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সর্ব্বত্র ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। অথর্ব্বদের কথা।	৩৩৭	৫। গীতার মর্ম্ম।	৩৬৮
২। গৌড়োপাসনার সার্ব্বজনীনত্ব।	৩৪৪	৬। শিক্ষাষ্টকম্।	৩৭৪
৩। মন।	৩৫৪	৭। কবিতা ও উচ্ছ্বাস।	৩৮০
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।	৩৬৩	৮। সংবাদ ও মন্তব্য।	৩৮৪

বর্ত্তমান-সংখ্যার লেখকগণের নাম—

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ জ্যোতির্ব্বিনোদ, শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, আয়ুর্ব্বেদাচা- শ্রীউমানাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীদুর্গাচরণ দাশ গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি।



শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৪ বর্ষ, ২৪শ খণ্ড ৮ম সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ।	১৩২৪ সাল। ১৮৩৯ শকাব্দ।

অথর্ববেদের কথা।

কেহ ২ বেদের 'ত্রয়ী' নাম শুনিয়া অজ্ঞতাবশতঃ ঋক, যজুঃ, সাম—এই তিনখানিকেই 'বেদ' বলিয়া মানেন; 'অথর্ববেদ'কে 'বেদ' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত একান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল।

'ত্রয়ী' শব্দের যথার্থ অর্থ-নির্ণয়ে অমরসিংহ বলেন—

স্ত্রিয়ামৃক্ সামযজুষি ইতি বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।

'ত্রয়োঽবয়বা অস্যাঃ ইতি ত্রয়ী'—ইতি অমরকোষ-টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী।

"ত্রয়ী বৈ বিদ্যা ঋচো যজুংষি সামানি" ইতি শতপথ-ব্রাহ্মণ। গদ্য পদ্য গান এই ত্রিবিধ রচনানুসারে বেদের 'ত্রয়ী' নাম হইয়াছে।

"তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদ-ব্যবস্থা (১)
গীতিষু সামাখ্যা (২) শেষে যজুঃশব্দঃ (৩)
ইতি মীমাংসাদর্শনে জৈমিনিঃ।

যে সমস্ত বেদমন্ত্রে অর্থানুসারে পাদব্যবস্থা আছে, তাহাদের ঋক্-সংজ্ঞা। যে সমস্ত মন্ত্র গীতিময়, তাহাদের সাম-সংজ্ঞা। যে সমস্ত মন্ত্রে অর্থানুসারে পাদব্যবস্থা নাই এবং যে গুলি গীতও হয় না, তাহাদের যজুঃ-সংজ্ঞা। এখন বুঝা

যাইতেছে যে, পদ্যাত্মক বেদই ঋগ্বেদ, সঙ্গীতাত্মক বেদই সামবেদ ও গদ্যাত্মক বেদই যজুর্ব্বেদ। এইজন্য মাধবাচার্য্য "অহোবুধ্নীয় মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়-স্ত্রৈবিদা বিদুঃ, ঋচঃ সামানি যজুংষীতি" তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ-ব্যাখ্যানে "ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তি ইতি ত্রিবিদঃ। ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনো অধ্যেতার ত্রৈবিদাঃ। তেচ যং মন্ত্র-ভাগং ঋগাদি-রূপেণ ত্রিবিধং বিদুঃ তং গোপায়" এই উক্তি দ্বারা মন্ত্রভাগকে পদ্য গদ্য ও গীত রূপে ত্রিবিধ বলিয়াছেন। অতএব "সর্ব্বানুক্রম-নিরুক্তি"-ভূমিকায় "ঋক্ পাদবদ্ধোগীতন্তু সাম গদ্যং যজুঃ স্মৃতং। চতুর্ষ্বপিহি বেদেষু ত্রিধৈব বিনি-যুজ্যতে"—এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদেও পদ্য-গদ্য-গানাত্মক রচনা আছে। সুতরাং ত্রয়ী শব্দে বেদ বুঝায়, তিন বেদ মাত্র বুঝাইতে পারে না। অতএব "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজু-স্তস্মাদজায়ত"—এই ঋগ্বেদসংহিতার মন্ত্রে ঋক্ সাম যজুঃ শব্দে পদ্য-গান-গদ্যাত্মক সর্ব্ববেদের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। যে বেদে পদ্য-সংখ্যা অধিক তাহাকে ঋগ্বেদ, এবং যে বেদে গদ্য-সংখ্যা অধিক তাহাকে যজুর্ব্বেদ, ও যে বেদে গান অধিক সে বেদকে সামবেদ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদে পদ্য গদ্য, গান এই তিনের বাহুল্য থাকায় অন্য কোন নামের আবশ্যকতা না বুঝিয়া, যিনি প্রথম এই অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—সেই ব্রহ্মার পুত্র অথর্ব্বঋষির নামেই চতুর্থবেদের নাম-করণ করা হইয়াছে চতুর্থ বেদ না থাকিলে ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণে"সহোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং সামবেদ-মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতি" (৯, ১, ২,) বাক্যে নারদের অথর্ব্ববেদ-অধ্যয়ন-প্রার্থনা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। "একতশ্চত্বারো বেদাঃ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতং" ইত্যাদি এবং "অধীত্যচতুরো বেদান্ সাঙ্গোপাঙ্গপদক্রমান্" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে চতুর্ব্বেদের উল্লেখ সঙ্গত হওয়াও দরকার। বেদ চারিটী না হইলে "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা-ন্যায়বিস্তরঃ। ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ" এই বিষ্ণু-পুরাণের বচনে "বেদাশ্চত্বারঃ" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিত না।

"ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুমর্হতি" ইতি নিরুক্তে যাস্কঃ (১, ৩, ৩,) "অথর্ব্ববেদী এব ব্রহ্মা ভবতি স এবচ যজ্ঞং সমন্তাৎ রক্ষতি। তথাহি ব্রহ্মৈব বিদ্বান্ যদ্ ভৃগ্বঙ্গিরোঽপ্রমত্তো যজ্ঞং রক্ষতি" ইত্যাদি প্রাচীন-বাক্য অথর্ব্ববেদের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ।

ব্রহ্মাকে সকল বেদ শিক্ষা করিতে হইবে; অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণই ব্রহ্মা হন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞ রক্ষা করেন।

সামবেদভাষ্যাবতরণিকায় সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ত্রয়াণামপরাধস্তু ব্রহ্মা পরিহরেৎ সদা।" হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্‌গাতার অপরাধ ব্রহ্মা নষ্ট করিয়া থাকেন। গোপথ-পূর্ব্বার্দ্ধে আছে, "তস্মাদৃগ্বিদমেব হোতারং বৃণীষ্ব যজুর্ব্বিদমধ্বর্য্যুং সামবিদমুদ্‌গাতারং অথর্ব্বাঙ্গিরোবিদং ব্রহ্মাণমিতি"

সেজন্ত ঋগ্‌বেদীকে হোতৃকর্ম্মে, যজুর্ব্বেদীকে অধ্বর্য্যুকর্ম্মে, সামবেদীকে উদ্‌গাতৃ-কর্ম্মে ও অথর্ব্ববিৎকে ব্রহ্ম-কর্ম্মে বরণ কর—এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদৈকদেশ-দর্শী বিদেশীয় কোন ২ পণ্ডিত মনে করেন, প্রাচীন গ্রন্থে ত্রিবেদের উল্লেখ থাকায় অথর্ব্ববেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্ব্বে অথর্ব্ব-বেদের অস্তিত্ব ছিল না। ইহা কতদূর সত্য, তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম—

তাঁহারা বলেন, ছান্দোগ্যে "অগ্নেঋ্চাবায়োর্যজুংষি সামান্যাদিত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ" (৬ ১৭) এই মন্ত্রে এবং মনুসংহিতায় "অগ্নিবায়ু-রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং। দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং" (১, ২৩,) এই শ্লোকে তিনবেদের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য-ও মনুসংহিতা অপেক্ষা আধুনিক গ্রন্থে বেদচতুষ্টয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বৃহদারণ্যকে "অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বা-ঙ্গিরসঃ" (৪, ১০) এবং মহাভারতে "একতশ্চতুরোবেদান্ ভারতঞ্চ তদেকতঃ। পুরাকিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতং॥ চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো হ্যধিকং ভারতং যদা। তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।" (আদিপর্ব্ব ২৬৮, ২৬৯ শ্লোক।) এইরূপ বহু আধুনিক গ্রন্থে চারিবেদের উল্লেখ থাকায় প্রাচীনতম গ্রন্থে উল্লেখ না থাকায় ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদই প্রাচীনতম, অথর্ব্ব-বেদ তদপেক্ষায় আধুনিক, অতএব ত্রয়ীশব্দে তিনবেদই মুখ্যরূপে বুঝায়, ত্রয়ী শব্দে মুখ্যবৃত্তি দ্বারা অথর্ব্ববেদ বুঝায় না।

প্রত্যুত্তরে আমাদের কথা।

আমরা "ত্রয়ী" শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে ত্রয়ীশব্দে শক্তি দ্বারা পদ্য গদ্য গান ত্রিবিধরচনাত্মক সমস্ত বেদই বুঝায়, ইহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই। অতএব ত্রয়ীশব্দ আছে বলিয়া অথর্ব্ববেদকে অন্য বেদ অপেক্ষা আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

প্রাচীনতম ছন্দোগ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে কেবল ত্রিবেদের উল্লেখ থাকায় অথর্ব্ব-বেদকে আধুনিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা একদেশ-দর্শিতা। যেহেতু ছান্দোগ্যেও "ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণঞ্চ চতুর্থং।" (৭, ৭,) এবং

মনু-সংহিতায় "অভিচারেষু কৃত্যাসু" ইত্যাদি এবং শতপথ ব্রাহ্মণেও "ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত" (১১, ৫, ৮,) ভারতেও "অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীবিদ্যা" (আদিপর্ব্ব ১০০শ্লোঃ। দেখাযায়। অতএব সকল বেদেই যখন সকল বেদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন গ্রন্থের প্রাচীনত্ব-নবীনত্ব-ভেদে বেদের ত্রিত্ব-চতুষ্টয়স্বরূপ দ্বৈবিধ্য স্বীকার করা যায় না।

পাণিনিব্যাকরণে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই বলিয়া অথর্ব্ববেদ আধুনিক, ইহা অনেকে বলেন, তাহাও যুক্তি-সঙ্গত নহে। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শতংজীব শরদো বর্দ্ধমানঃ" এই মন্ত্র (১৫, ৪, ৭,) যাস্ক কর্ত্তৃক অথর্ব্ববেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। (অথর্ব্ব-সংহিতা— (২০, ৮, ৬, ৯, ।) একপাদং নোৎখিদতি ইতি যাস্কঃ (১২, ৩, ১০) ইহাও অথর্ব্ববেদ সংহিতা হইতে নিরুক্তে উদ্ধৃত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ-সংহিতার একাদশকাণ্ডীয় দ্বিতীয় অনুবাকে "একং পাদং নোৎখিদতি, সলিলাদ্ধ সমুচ্চরৎ" এইরূপ আছে। অথর্ব্ববেদকে যাঁহারা আধুনিক বলিতে চাহেন, তাঁহারাও যাস্ককে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত যাস্কেরই নিরুক্তে যখন অথর্ব্ব-সংহিতার মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন পাণিনি অথর্ব্ব-বেদের নামোল্লেখ না করিলেও বোধহয় অথর্ব্ববেদ আধুনিক হইবেনা। তথাপি যাঁহারা দুরাগ্রহের বশবর্ত্তী, তাঁহাদের সন্তোষের জন্য বলিতেছি যে, "শৌনকা-দিভ্যশ্ছন্দসি" (৪, ১৮,) এই পাণিনিসূত্রে অথর্ব্ববেদীয় "শৌনকসংহিতা"র উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃত্তিকার নাগেশ ভট্ট "শৌনকীয়া শিক্ষা" এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন। অথর্ব্ববেদীয় শিক্ষা গ্রন্থই "শৌনকীয়া শিক্ষা" নামে বিখ্যাত আছে। পাণিনিব্যাকরণে অথর্ব্ববেদীয় কল্প সূত্রেরও উল্লেখ আছে—যথা-"কাশ্যপ-কৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং নিনিঃ।" (৪, ৩, ১০৩,) চতুরধ্যায়ী কৌশিক-সূত্র যে অথর্ব্ববেদীয় তাহা প্রসিদ্ধ আছে। আরও "আথর্ব্বণিকস্যেকলোপশ্চ" (৪, ৩, ১৩৩) সূত্রে আথর্ব্বণিকানাং ধর্ম্ম আম্নায়ো বা ইত্যর্থে আথর্ব্বণঃ এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদ অপৌরুষেয়। কেহই বেদ প্রণয়ন করেন নাই।

"ন কেনচিদপি পুরুষেন প্রণীতো বেদঃ।

অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বেদ প্রণীত নহে। সাংখ্যদর্শনে, আদিবিদ্বান্ কপিল বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ।"

অতএব বলা যায়, অথর্ব্ববেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নহে, যেহেতু বেদের কর্ত্তা

কোনও পুরুষ নাই। অথর্ব্ব-বেদ ঋগ্‌যজুর্ম্ময়, তবে অথর্ব্ব-ঋষি-প্রবর্ত্তিত এবং অথর্ব্বকৃত্যের আধিক্য থাকা প্রযুক্তই ইহা অথর্ব্ব-বেদ নামে প্রসিদ্ধ। বেদ চারিটী--এ সম্বন্ধে আরও একটী প্রমাণ—

বিনিযোক্তব্যরূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদর্শ্যতে।
ঋগ্‌যজুঃ সামরূপেণ মন্ত্রে বেদচতুষ্টয়ে॥

ইহা অতি প্রাচীন "সর্ব্বানুক্রমণিকাবৃত্তি" নামক পুস্তকে দেখিতে পাই। অথর্ব্ব-বেদের অপর নাম "ব্রহ্মবেদ।" "ত্রয়ী-চতুষ্টয়" নামক গ্রন্থেও এবিষয়ে বিশেষ বিচার করা হইয়াছে, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহা ত্যাগ করিলাম। এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, অথর্ব্ববেদীয় শৌনকীয়শিক্ষা, অথর্ব্ব-বেদীয় চতুরধ্যায়যুক্ত কৌশিকসূত্র নামক কল্পসূত্র, অথর্ব্ব-বেদীয়দিগের পাঠ-প্রকারাত্মক ধর্ম্ম প্রভৃতি পাণিনি বিশেষরূপ জানিতেন। সুতরাং "পাণিনিতে অথর্ব্ব-বেদের কথা নাই" বলিয়া অথর্ব্ব-বেদকে উপেক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কোন ২ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি মনে করেন—"অথর্ব্ব বেদ মুসলমানের; হিন্দুর অথর্ব্ব-বেদ নাই।"

উক্ত সংস্কার যে কারণে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা যে অলীক তাহা নিম্নের আলোচনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কৃত "পৃথিবীর ইতিহাসে" দেখা যায়।

"বাদসাহ আকবরের সময় মুসলমানধর্ম্মের প্রাধান্যপ্রতিপাদন জন্য "অল্লোপনিষদ্" নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। মন্তেখুবও বার্ষিক নামক গ্রন্থে "অল্লোপনিষদ্" গ্রন্থ রচনার সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। কথিত আছে, হিজরী ৯৮৩ সাল ১৫৭৫ খৃঃ সম্রাট্ আকবর, বদাউনি নামক জনৈক মুসলমানকে অথর্ব্ব-বেদের অনুবাদ করিতে বলেন। ইস্‌লামধর্ম্মের সহিত অথর্ব্ব-বেদের কতগুলি ধর্ম্মোপদেশের ঐক্য আছে শুনিতে পাইয়া বাদসাহ সেই আদেশ করিয়াছিলেন। অনুবাদকালে বদাউনি অথর্ব্ব-বেদের অর্থ বোধে অসমর্থ হওয়ায় ফৈজি ও ইব্রাহিমের উপর সে ভার ন্যস্ত হয়। তাঁহারাও অনুবাদে অসমর্থ হইলেন। ইতিমধ্যে ভাবন নামক জনৈক দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ, মুসলমান্ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তখন তাঁহারই সাহায্যে পারস্যভাষায় অথর্ব্ব-বেদের অনুবাদ আরব্ধ হয়। বদাউনি্ ও ইব্রাহিমকে, সেক্ ভাবন যেরূপ ভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাঁহারা সেই ভাবেই অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। সেই অনুবাদের সময় কোরাণের "লাইল্লাহ" বচনের মত কোন অংশ দেখিতে পাইয়া সেক্ ভাবন

তাহার রূপান্তর করেন। অনেক লোক ভাবনের কৌশল বুঝিতে না পারিয়া সত্য সত্যই বেদে "আল্লা"র কথা আছে মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয় এবং তদনুসারে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করে। অথর্ব্ব-বেদের যে দুইটী মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া সেক্ ভাবন আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দুইটী মন্ত্র এই "আদল্লবুদমেককং।" "অলাবুকনিখাতকং।" এই মন্ত্র হইতে প্রথমে "আদল্লকমেককং।" "আল্লাবুকং" ইত্যাদি বাক্যের সৃষ্টি হয় এবং পরিশেষে অল্লোপনিষদ্ রচিত হইয়া যায়। অল্লোপনিষদের উপসংহারে পরিবর্ত্তনের মাত্রা চরমপথে উপস্থিত হয়। তাহাতে লিখিত হয় "ইল্লাকব্বর ইল্লাকবর, ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লা ইল্লা, ইল্লল্লো অনাদিস্বরূপা অথর্ব্বণী শাখাং, হ্রুং হ্রীং জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্ ইত্যাদি"। এইরূপ অল্লোপনিষদ্-রচনার পর বহু হিন্দু মুসলমান্ হইলেন, এবং অথর্ব্ব-বেদ যে "মুসলমানের বেদ" তাহা অশিক্ষিত সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করায় পরিণামে হিন্দু-মাত্রেই ঐ কুসংস্কারে আবৃত হইলেন। উক্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেই বলিয়া থাকেন—অথর্ব্ব-বেদ মুসলমানের, হিন্দুর নহে।

অথর্ব্ব-বেদের বিভাগ।

(১) পিপ্পলাদ (২) তৌদ (৩) মৌদ (৪) শৌনকীয় (৫) জাজল (৬) জলদ (৭) ব্রহ্মবদ (৮) দেবদর্শ (৯) চারণবৈদ্য।

পাঁচ প্রকার কল্প।

(১) কৌশিক (২) বৈতান (৩) নক্ষত্রকল্প (৪) আঙ্গিরস (৫) শান্তিকল্প।

কৌশিক-কল্পোক্ত বিষয়-সংক্ষেপ—

(১) দর্শপৌর্ণমাস-বিধি (২) মেধাজনন (৩) ব্রহ্মচারীর সাম্পদ (৪) পুত্র-পশুধন-ধান্যাদি-লাভার্থ কার্য্যবিশেষ (৫) সংগ্রামজয় (৬) বাণনিবারণ (৭) খড়্গাদিসর্ব্বশস্ত্র-নিবারণ (৮) শত্রুসেনামোহন, উচ্চাটনাদি (৯) সংগ্রামে জয়-পরাজয়-পরীক্ষা (১০) সেনাপত্যাদি-প্রধানপুরুষ-জয়-প্রণালী (১১) শত্রুক্ষয়কর্ম্ম (১২) রাজ্যাভিষেক (১৩) পাপক্ষয়ার্থ কার্য্য (১৪) চিত্রাকর্ম্ম (১৫) পৌষ্টিক (১৬) গোসমৃদ্ধিকার্য্য (১৭) ভাগ্যবৃদ্ধি (১৮) কৃষিপুষ্টিসাধন (১৯) বৃষোৎসর্গ (২০) জন্মান্তর-পাপ নিমিত্ত অচিকিৎস্য বিবিধ রোগের ঔষধ (২১) (২২) [illegible] মন্ত্রাদি (২৩) ভূতপ্রেত-বালগ্রহপিশাচাদির নিবারণ (২৪) [illegible] বিষ নিবারণের উপায় (২৫) সুখ-প্রসবের উপায় (২৬) রাজক্রোধ-নিবারণের উপায় (২৭) বজ্র অতিবৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণ (২৮) সভা ও বিবাদ-জয়

(২৯) ইচ্ছানুসারে নদীর প্রবাহকরণ (৩০) বৃষ্টি-কার্য্য (৩১) দ্যূতজয় (৩২) অশ্বশান্তি (৩৩) বাস্তুসংস্কার (৩৪) গৃহপ্রবেশ (৩৫) শান্তি ৩৬ দুঃস্বপ্ন-নিবারণ (৩৭) ঋণাপনোদন (৩৮) আভিচারিক কার্য্য (৩৯) পরকৃতাভিচার-নিবারণ (৪০) স্বস্ত্যয়ন (৪১) জাতকর্ম্মাদি সংস্কার (৪২) একাগ্নিসাধ্য কাম্য যাগ (৪৩) বহুবিধ অদ্ভূতশান্তি।

সংক্ষেপে বৈতান-কল্পের বিষয়।

(১) দর্শপৌর্ণমাস (২) অগ্ন্যাধান (৩) অগ্নিহোত্র (৪) আগ্রয়ণেষ্টি (৫) চাতুর্ম্মাস্য পশুযাগ (৬) সৌত্রামণী (৭) রাজসূয় (৮) অশ্বমেধ (৯) পুরুষমেধ (১০) সর্ব্বমেধ ইত্যাদি।

নক্ষত্রকল্পের বিষয়।

(১) কৃত্তিকানক্ষত্র পূজাহোমাদি (২) অদ্ভুতশান্তি (৩) অমৃতাদি ৩০ প্রকার মহাশান্তি। (৪) যে কার্য্যে যে শান্তি ও নাম (১) উৎপাতে অমৃতা (২) গতায় ব্যক্তির জীবনলাভার্থ বৈশ্বদেবী শান্তি (৩) অগ্নিভয়-নিবারণার্থ ও সর্ব্বকামার্থ আগ্নেয়ীশান্তি (৪) নক্ষত্র-গ্রহ-জন্য রোগার্ত্ত ব্যক্তির ভার্গবী শান্তি (৫) ব্রহ্ম-তেজোলাভার্থ ব্রাহ্মী (৬) রাজ্য-শ্রী-লাভার্থ বার্হস্পত্যা (৭) প্রজাক্ষয়-নিবৃত্তি ও অন্নপশু-লাভার্থ প্রাজাপত্যাশান্তি (৮) শুদ্ধ্যর্থ সাবিত্রী (৯ ছন্দোব্রহ্ম-বর্চ্চসকামীর গায়ত্রী (১০) সম্পল্লাভার্থ আঙ্গীরসী (১১ বিজয়-বলপুষ্টি-লাভার্থ ঐন্দ্রী (১২) রাজ্য-লাভার্থ মাহেন্দ্রী (১৩) ধনক্ষয়-নিবারণার্থ কৌবেরী (১৪) বিত্ত-তেজ-আয়ুঃ প্রভৃতি লাভার্থ আদিত্যা (১৫) অন্নকামীর বৈষ্ণবী (১৬) বাস্তু সংস্কারার্থ বাস্তোস্পত্যা (১৭) রোগার্ত্তের রৌদ্রী, (১৮) বিজয়ার্থ অপরাজিতা (১৯) যমভয়ে যাম্যা (২০) জলভয়-নিবারণার্থ বারুণী (২১) বায়ুভয়ে বায়ব্যা (২২) কুলক্ষয়-দোষে সন্ততিশান্তি (২৩) বস্ত্রক্ষয়নিবারণার্থ ত্বাষ্ট্রী। (২৪) বালবারণে কৌমারী-(২৫) নির্ঋতি-ভয়ে নৈর্ঋতি (২৬) বললাভার্থ মারুদগণী (২৭) অশ্বক্ষয়-নিবারণে গান্ধর্বী (২৮) গজক্ষয়ে পারাবতী (২৯) ভূমিলাভার্থ পার্থিবী (৩০) ভয়ার্ত্তের অভয়া।

আঙ্গিরস-কল্পের বিষয়।

(১) অভিচারে আত্মরক্ষা (২) অভিচারের উপযুক্ত দেশকাল-মণ্ডপাদি (৩) অভিচারকর্ম্ম (৪) পরকৃত অভিচারের বারণ।

শান্তিকল্পের বিষয়।

(১) বিনায়কগ্রহারিষ্টের লক্ষণ (২) তাহার শান্তি (৩) অভিষেক বৈনায়ক-হোম (৪) তৎপূজাবিধি (৫) আদিত্যাদি নবগ্রহযজ্ঞাদি।

এতদ্ব্যতীত এমন বহুবিষয় অথর্ব্ব-বেদে আছে, যাহা অতি গৌরবের বিষয়। প্রবন্ধ-বাহুল্যভয়ে লিখিতে পারিলাম না। হিন্দুপত্রিকায় "অথর্ব্ববেদ-সংহিতা" প্রকাশিত সকলেই সকলে অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ জ্যোতির্ব্বিনোদ।

গৌরোপাসনার সার্ব্বজনীনত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবের নিত্য উপাস্য কি? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলেন 'বিষ্ণু'—শৈব শাস্ত্র বলেন 'শিব'—শাক্তশাস্ত্র বলেন 'শক্তি'। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উহা নহে; কারণ ঐ সমুদায় শাস্ত্রের নামের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ সকল শাস্ত্র মনুষ্যসাধারণের উপাস্যের কথা বলেন নাই, ব্যক্তিবিশেষের উপাস্যের কথা বলিয়াছেন। জীব-সাধারণের নিত্য উপাস্য কি? এককথায় ইহার উত্তর করিতে হইলে বলিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে গুরু ও তৎপরে ইষ্ট। ভগবৎস্বরূপে ইষ্ট সকলেরই এক, কিন্তু উপাসকের বাসনা-ভেদে তাহার বিকাশ বা মূর্ত্তির ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এখন দেখা যাউক, গুরু কে? "মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তঃ"—যিনি মন্ত্র দান করেন তিনিই গুরু। দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই গুরু-পূজা করিয়া থাকেন, গুরুর একটি ধ্যানও পড়িয়া থাকেন, কিন্তু মন্ত্রদাতার দৃশ্যমানরূপের সহিত কি ধ্যানোক্তরূপের কোনও সামঞ্জস্য দেখিতে পান? কখনই পান না। ইহার কারণ কি? ধ্যান যখন রূপচিন্তা, তখন এরূপ অসমঞ্জস ধ্যান পড়া হয় কেন? ইহার কারণ সহজবোধ্য নহে, তবে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, গৃহস্থিত শালগ্রামশিলা যদি সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, রসসিজাসন, কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্, কিরীটী হারী, হিরণ্ময়বপু, ধৃতশঙ্খচক্র হইতে পারেন, মৃত্তিকা নির্ম্মিতঘট বা চন্দনাদি দ্বারা অঙ্কিত যন্ত্রাদি যদি করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা হইতে পারেন, তবে হস্তপদাদিবিশিষ্ট জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ক্রিয়াশীল মনুষ্য দ্বিভুজ শ্বেতবর্ণ, শ্বেতমাল্যানুলেপন স্বপ্রকাশ-স্বরূপ হইতে পারিবেন না কেন? অতএব ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমরা বহির্দৃষ্ট স্থূলমূর্ত্তির উপাসনা করি না,

স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মের সত্তা উপলব্ধি করিয়া জড়ের মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ অনুভব করিয়া মৃচ্ছিলাদি নির্ম্মিত প্রতিমাদি আধারে ধ্যানবর্ণিত চিন্ময়ী মূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বা কল্পনার আরোপ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। দীক্ষা বা শিক্ষাদাতার নর-দেহাভ্যন্তরে ধ্যানবর্ণিত চিন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকি। গুরুদেব কখনও নর নহেন। তন্ত্র বলেন,—"গুরৌ মানুষবুদ্ধিন্তু কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ"—গুরুকে মানুষ জ্ঞান করিলে নরক হয়। কঙ্কাল-মালিনী তন্ত্রে বলেন;—"নিগুর্ণঞ্চ পরব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং" গুরু এই অক্ষরদ্বয় নির্গুণ পরব্রহ্মের বাচক। নারদপঞ্চরাত্র বলেন;—"সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে, তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততং; তদ্‌গুরোঃ প্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র নররূপকঃ। গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া।" জীবের মস্তক-স্থিত সহস্রদল পদ্মে সূক্ষ্মরূপী যে গুরু বাস করেন, নররূপী গুরু তাঁহারই প্রতিবিম্ব বা প্রতিমা। "সহস্রদলপদ্মেচ হৃদয়স্থো হরিঃ স্বয়ং, সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বিপ্র পরমাত্মা নিরঞ্জনঃ"—(নারদ পঞ্চরাত্র) সহস্রদলপদ্মে গুরুরূপে এবং হৃদয়ে ইষ্টরূপে হরিই পূজিত হন, কেন না নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রাণিরই পরমাত্মা। তন্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে, যিনি সহস্রদলপদ্মে গুরুরূপে পূজিত হন, তিনিই ললাটস্থ দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে মন্ত্ররূপী পরমগুরু এবং তিনিই বিশুদ্ধাখ্য কণ্ঠস্থিত ষোড়শদলপদ্মে মন্ত্রশক্তিরূপ পরাপরগুরু ও হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে তিনিই ইষ্টরূপে পূজিত হন।—"অতোমন্ত্রে গুরৌ দেবে নহি ভেদঃ প্রজায়তে, কদাচিৎ স সহস্রারে পদ্মেধ্যেয়ো গুরুঃ সদা, কদাচিৎ হৃদয়াম্ভোজে কদাচিদ্দৃষ্টিগোচরে"—(প্রাণতোষিণী-তন্ত্রধৃত জামলবচন) অতএব গুরু মন্ত্র ইষ্টে কোনই প্রভেদ নাই। একই ব্যক্তি কখনও বা সহস্রদলপদ্মে গুরুরূপে, কখনও বা হৃদয়পদ্মে ইষ্টরূপে, কখনও বা দৃষ্টিগোচরে নররূপে পূজিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুরু ইষ্টেরই তদেকাত্মরূপ। তদেকাত্মরূপের লক্ষণ লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে এইরূপে লেখা আছে;—"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে, আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্‌ স তদেকাত্মরূপকঃ"—যেরূপটি স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু আকৃতি ভিন্ন মাত্র, তাহাকেই 'তদেকাত্মরূপ' বলে। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ। বিলাস যথা;—"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ, প্রায়েনাত্মসমং শক্ত্যা সবিলাসো নিগদ্যতে। পরমব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথাস্মৃতঃ, পরমব্যোমনাথস্য বাসুদেবশ্চ যাদৃশঃ,"—(লঘুভাগবতামৃত।) স্বরূপের বিলাস হেতু প্রায় তুল্যশক্তি যে অন্যরূপ আকৃতি প্রকাশ পায়

তাহার নাম বিলাস। যেমন গোবিন্দের বিলাসমূর্ত্তি পরমব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ, পরমব্যোমনাথের বিলাসমূর্ত্তি বাসুদেব। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুরু ও ইষ্টে কোনই প্রভেদ নাই, কেবল আকৃতিভেদ মাত্র। তাই কবিরাজ গোস্বামি-মহাশয় বলিয়াছেন,—"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের বিধানে, গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন শিষ্যগণে।" এই মহাবাক্যের সারগ্রহণ করিয়া অনেকে কৃতার্থ হইয়াছেন, আর অধুনা অনেকে দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অসদর্থ ঘটাইয়া অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছেন।

প্রোক্ত গুরু দ্বিবিধ—দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু। "মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তঃ" ইনিই হইলেন দীক্ষা-গুরু, আর যিনি সাধন-প্রণালীর শিক্ষা দান করেন তিনিই শিক্ষা-গুরু। এই শিক্ষা-গুরুও অন্তর্যামিরূপে ও নররূপে দ্বিবিধ,—শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ। (চৈতন্য চরিতামৃত) "যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্ আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।" (ভাঃ ১১।২৯) "যো ভগবান্ বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ, অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ, অশুভং বিষয়বাসনাং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং নিজরূপং ব্যনক্তি প্রকটয়তি'—(শ্রীধরস্বামী) যিনি (শ্রীভগবান্) বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে জীবের সমুদয় অশুভ দূর করিয়া নিজরূপ প্রকটিত করেন। ইহা বলাই বাহুল্য যে, শ্রীভগবান্ই সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামী, সুতরাং অবতারপুরুষ মাত্রেই গুরু ও ইষ্ট উভয়ভাবেই পূজিত হন। তাই কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় "বন্দে গুরূনীশভক্তান্ ইত্যাদি শ্লোকে পঞ্চরূপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যখন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম-প্রচারক হন তখন সম্প্রদায়-বিশেষের গুরু বা ইষ্টরূপে পূজিত হন। আর যখন সার্ব্বজনীনধর্ম্মের প্রচারক হন তখন জগদ্গুরুরূপে পূজিত হন। অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে গুরু বলিয়া বর্ণনা করিলে অন্তরে দুঃখানুভব করেন। তাঁহারা মনে করেন, যেন গুরু বলিলে তাঁহার ভগবত্তায় সন্দেহ করা হইল বা ভগবান্ অপেক্ষা তাঁহাকে ছোট করা হইল। এটি তাঁহাদের গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা বা গুরুভক্তির অল্পতার ফল বৈ আর কিছুই নহে। ভগবান্ও গুরু, ভাবভেদ মাত্র। বিশেষতঃ যখন পূর্ণ ভগবান্ অবতীর্ণ হন তখন তাঁহাতে সব ভাবই বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তিনি কাহারও গুরু, কাহারও ইষ্ট, কাহারও পতি, কাহারও পুত্র হইবেন, তাহাতে তাঁহার ন্যূনতা কি? আমার মতে

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের উপাসকগণের নিকট তিনি ইষ্টরূপে ও অপর সাধারণের নিকট জগদ্‌গুরুরূপে উপাস্য হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তিসম্মত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ বিধি বিধিমার্গে ভজনশীলগণের পক্ষে। যাঁহারা বৈষ্ণব ও রাগমার্গে ভজনশীল, তাঁহারা স্বস্ব বাসনানুরূপ ভজন করিবেন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

আপাত দৃষ্টিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া মনে হই-লেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেই দেখা যায় যে, মহাপ্রভু কোনও সম্প্রদায়-বিশে-ষের ধর্ম্মপ্রচারক নহেন, তিনি সার্ব্বজনীনধর্ম্মের প্রচারক, সুতরাং সর্ব্বজনেরই উপাস্য। শাস্ত্রাদিতে অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিশদরূপে প্রমাণ করিবার জন্য এতঅধিক অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করা হয় যে, তাহার আবরণে মূল বিষয়টি একেবারে আবৃত হইয়া পড়ে। কাজেই স্থূলদর্শিগণ তখন কোন্‌টি তাহার মূল ও কোন্‌টি তাহার অঙ্গ, তাহা আর লক্ষ্য করিয়া উঠিতে না পারায় অঙ্গকেই মূল বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া থাকেন। ঠিক যেন "বোঁয়ানামা" বট গাছ। দুটি একটি বটগাছের এরূপ ভাবে বোঁয়া নামে যে তখন কোন্‌টি বা মূল বৃক্ষ আর কোন্‌টি বা তাহার বোঁয়া তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ন্যায়-দর্শনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিন্দুদার্শনিকগণ সকলেই মুমুক্ষু, সুতরাং সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন মোক্ষ। * কি উপায়ে সেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এক এক জন দার্শনিক এক এক রূপ উপায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ন্যায়-দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং ঐ ষোড়শ পদার্থের প্রত্যেকটিরই লক্ষণ-পরীক্ষাদি বিশেষরূপ বর্ণন করা প্রয়োজন। তন্মধ্যে প্রথম পদার্থ যে প্রমাণ, উহা চারি প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের লক্ষণ-পরীক্ষাদি বর্ণন জন্য নব্য-ন্যায়-প্রণেতা গঙ্গেশোপাধ্যায় চারিখণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করিলেন। তন্মধ্যে এক খণ্ডই আবার টীকা, টীকার টীকা, তস্য টীকা প্রভৃতি শাখাপল্লব ও বোঁয়ায় বিভূষিত হইয়া এরূপ এক মহা মহীরুহের আকার ধারণ করিল যে, এক সময়ে অতি বড় নৈয়ায়িকও অনুমানখণ্ড পাঠ করিয়া "সমগ্রন্যায়দর্শন পাঠ করিয়াছি"

* যদিও মীমাংসকগণ মুমুক্ষু নহেন তাঁহারা স্বর্গকামী, কিন্তু তাঁহাদের স্বর্গের যাহা লক্ষণ উহা মুক্তি-লক্ষণের রূপান্তর বলিলেই সকল বিরোধ ঘুচিয়া যায়।

বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন এবং উহার প্রভাবে ন্যায়শাস্ত্র-পাঠের প্রয়োজন 'অপবর্গ' অপকর্ষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল ও বাদি-নিরাসে অতিগর্ব্বই ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। শুধু ন্যায়শাস্ত্র নহে, অনেক শাস্ত্রেরই এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল; এখনও তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ হয়নাই। তবে ভগবৎকৃপায় অনেকের এখন মূল প্রয়োজনে লক্ষ্য পড়িতেছে। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত পরমোদার ধর্ম্মও এইরূপেই বর্ত্তমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সহস্র সহস্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণন করিলেও প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রয়োজন-নির্ণয় জন্য গ্রন্থকারগণ গ্রন্থারম্ভে প্রয়োজনাদি অনুবন্ধচতুষ্টয় স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে কখনই ভ্রান্তি ঘটেনা। অনুবন্ধচতুষ্টয়ের মধ্যে 'প্রয়োজন' পদার্থটিই গ্রন্থের প্রাণ বা মুখ্য লক্ষ্য, আর উক্ত প্রয়োজন-সিদ্ধির গ্রন্থকারানুমোদিত উপায়টিকেই সেই গ্রন্থের 'অভিধেয়' বলা যায়। কোনও অধ্যাত্মশাস্ত্রে কোনও অনিত্যবস্তুকে প্রয়োজন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সুতরাং নিত্য বস্তুই প্রয়োজন পদার্থ, এবং নিত্য বস্তু মাত্রেই এক বৈ দুই হয় না, ইহাও অভিজ্ঞ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় দেশকাল-পাত্রভেদে বহুবিধ হইতে পারে, তাই সর্ব্বদর্শনেরই প্রয়োজন মোক্ষ-রূপ একই বস্তু; তবে তাহার লাভের উপায় সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই ভিন্নমত। তাই দর্শনসমূহের প্রয়োজন এক হইলেও অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন। প্রয়োজন স্থির রাখিয়া যদি অভিধেয় পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাহইলেও গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য স্থির থাকে, কিন্তু প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যদি কেবল অভিধেয় ধরিয়া বসিয়া থাকা যায়, তাহাহইলে পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। উদূখলের অবঘাতনের প্রয়োজন তণ্ডুল-নিষ্পত্তি। এখন যদি আমি অবঘাতরূপ উপায় পরিত্যাগ করিয়া নখবিদারণ বা যন্ত্রান্তরে ঘর্ষণাদি দ্বারা তণ্ডুল নিষ্কাষণ করি, তাহাহইলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, কিন্তু যদি প্রয়োজন পদার্থ তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তুষাবঘাতন করি, তাহাহইলে কি আমার অবঘাত শ্রম মাত্রই সার হয়না? তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন;—"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাং"—এখানে ভগবদ্ভক্তিই জীবের প্রয়োজন ও জ্ঞান তাহার লাভের উপায়, তাই বলিতেছেন—প্রয়োজন ভুলিয়া কেবলমাত্র তাহা লাভের উপায়কেই চরম জ্ঞান করিলে অর্থাৎ সাধনকে সাধ্য করিলে সাধনের শ্রমই সার হয়

মাত্র। সুতরাং প্রয়োজন বা সাধ্য স্থির রাখিয়া উপায় বা সাধন পরিবর্ত্তনে ক্ষতি ত নাইই, পরন্তু অবস্থাভেদে বিশেষ সুফল দেখা যায় বা একান্তই আবশ্যক হয়। আমার বিশ্বাস, প্রয়োজন স্থির রাখিয়া অভিধেয়-পরিবর্ত্তন-সাধন জন্য আমাদের শাস্ত্রে "উপলক্ষণ" "একবাক্যতা" প্রভৃতি প্রবেশলাভ করিয়াছে।

এখন দেখা যাউক্ মহাপ্রভুর অভিমত প্রয়োজন ও অভিধেয় পদার্থ কি? বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে মহাপ্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন-শিক্ষাচ্ছলে স্বয়ং মহাপ্রভু পাঞ্চজন্যস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন;—"ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।" প্রয়োজনই জীবের সাধ্য, তাই রায় রমানন্দের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরচ্ছলেও প্রেমকেই সাধ্য-সার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেম নিত্য, তাই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহাশয় বলিয়াছেন,—"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবাসা সাধনাভিধা, নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা"—ইহারই অনুবাদ করিয়া প্রাগুক্ত কবিরাজগোস্বামি মহাশয় বলিয়াছেন,—"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়, শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়"। নিত্য বস্তু এক বৈ দুই হইতে পারে না। তবে যে সখ্যপ্রেম বাৎসল্যপ্রেম কান্ত-প্রেম অথবা কৃষ্ণপ্রেম রাধাপ্রেম প্রভৃতি ভেদ দেখা যায়, উহা বাস্তব নহে, ঔপাধিক মাত্র। উপাধি পরিত্যাগ করিলে প্রেম জিনিষটাতে আর কোনও ভেদ থাকে না। যেরূপ ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান ও ঘটাকাশ মঠাকাশ প্রভৃতির ঔপাধিক ভেদ। ঘট পট মঠ প্রভৃতি উপাধিগুলি পরিত্যাগ করিলে যেমন জ্ঞান বা আকাশের কোনই ভেদ থাকে না, তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণ, কালী, দুর্গা প্রভৃতি উপাধি পরিত্যাগ করিলেও প্রেমের আর কোনই প্রভেদ থাকে না। এই প্রেমের সাধনা করিতে হইলে নিরাশ্রয়ে হয় না, একটি আশ্রয় ও বিষয় আবশ্যক, তাই মহাপ্রভু এই প্রেমের আশ্রয়রূপে শ্রীমতীর ও বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজনার অভিনয় দেখাইয়াছেন মাত্র। সুতরাং এখন সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রেমই সাধ্য। রাধাকৃষ্ণ বা কোনও সাম্প্রদায়িক ভগবদ্রূপ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অপরিহার্য্যরূপ সাধ্য নহে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঐ প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়রূপে উপাস্য। অতএব যে কোনও ব্যক্তি সাধ্যবস্তু ঠিক্ রাখিয়া তাহার আশ্রয় ও বিষয় স্থানে অনায়াসেই স্বস্ব ইষ্টদেব ইষ্টদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারেন। তাহাতেও মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই প্রতিপালিত হইবে। মনে করুন, আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন রোগ-আরোগ্য। এই প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত

রোগের আশ্রয়ীভূত নরদেহ ও তাহার উৎপত্তিপ্রণালী এবং প্রসঙ্গক্রমে দর্শনশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণার্থ শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি বহু বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। এখন কোনও ব্যক্তি যদি ইহার কোনও শাস্ত্রেরই আশ্রয় না করিয়া কেবল মাত্র তন্ত্রশাস্ত্রের সাহায্যে মন্ত্রশক্তিতে রোগ আরোগ্য করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না? পক্ষান্তরে কোনও ব্যক্তি যদি আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত রসায়ন শাস্ত্রানুশীলন ফলে মাটি হইতে শর্করা প্রস্তুত করিতে পারেন ও তাহা কোনও বাতশ্লেষ্মজ্বরে প্রয়োগ করিয়া রোগীর প্রাণসংহার করেন, তাহা হইলে কি তাঁহার আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে? তদ্রূপ যদি কোনও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় স্থলে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমধনে ধনী হইতে পারেন, তাহা হইলে কি তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করা হইবে না? আর কোনও ব্যক্তি যদি সারা জীবন "রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ" করিয়াও হিংসা দ্বেষ সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ না করিতে পারেন, তাহা হইলেও কি তাঁহার মহাপ্রভুর মর্য্যাদা রক্ষাকরা হইবে? মুরারিগুপ্ত যখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও রামের আসনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া সাশ্রু নয়নে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে প্রভুর চরণে নিজের হৃদয়ের অবস্থা খুলিয়া জানাইলেন, তখন প্রেমিকশিরোমণি প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ইঙ্গিতে এই কথারই অনুমোদন করিয়াছিলেন। শুধু কেবল এই যুগে নহে, দ্বাপরে হনুমানের নিকটে মুরলীধারীর ধনুর্দ্ধারী হইতে হইয়াছিল, ত্রেতায় গরুড়ের নিকটে ধনুর্দ্ধারীকে চক্রধারী হইতে হইয়াছিল।

মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রেমই যে সাধ্য তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। প্রেম এক, প্রেম নিত্য, প্রেম সত্য। প্রেম-সুধা সমুদ্র, উহার কূল কিনারা নাই, উহা অনন্ত, অসীম। উহার কণিকা মাত্র সংস্পর্শে মরুভূমিতে পারিজাত ফুটে, ঘেটুফুলে ভ্রমর ছুটে, মরাপ্রাণ বাঁচিয়া উঠে, পঙ্গু খঞ্জ নাচিয়া উঠে। উহার বিশ্ববিপ্লাবী তরঙ্গভঙ্গ রঙ্গভরে সদাই অসম হইলেও উহার বিন্দু-মাত্র সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দেব অসুর পাহাড় পর্ব্বত নদী নালা উচু নীচ সবই সমান হইয়া যায়। তাই দেখিতে পাই,— ত্রৈলোক্যনাথোঽপি দীনাতিদীনঃ অসীমসত্ত্বোঽপি হীনাতিহীনঃ" আরও "নির্দ্বন্দ্বভাবোঽপি নরার্ত্তিকাতরঃ"—হইয়া জীবের দ্বারে ২ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যাঁহার পদরজঃ স্পর্শ করিতে পারিলে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ কৃতার্থ হন, তিনি স্বয়ং নন্দের বাধা মাথায় বহন করিতেছেন! ব্রহ্মর্ষি মহর্ষিগণ পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যাঁহার উদ্দেশ্যে হবিঃপ্রদান

করিয়া কৃতার্থ হন, সামান্য গোপবালকগণ স্পর্দ্ধা সহকারে তাঁহারই মুখে উচ্ছিষ্ট ফল অসঙ্কোচে প্রদান করিতেছে, তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেছে। তাঁহার যে প্রেমের মলিন প্রতিবিম্বের ক্ষণিক সংস্পর্শে কতশত শোণিতপিপাসু তীক্ষ্ণধার ক্ষাত্র তরবারি সুকোমল বরমাল্যে পরিণত হইল, যাঁহার প্রবল উচ্ছ্বাসে শতশত নরনারীর সযত্নরক্ষিত কুলশীল জাতিমান মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, যাহার অঘটনঘটনাপটীয়সী শক্তিতে অহিনকুলেও হরগৌরীমিলন হইতে প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে, সেই প্রেমের সাকার বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরহরি, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে কি কখনও সঙ্কীর্ণতা মলিনতা দ্বেষাদ্বেষী বা দলাদলি রাখিতে পারেন! যাঁহার পদকমল ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বভাব তিরোহিত হইয়া যায়, তাঁহার ধর্ম্মে কি দ্বন্দ্ব প্রবেশ করিতে পারে? তিনি বিশ্বরূপানুজ নিজেও বিশ্বম্ভর-বিশ্বরূপ, তাঁহার ধর্ম্মও বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপ! যাঁহার সাধনলব্ধ দৃষ্টিশক্তি যত টুকু দেখিতে সমর্থ, তিনি ততটুকুর পরেই একটি সীমারেখা দিয়াছেন, তাই বলিয়া অনন্তের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী পড়িতে পারেনা। সুতরাং মহাপ্রভু যেখানে যেখানেই রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই 'রাধাকৃষ্ণ' শব্দটি উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। "স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতর-প্রতিপাদকত্বমুপলক্ষণত্বং"—নাম ধরিয়া যে বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ করা হইল, ঐ নাম তাহাকে বুঝাইয়া যদি তদতিরিক্তকেও বুঝায়, তাহা হইলে তাহাকে উপলক্ষণ বলে। যেমন,—"কাকেভ্যোদধিরক্ষতাং"—অর্থাৎ কেহ একখানা দধি আনিয়া বাহিরে রাখিলেন ও তথায় উপস্থিত শিষ্যকে বলিলেন যে "দেখিও যেন কাকে দধি না খায়"। ইহাতে সেই শিষ্য কাকে দধি ভোজন করিলেই দেখিতে হইবে, বিড়ালাদিতে খাইলে আর দেখিতে হইবে না—ইহ বুঝেন না পরন্তু কাক ঠেকাইয়া বিড়ালাদিও ঠেকান। সেখানে কাকশব্দে কাক ত বুঝাই যায়, এবং সাথে সাথে যে যে জীব হইতে দধি নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে তাহাদের নামোল্লেখ না করিলেও বুঝা যায়। এই যে কাক শব্দে কাক ও তদতিরিক্ত জীব জন্তু বুঝা—ইহাকেই উপলক্ষণ বলে। অতএব মহাপ্রভু যেখানে সেখানেই রাধাকৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে সেখানেই যুগলোপাসকগণ রাধাকৃষ্ণ, গৌরমন্ত্রে দীক্ষিতগণ গৌরচন্দ্র এবং শাক্ত শৈবাদি সম্প্রদায়িগণ স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীকে বুঝিবেন, তাহাতে বাধা কি? একত্রনির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকমন্তরেণান্যত্রাপি তথা"—এক বিষয়ে শাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে, যদি

কোন বাধা না থাকে, তবে অন্য বিষয়েও ঠিক্ সেইরূপই বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে চক্ষে দেখিবেন, কালীভক্তগণও যে কালীকে ঠিক্ সেই চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে বাধা কি? বৈষ্ণবগণ যেমন ভক্তিলাভার্থে অনুকূলরূপে কৃষ্ণানুশীলন করিবেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়িগণও যে ঠিক্ তদ্রূপেই ইষ্টানুশীলন করিবেন তাহাতে বা বাধা কি? পরন্তু তাহাই সমধিক সমীচীন বা অবশ্যকরণীয়। নচেৎ গৌরোপাসনাও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বলিতে হয়; কেননা, পূর্ব্বোক্ত প্রেমের আশ্রয় ও বিষয় যদি রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও ভগবদ্রূপ না হন, তবে মহাপ্রভুই বা তাহার আশ্রয় বিষয় কি করিয়া হইতে পারেন? যদি বলেন, রাধাকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু বিভিন্ন তত্ত্ব নহেন, তখন আর তাহাতে বাধা কি? কিন্তু মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও আকৃতিগত ভেদ ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলেই যদি প্রোক্ত প্রেমের আশ্রয় বিষয় হইতে পারে, তাহা হইলেও সমস্ত দেবদেবীই উহার আশ্রয় বিষয় হইতে পারেন, কারণ সকলেই কৃষ্ণেরই অবতার, যে হেতু তিনিই একমাত্র অবতারী। অবতার ও অবতারীতে স্বরূপতঃ ভেদ থাকে না, আকৃতিগত ভেদ থাকে মাত্র। যদি বলেন— অন্যান্য দেবদেবীগণ অংশ, শ্রীকৃষ্ণ অংশী, তাঁহারা অবতার, শ্রীকৃষ্ণ অবতারী; সুতরাং স্বরূপতঃও কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, কিন্তু মহাপ্রভুর সহিত সেরূপ ভেদও নাই। কেবল মাত্র একটি গৌরবর্ণের আবরণ মাত্র প্রভেদ। তাহা সত্য, কিন্তু ঐ আবরণ জন্যই 'কৃষ্ণ' শব্দ 'গৌর'-শব্দের উপলক্ষণ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ কৃষ্ণ শব্দে গৌর বুঝাইবার অন্য উপায় নাই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে যেমন গৌরচন্দ্রকে বুঝায়, তেমনি অন্যান্য দেবদেবীকেও বুঝাইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবগণের অভিপ্রায় তাহা নহে। তাই নামকৌমুদী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,—"তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে, কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ"—কবিরাজ গোস্বামী ইহারই অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,— "প্রভু কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি, শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি"—অথচ অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে গৌরপূজার বিধান দিতেছেন, সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার না করিয়া আর উপায়ান্তর নাই। ভক্ত বৈষ্ণবগণ মনে করিবেন না যে, ইহার দ্বারা আমি রাধা-কৃষ্ণের উপাসনা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি বা তাঁহাদের প্রাধান্য অস্বীকার করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য এই যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীভূত হউক, জগদ্বাসী সকলেই গৌরভজনা করিয়া কৃতার্থ হউন, অথচ কাহারও ইষ্ট-

ত্যাগী হইতে না হয়। ভক্ত মহোদয়গণ! শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে গুরুরূপে ভজনা করিবার উপদেশ দেওয়ায় যাঁহারা কোনরূপেই প্রীত না হইতে পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াও আমাকে ক্ষমা করিবেন যে, যাঁহারা মহাপ্রভুকে সঙ্কীর্ণমতবাদের প্রবর্ত্তক মনে করিয়া উপেক্ষাপূর্ব্বক অধঃপতিত হইতেছেন বা যাঁহারা উপেক্ষা না করিয়াও ইষ্টত্যাগাশঙ্কায় প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা অন্ততঃ যদি তাঁহাকে গুরুরূপেও ভজনা করেন, তাহাহইলেও অশেষকল্যাণভাগী হইতে পারিবেন। তাঁহারই শ্রীমুখের উক্তি আছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ" "দদামি বুদ্ধি-যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে"—"যে আমাকে যেরূপ ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই কৃপা করিয়া থাকি"—"অনন্যচিত্তে যে ব্যক্তি আমাকে পাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে আমিই সেইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকি, যাহাতে আমাকে পাইতে পারে"। সুতরাং তাঁহাকে যদি কেহ গুরুরূপে ভজনা করেন, তাহা হইলে তিনিও তাঁহাকে গুরুরূপেই কৃপা করিবেন। তিনি যাহার গুরু হইবেন, তাহার সাধন পদ্ধতিতে কি কোন ভুলচুক থাকিতে পারে? যদি তাঁহাকে গুরু বলায় কোনও ভুলও হইয়া থাকে, তাহাও তিনি সংশোধন করিয়া দিবেন এবং তাদৃশী বুদ্ধি দিবেন, যাহাতে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাহা হইলে আর ভয় ভাবনা থাকিল কি? আমার উদ্দেশ্য, যে কোনও রূপে জীব একবার মাত্র তাঁহাকে ভজনা করুক, তাহাহইলে কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা—তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ কুসংস্কার পোষণ করিতে পারিবে না দেখিবে যে "গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভক্তিরস সার। গৌরাঙ্গমধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার" ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সুতরাং সে কৃতার্থ হইবে তাহাতে সংশয় নাই। তাই বলিতেছি, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতগণ মহাপ্রভুকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত-মূর্ত্তিজ্ঞানে উপাসনা করুন, গৌরমন্ত্রে দীক্ষিতগণ স্বীয় ইষ্টজ্ঞানে ভজনা করুন; এবং শাক্ত শৈবাদি সম্প্রদায়গণও তাঁহাকে জগদ্গুরু-জ্ঞানে ভজনা করুন।

হে শাক্তাদি সম্প্রদায়গণ! আপনারা যে জগদম্বাকে "কোলের মেয়ে" ভাবিয়া, তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য ভুলিয়া, অতি আপনার জন মনে করিয়া, ব্রজগোপালের প্রতি যশোদার ন্যায় ব্যবহার করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, এ শিক্ষা—এভাব কাহার প্রসাদে পাইলেন? উহা সেই অনর্পিতপূর্ব্ব প্রেমদাতা মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ! ঐ যে শারদীয় মহোৎসব-সময়ে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী, ত্রিনয়নী, সিংহ-

বাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী অলৌকিক মহৈশ্বর্য্যশালিনী মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া, সর্ব্বৈশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার অবিকল অনুকরণ করিয়া, অশ্রু-জলে হৃদয় প্লাবিত করিলেন, জামাতা ভোলানাথের দুঃখদারিদ্র্য ভাবিয়া, জগদীশ্বরীর জন্য কত আদর করিয়া গন্ধতৈলাদি কেশসংস্কারদ্রব্য ও সাধ্যানুরূপ বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলেন, সেই সর্ব্বব্যাপিনীর মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিলেন, "আমার উমার ছেলে" ব'লিয়া স্নেহসিক্ত নয়নে কার্ত্তিকগণেশকে কত আদর করিলেন, "কার্ত্তিক কোলের আদুরে ছেলে, যে বায়না ধরিবে, বাপ মা'র তাহাই করিতে হইবে" এই মনে করিয়া কার্ত্তিককে সমধিক সোহাগ করিয়া কাণে কাণে (পাছে জামাই শুনেন) বলিয়া দিলেন—"মাকে নিয়ে আবার এস"—এই সমুদয় মধুরাদপি মধুর ভাবসকল কাহার কৃপালব্ধ? স্বীকার করি, এই সমুদয় ভাবের সূক্ষ্মবীজ আমাদের শাস্ত্রে লুক্কায়িত ছিল। জগতে নূতন কিছুই হয় না—কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র! 'সমুদ্রে অনন্ত রত্ন আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের অধিগম্য নহে; পাইতে গেলে উপযুক্ত ডুবরি চাই। এই জগৎ-প্রকৃতির গর্ভ-সমুদ্রেও অনন্ত রত্ন আছে, কিন্তু কে তাহা উত্তোলন করে? যিনি করেন, যিনি সাধারণ মনুষ্য নহেন। যাঁহারা অন্য কিছুও বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস করিবেন। শ্রীভগবান্‌কে আপনার হইতেও আপনার করিয়া সেবা করিবার অতি মধুরতম প্রণালীসমূহের জন্য সমগ্র জগৎ শ্রীশ্রীগৌরভক্তগণের কাছে চির ঋণী, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু এইমাত্র কারণেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে উপাস্য। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন "গৌরাঙ্গের দুটিপদ, যার ধনসম্পদ, সে জানে ভকতি রস সার। গৌরাঙ্গমধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥" এরূপ উদার—এরূপ মহান্—এরূপ নির্ম্মলধর্ম্মে যদি হৃদয় নির্ম্মল না হইবে, তবে আর কিসে হইবে? শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রার্পণমস্তু।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

—:o:—

জল।

স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল উৎকৃষ্ট উপায় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে "বিশুদ্ধপানীয় জলের ব্যবহার" অন্যতম। এ বিষয়ে

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কোন প্রকার মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। অতএব বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার এবং অবিশুদ্ধ জলের পরিবর্জ্জন প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য। অবিশুদ্ধ জল-পান এবং ব্যবহার দ্বারা আমাদের শরীরাভ্যন্তরে নানাবিধ দুরারোগ্য রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং জলের দোষগুণ পরিজ্ঞাত হওয়া প্রত্যেকের পক্ষে আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ জল সম্বন্ধে যে সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন আমরা তাহাই এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছি।

"পানীয়মান্তরীক্ষমনির্দ্দেশ্যরসমমৃতং জীবনং তর্পণং ধারণমাশ্বাসজননং শ্রমঘ্নং ক্লমপিপাসা-মদমূর্চ্ছাতন্দ্রানিদ্রাদাহপ্রশমনমেকান্ততঃ পথ্যতমঞ্চ।"

অর্থাৎ জল আকাশাগত; জলের রস (আস্বাদ) নির্ণয় করা যায় না। জল সুধাস্বরূপ, প্রাণরক্ষাকারি, তৃপ্তিকর, ধারণ, আশ্বাসপ্রদ, শ্রমনাশক, ক্লান্তিহর, পিপাসাবারক, মত্ততাহারি, মূর্চ্ছাহারক, তন্দ্রাবিনাশক, নিদ্রানিবারক ও দাহ-প্রশামক এবং হিতকারী। সুশ্রুত বলেন—

"তদেবাবনীপতিতমন্যতমং রসমুপলভতে স্থানবিশেষান্নদীনদ-সরস্তড়াগ-বাপী-কূপ চুণ্ডী প্রস্রবণোদ্ভিদ্বিকির-কেদার-পল্বলাদিষু স্থানেষ্ববস্থিতমিতি॥" অর্থাৎ—

সেই জল পৃথিবীতে পতিত এবং নদ নদী সরোবর তড়াগ প্রভৃতিতে অবস্থিত হইয়া মধুর, অম্ল প্রভৃতি ছয়প্রকার রসের যে কোন একটী রস প্রাপ্ত হয়।

"তত্রলোহিত-কপিল-পাণ্ডুপীত-নীল-শুক্লেষ্ববনীপ্রদেশেষু মধুরাম্ল-লবণ-কটুতিক্তকষায়ানি যথাসংখ্যমুদকানি সম্ভবন্তীত্যেকে ভাষন্তে, তৎ তু ন সম্যক্॥" অর্থাৎ—

কেহ বলেন লোহিত কপিলাদি ছয় প্রকার স্থানে পতিত জল যথাক্রমে মধুর অম্ল প্রভৃতি ছয় রসসম্পন্ন হয়। ইহাদের মতে লোহিতমৃত্তিকাবিশিষ্ট স্থানের জল মধুররস, কপিলমৃত্তিকাযুক্ত স্থানের জল অম্লরস—এইরূপ ভাবে জলের রস অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সুশ্রুত ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মত এইরূপ যথা—

"তত্র পৃথিব্যাদীনামন্যোন্যানুপ্রবেশকৃতঃ সলিলরসোদ্ভবস্তুৎকর্ষাপকর্ষেণ।
তত্র স্বগুণভূয়িষ্ঠায়াং ভূমৌ অম্লং লবণঞ্চ। অম্বুগুণভূয়িষ্ঠায়াং মধুরং।
তেজোগুণভূয়িষ্ঠায়াং কটুকং তিক্তঞ্চ। বায়ুগুণভূয়িষ্ঠায়াং কষায়ঞ্চ।
আকাশগুণভূয়িষ্ঠায়াব্যক্তরসং অব্যক্তং হি আকাশমিত্যতস্তৎপ্রধানমব্যক্তরসত্বাৎ, তৎপেয়মান্তরীক্ষালাভে।" অর্থাৎ—

পাঞ্চভৌতিক জগৎ; অতএব মৃত্তিকাও পাঞ্চভৌতিক। যে মৃত্তিকাতে পৃথ্বীগুণ অধিক আছে, তত্রত্য জলের অম্ল ও লবণরস হইয়া থাকে। যে স্থানে অম্বুগুণের আধিক্য থাকে, তথাকার পানীয় মধুররসবিশিষ্ট হয়। তেজোগুণবহুল মৃত্তিকাপ্রদেশের জল কটু কিম্বা তিক্তরস বিশিষ্ট হয়। বায়ুগুণের প্রাধান্যে কষায়রস এবং আকাশগুণবাহুল্যে অব্যক্তরস অর্থাৎ কোন রসের জ্ঞান হয় না, কারণ আকাশ অব্যক্ত। আন্তরীক্ষ পানীয়ের অভাবে এই আকাশগুণভূয়িষ্ঠ স্থানের পানীয়ই গ্রাহ্য। আন্তরীক্ষ জলের প্রকারভেদ বিষয়ে সুশ্রুত বলেন—

"তত্রান্তরীক্ষং চতুর্ব্বিধম্, তদ্যথা—ধারং কারং তৌষারং হৈমমিতি।

তেষাং ধারং প্রধানং লঘুত্বাৎ। তৎপুনর্দ্বিবিধং গাঙ্গং সামুদ্রঞ্চেতি। তত্র গাঙ্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়শো বর্ষতি। তয়োর্দ্বয়োঃ অন্তরীক্ষণং কুর্ব্বীত। শাল্যোদন-পিণ্ডমকুথিতমবিদগ্ধং রজতভাজনোপহিতং বর্ষতি দেবে বহিষ্কুর্ব্বীত, স যদি মুহূর্ত্তং স্থিতস্তাদৃশ এব ভবতি, তদা গাঙ্গং পততীত্যবগন্তব্যম্। বর্ণান্যত্বে সিকৃথক্লেদে চ সামুদ্রমিতি বিদ্যাৎ তন্নোপাদেয়ম্॥" অর্থাৎ—

আন্তরীক্ষ পানীয় চতুর্ব্বিধ যথা:—ধার, কার, তৌষার, হৈম। এই চারি প্রকারের মধ্যে ধার প্রধান, কারণ এই পানীয়ই অতি লঘু। "ধার" আবার দুই প্রকার "গাঙ্গ ও সামুদ্র"। এই দুই প্রকারের প্রভেদ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায়। প্রায়ই আশ্বিনমাসে "গাঙ্গবারি"-বর্ষণ হইয়া থাকে। শালিতণ্ডুলের বিশুদ্ধ অন্ন রৌপ্যপাত্রে রাখিয়া বৃষ্টির সময় উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করিলে বারিপাত দ্বারা যদি মুহূর্ত্ত পরে ঐ অন্নের কোনরূপ কলুষ অবস্থা না হয় অর্থাৎ যদি উহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অবিকৃত থাকে, তাহা হইলে গাঙ্গবারিপাত জানিবেন, অন্যথায় সামুদ্রবারি বলিয়া জানিবেন। সামুদ্রবারি উৎকৃষ্ট নহে। তবে এ সম্বন্ধে সুশ্রুতের অভিপ্রায় এই যে—

সামুদ্রনাশ্বযুজে মাসি গৃহীতং গাঙ্গবদ্ভবতি। গাঙ্গং পুনঃ প্রধানং তদুপাদদীতাশ্বযুজে মাসি, শুচিশুক্লবস্ত্রপটৈকদেশচ্যুতমথবা হর্ম্ম্যতলপরিভ্রষ্টমন্যৈর্ব্বা শুচিভির্ভাজনৈঃ গৃহীতং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়ে বা পাত্রে নিদধ্যাৎ, তৎ সর্ব্বকালমুপযুঞ্জীত"

অর্থাৎ আশ্বিনমাসে গৃহীত সামুদ্রবারি গাঙ্গবারি-সদৃশ হয়। আশ্বিন মাসে অতিপরিষ্কৃত বিশুদ্ধ শুভ্রবস্ত্রে ধৃত অথবা হর্ম্ম্যতল-পরিভ্রষ্ট বা অন্য কোন প্রকারের বিশুদ্ধ পাত্রে গৃহীত গাঙ্গবারি, পানের পক্ষে অতি প্রশস্ত।

এই পানীয় জল বিশুদ্ধ সুবর্ণ, রজত বা মৃণ্ময়পাত্রে রক্ষা করিবে। এইরূপ জলই সর্ব্বকালে পান করা উচিত। এরূপ জল না পাইলে কিরূপ জল পান করা কর্ত্তব্য—এই বিষয়ে সুশ্রুতের মত——

"তস্যালাভে ভৌমং। তচ্চাকাশগুণবহুলম্। তৎপুনঃ সপ্তবিধম্ তদ্যথা—কৌপং নাদেয়ং, সারসং, তাড়াগং, প্রাস্রবণম্, ঔদ্ভিদং, চৌণ্ঠ্যমিতি। তত্র বর্ষাসু আন্তরীক্ষং ঔদ্ভিদং বা সেবেত মহাগুণত্বাৎ, শরদি সর্ব্বং প্রসন্নত্বাৎ, হেমন্তে সারসং তাড়াগং বা, বসন্তে কৌপং প্রাস্রবণং বা, গ্রীষ্মেপ্যেবং প্রাবৃষিচৌণ্ঠমনভিবৃষ্টং সর্ব্বঞ্চেতি॥"

অর্থাৎ "গাঙ্গবারি"র অভাবে ভূমিস্থ বারি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আকাশ-গুণ-বহুল ভূমিস্থ বারি শ্রেষ্ঠ। ভূমিস্থ বারি সাত প্রকার যথা—কূপজাত, নদীস্থ, সরোবরে অবস্থিত, তড়াগসম্ভূত, প্রস্রবণপ্রসূত, উদ্ভিদজ এবং চৌণ্ঠস্থ। বর্ষাকাল (ভাদ্র আশ্বিন মাসে) আন্তরীক্ষ বা উদ্ভিদজ বারি অত্যন্ত উপাদেয়, এই কারণ পানের পক্ষে এই বারিই প্রশস্ত। শরৎ ঋতুতে সর্ব্বস্থানের জলই নির্ম্মল থাকে, এই হেতু এই কালে সমস্ত প্রকার জলই পান করা যাইতে পারে। হেমন্ত ঋতুতে (পৌষ ও মাঘ মাসে) সরোবর ও তড়াগ-সম্ভূত বারি ব্যবহার করা বিধেয়। বসন্ত ঋতুতে (ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে) কূপজাত কিম্বা প্রস্রবণ-প্রসূত জল ব্যবহার্য্য। গ্রীষ্মে (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে) শরৎ ঋতুর ন্যায় ব্যবস্থা। প্রাবৃট্ (আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে) কালে বৃষ্টির জল ভিন্ন সমস্ত জল এবং চৌণ্ঠ বারির (কূপের সমীপস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল) ব্যবহার উপকারী।

নিন্দনীয় জল সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—

"কীট মূত্র পুরীষাণ্ড শবকোথ-প্রদূষিতম্।
তৃণপর্ণোৎকরযুতং কলুষং বিষসংযুতম্॥
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেদ্বাপি নবং জলম্।
স বাহ্যাভ্যন্তরান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবতু॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কীট মূত্র, বিষ্ঠা ভেক প্রভৃতির ডিম্ব-সঙ্কুল, মৃতদেহাদি দ্বারা দূষিত, তৃণ, পত্র ও পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাদিযুক্ত বা অন্য কোন প্রকারে অপরিস্কৃত কিম্বা বিষসংযুক্ত জলে এবং বর্ষা ঋতুতে নূতন জলে অবগাহন করে বা ঐ সকল জল পান করে, সেই ব্যক্তি বাহ্য এবং আভ্যন্তর রোগ প্রাপ্ত হয়।

তত্র যৎ শৈবালপঙ্কতৃণপদ্মপত্রপ্রভৃতিভিরবচ্ছন্নং শশিসূর্য্যকিরণানিলৈর্নাভিজুষ্টং গন্ধবর্ণরসোপসৃষ্টং তদ্ব্যাপন্নমিতি বিদ্যাৎ;—অর্থাৎ ভূমিস্থ যে

জল শৈবাল, কর্দ্দম জলজতৃণ, পদ্মের পাতা প্রভৃতির দ্বারা আবৃত, চন্দ্রসূর্য্য-কিরণ এবং বায়ু কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট, কুৎসিতগন্ধ-বর্ণরূপবিশিষ্ট হয়, তাহাকে "ব্যাপন্ন বারি" বলে।

"তস্য স্পার্শরূপরসগন্ধবীর্য্যবিপাকদোষাঃষট্ সম্ভবন্তি॥ তত্র খরতা পৈচ্ছিল্যমৌষ্ণ্যং দন্তগ্রাহিতা স্পর্শদোষাঃ। পঙ্ক-সিকতা-শৈবাল-বহুবর্ণতা রূপ-দোষঃ। ব্যক্তরসতা রসদোষঃ। অনিষ্টগন্ধতা গন্ধদোষঃ। যদুপযুক্তং তৃষ্ণা-গৌরবশূলকফপ্রসেকানাপাদয়তি স বীর্য্যদোষইতি। যদুপযুক্তং চিরাদ্বিপচ্যতে বিষ্টভ্নাতি বা স বিপাকদোষ ইতি। তত্রতে আন্তরীক্ষে নসন্তি।" অর্থাৎ পৃথিবীস্থ বারির উপরিউক্ত স্পর্শাদি ছয় প্রকার দোষ জন্মিতে পারে। দোষ যথা—খরতা (কর্কশভাব) পিচ্ছিলত্ব, উষ্ণতা, ও দন্তের অম্লতা প্রভৃতি অন্যথাভাব বোধ হওয়া স্পর্শদোষ। পঙ্ক শৈবাল এবং জলের নানাপ্রকার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হওয়া রূপদোষ। রসনেন্দ্রিয়-স্পর্শমাত্রে কোন প্রকার রস-জ্ঞান হওয়া রসদোষ। দুর্গন্ধ অনুভূত হওয়া গন্ধদোষ। যে জল পান করিলে তৃষ্ণা, শরীরের গুরুতা, শূল অথবা কফপ্রসেক হয়, সে জলের বীর্য্যদোষ জানিবে। যে জল পান করিলে দীর্ঘ সময়ে পরিপাক হয় কিম্বা উদর ভার হয়, সে জলের বিপাকদোষ জন্মিয়াছে জানিবে। এই সমস্ত দোষ আন্তরীক্ষ বারিতে থাকেনা। দূষিত জলের শোধন সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—

"ব্যাপন্নানামগ্নিক্কথনং সূর্য্যাতপ-প্রতাপনং তপ্তায়ঃপিণ্ড-সিকতা-লোষ্ট্রা-নাং বা নির্ব্বাপনং প্রসাদনঞ্চ কর্ত্তব্যং নাগ চম্পকোৎপল-পাটলা-পুষ্প-প্রভৃতিভি-শ্চাধিবাসনমিতি।" অর্থাৎ—

পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যাপন্ন (দোষযুক্ত) বারিকে অগ্নি অথবা রৌদ্র দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া বা তপ্ত লৌহপিণ্ড কিম্বা তপ্ত প্রস্তরখণ্ড বা তপ্ত বালুকা ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়া, পরে নাগচম্পক প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করিয়া লইবে।

১। সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে কাংস্যে মণিময়েঽপি বা।
পুষ্পাবতংসং ভৌমে বা সুগন্ধি সলিলং পিবেৎ॥

২। ব্যাপন্নং বর্জ্জয়েন্নিত্যং তোয়ং যচ্চাপ্যনার্ত্তবম্।
দোষসঞ্জননং হ্যেতস্মাদদ্দীতাহিতস্তু তৎ॥

৩। ব্যাপন্নসলিলং যস্তু পিবতীহাপ্রসাধিতম্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ ত্বগ্দোষমবিপাকতাম্॥

৪। শ্বাস-কাস-প্রতিশ্যায়-শূলগুল্মোদরাণি চ।
অন্যান্ বা বিষমান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবচ ॥”

বঙ্গানুবাদ।

১। সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য অথবা মৃৎপাত্রে পুষ্পাধিবাসিত সুগন্ধি জল পান করিবে। (জলে পুষ্পস্থ কীটাদি যাহাতে পতিত না হয়, সে বিষয়ে অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে।)

২। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপন্নবারি অথবা যে বারি ঋতুর অনুরূপ নহে, তাহা দোষজনক বলিয়া অহিতকর, অতএব এইরূপ বারি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

৩।৪। ব্যাপন্নবারি প্রসাধিত না করিয়া পান করিলে শোথ, পাণ্ডুরোগ, ত্বগ্দোষ, অজীর্ণ, কাস, শ্বাস, সর্দ্দি, শূল, গুল্ম, ও উদররোগ জন্মিতে পারে।

“তত্র সপ্ত কলুষস্য প্রসাধনানি ভবন্তি।

তদ্যথা—কতকগোমেদকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবস্ত্রানি মুক্তামণিশ্চেতি। পঞ্চ-নিক্ষেপানি ভবন্তি তদ্যথা-ফলকং ত্র্যষ্টকং মুঞ্জবলয় উদকমঞ্চিকা শিক্যঞ্চেতি। সপ্তশীতীকরণানি ভবন্তি—প্রবাতস্থাপনমুদকপ্রক্ষেপণং যষ্টিকাভ্রামণং ব্যজনং বস্ত্রোদ্ধরণং বালুকাপ্রক্ষেপনং শিক্যাবলম্বনঞ্চেতি ॥

নির্গন্ধমধ্যক্তরসং তৃষ্ণাঘ্নং শুচিশীতলম্।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ।

সদোষ বারির দোষবিনাশক সাতটী উপায় আছে, যথা—নির্ম্মলি ফল, গোমেধনামক মণিবিশেষ, মৃণালের গ্রন্থি, শেওলামূল, বস্ত্রদ্বারা কলুষপদার্থের দূরীকরণ এবং মুক্তা ও মণি। (জলকুম্ভে নির্ম্মলিফল প্রভৃতি স্থাপন করিতে হয়।) এতদ্ব্যতীত ফলক প্রভৃতি পাঁচটী প্রক্ষেপণ দ্রব্য আছে এবং বায়ুবহুলস্থানে স্থাপন, ক্ষুদ্র যষ্টি জলমধ্যে সঞ্চালিত করা, জলের মধ্যে তদপেক্ষা শীতল জলের নিক্ষেপণ, বাতাস দেওয়া, বস্ত্রে বারম্বার ছাঁকিয়া লওয়া, বালুকাপ্রক্ষেপণ করা এবং শিকার উপরে রক্ষা করা জলের প্রসাধক উপায়।

গন্ধহীন, রসহীন, তৃষ্ণানাশক, শীতল, নির্ম্মল, লঘু ও প্রীতিকর বারি উৎকৃষ্ট। নদীজল সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—

তত্রনদ্যঃ পশ্চিমাভিমুখাঃ পথ্যাঃ লঘূদকত্বাৎ। পূর্ব্বাভিমুখাস্তু ন প্রশস্যন্তে গুরূদকত্বাৎ। দক্ষিণাভিমুখানাতিদোষলাঃ সাধারণত্বাৎ। তত্র সহ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং জনয়ন্তি, বিন্ধ্যপ্রভবাঃ কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগঞ্চ, মলয়প্রভবাঃ ক্রিমীন্ মহেন্দ্রপ্রভবা

শ্লীপদোদরাণি, হিমবৎপ্রভবাঃ হৃদ্রোগশ্বয়থুশিরোরোগশ্লীপদগলগণ্ডান্। প্রাচ্যাবন্ত্যা অপরবন্ত্যাশ্চার্শাংস্যুপজনয়ন্তি পারিপাত্রপ্রভবাঃ পথ্যাঃ বলারোগ্যকার্য্য ইতি ॥"

অর্থাৎ :—পশ্চিমাভিমুখ নদীসকল লঘূদকবিশিষ্ট অতএব হিতকর। দক্ষিণাভিমুখ নদীসকল অতিদোষবর্দ্ধক নয়, কারণ তাহাদের জল সাধারণ। সহ্যপর্ব্বতপ্রভব নদীসমূহ কুষ্ঠরোগ জন্মায়, বিন্ধ্যপ্রভব নদীসকল কুষ্ঠ ও পাণ্ডুরোগ, মলয়প্রভব নদী ক্রিমী, মহেন্দ্র-প্রসূত নদীসমূহ শ্লীপদ (গোদ) ও উদররোগ, হিমালয়নিঃসৃত নদীসকল হৃদ্রোগ, শোথ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ জন্মায়। প্রাচ্যাবন্তী ও অপরাবন্তী-প্রভব নদী জল অর্শরোগের সৃষ্টি করে। পারিপাত্রপ্রভব নদীসমূহের জল বল ও আরোগ্যপ্রদ, অতএব হিতকর।

১। নদ্যঃ শীঘ্রবহালঘ্বাঃ প্রোক্তা যাশ্চামলোদকাঃ।
গুর্ব্বঃ শৈবালসঞ্ছন্নাঃ কলুষামন্দগাশ্চযাঃ ॥

২। প্রায়েন নদ্যো মরুষু সতিক্তা লবণান্বিতাঃ।

৩। ঈষৎ কষায়া মধুরা লঘুপাকা বলেহিতাঃ ॥

তত্র সর্ব্বেষামেব ভৌমানাং গ্রহণং প্রত্যুষসি, তত্রহ্যমলত্বং শৈত্যঞ্চাধিকং ভবতি স এব চাপাং পরোগুণ ইতি।

১। দ্রুতগতিশীলা (খরস্রোতা) এবং পরিস্কৃতজলবিশিষ্ট নদীর জল লঘু এবং শেয়ালাব্যাপ্ত, কলুষজল ও মৃদুবেগবিশিষ্ট নদীর জল গুরু।

২। মরুভূমির নদীসমূহের জল প্রায়ই তিক্ত ও লবরসবিশিষ্ট, ঈষৎ কষায় মধুর, লঘুপাক এবং বল বিষয়ে হিতকর। সমস্ত প্রকার ভূমিস্থ বারিই অতি প্রভাতে গ্রহণ করা বিধেয়, কারণ প্রভাতে জল অমল ও শৈত্যগুণাধিক থাকে। ইহা জলের শ্রেষ্ঠগুণ। নানাবিধ জলের গুণ ও আময়িক ব্যবহার সম্বন্ধে সুশ্রুত বলেন—

৩। দিবার্ককিরণৈর্জুষ্টং নিশায়ামিন্দুরশ্মিভিঃ।
অরূক্ষমনভিষ্যন্দি তৎতুল্যং গগনাম্বুনা ॥

৩। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ সংস্পৃষ্ট এবং রজনীতে চন্দ্রকিরণ-সেবিত বারি অরুক্ষ এবং অনভিষ্যন্দি হয়; অতএব সেই বারি গগনাম্বুতুল্য (বৃষ্টির জলের মত।)

১। গগনাম্বু ত্রিদোষঘ্নং গৃহীতং যৎ সুভাজনে।

২। রক্ষোঘ্নং শীতলং হ্লাদ জ্বরদাহবিষাপহম্।

চন্দ্রকান্তোদ্ভবং বারি পিত্তঘ্নং বিমলং স্মৃতম্ ॥

৩। মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
ভ্রমক্লমপরীতেষু তমকে বমথৌ তথা ॥
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তেচ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে ॥

৪। পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মাতে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃ শুদ্ধে নবজ্বরে।
হিক্কায়াং স্নেহপীতেচ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

৫। নাদেয়ং বাতলং রুক্ষং দীপনং লঘু লেখনম্।
তদভিষ্যন্দি মধুরং সান্দ্রং, গুরুকফাবহম্ ॥

বঙ্গানুবাদ।

১। উৎকৃষ্ট (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) পাত্রে গৃহীত বৃষ্টির জল ত্রিদো.- (বায়ু, পিত্ত, কফ) নাশক, বলকর, রসায়ন, ও মেধাবৰ্দ্ধক; সুপাত্রে গৃহীত হইলেই এইরূপ গুণকর হয়।

২। চন্দ্রকান্ত-মণি-সম্ভূত জল শীতল, আনন্দদায়ক, জ্বর, দাহ ও বিষ-নাশক, পিত্তঘ্ন ও অতি নির্ম্মল।

৩। মূর্চ্ছারোগে, পিত্ত ও উষ্ণজনিত রোগে এবং বিষজ ও রক্তজ পীড়ায় এবং মদাত্যয় রোগে, শ্রম ও ক্লান্তিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, তমকশ্বাসে, বমনে ও ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তরোগে শীতল জল উপকারি।

৪। পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) বাত, গলগ্রহ ও উদরাধ্মান রোগে অবিশু.. কোষ্ঠে, তরুণজ্বরে, হিক্কাতে, স্নেহপীত রোগী শীতল জল ত্যাগ করিবে।

৫। নদম্বজল বায়ুবৰ্দ্ধক, রুক্ষ, জঠরাগ্নির দীপ্তিকর, লঘু, দোষনাশক, অভিষ্যন্দি, মধুর, অপেক্ষাকৃত ঘন, গুরু ও কফকর।

১। তৃষ্ণাঘ্নং সারসং বল্যং কষায়ং মধুরং লঘু।
তাড়াগং বাতলং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ ॥

২। বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং সক্ষারং কটুপিত্তলম।
সক্ষারং পিত্তলং কৌপং শ্লেষ্মঘ্নং দীপনং লঘু ॥

৩। চৌণ্ডমগ্নিকরং রুক্ষং মধুরং কফকৃন্ন চ।
কফঘ্নং দীপনং হৃদ্যং লঘু প্রস্রবণোদ্ভবম্ ॥

৪। মধুরং পিত্তশমনমবিদাহ্যৌদ্ভিদং স্মৃতম্।
বৈকিরং কটু সক্ষারং শ্লেষ্মঘ্নং লঘু দীপনম্ ॥

৫। কৈদারং মধুরং প্রোক্তং বিপাকে গুরু দোষলম্।
তদ্বৎ পাল্বলমুদ্দিষ্টং বিশেষাদ্দোষলন্তুতৎ ॥

বঙ্গানুবাদ।

১। সরোবরজল তৃষ্ণাঘ্ন, বলকর, কষায় ও মধুর-রসবিশিষ্ট এবং লঘু। তড়াগজল-বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায়রস এবং কটু-বিপাক।

২। পুষ্করিণীজল বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, কটুরস এবং পিত্তবর্দ্ধক কূপজল ক্ষাররসযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক, জঠরাগ্নির দীপ্তিকর এবং লঘু।

৩। চৌণ্ট্য জল (কূপ সন্নিহিত ক্ষুদ্র জলাশয়স্থ) জঠরাগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, মধুর কিন্তু কফকর নহে। প্রস্রবণোদ্ভব জল কফনাশক, জঠরাগ্নির দীপ্তিকর, হৃদয়ের প্রীতিকর এবং লঘু।

৪। ঔদ্ভিদ জল—মধুররস, পিত্তনাশক, অবিদাহি। ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল—কটুরস, ঈষৎ ক্ষার যুক্ত, শ্লেষ্মনাশক, লঘু এবং জঠরাগ্নি-দীপ্তিকর।

৫। ক্ষেত্রস্থ জল—মধুররস, বিপাকে (পরিপাকে) গুরু এবং দোষ-বর্দ্ধক। "ডোবার জল" ক্ষেত্রস্থ জলের সম গুণকর, কিন্তু তদপেক্ষাও অধিকদোষবর্দ্ধক।

১। সামুদ্রমুদকং বিস্রং লবণং সর্ব্বদোষকৃৎ।
অনেকদোষমানূপং বার্য্যভিষ্যন্দি গর্হিতম্ ॥

২। এভিদোষৈরসংযুক্তং নিরবদ্যন্তু জাঙ্গলম্।
পাকে বিদাহি তৃষ্ণাঘ্নং প্রশস্তং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥

৩। দীপনং স্বাদুশীতঞ্চ তোয়ং সাধারণং লঘু।
কফ-মেদোঽনিলামঘ্নং দীপনং বস্তিশোধনম্ ॥

৪। শ্বাসকাশজ্বরহরং পথ্যমুষ্ণোদকং সদা।

৫। যৎক্কাথ্যমানং নির্ব্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলং লঘু।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু তত্তোয়ং গুণবৎ স্মৃতম্ ॥

৬। ন চ পর্য্যুষিতং দেয়ং কদাচিৎ বারি জানতা ॥
অম্লীভূতং কফোৎক্লেশি নহিতং তৎপিপাসবে ॥

বঙ্গানুবাদ।

১। সমুদ্রবারি বিস্র, (চিতাধূমের গন্ধবিশিষ্ট) লবণরস ও সর্ব্বদোষকর

নিম্নদেশস্থ জল (বদ্ধ বিল প্রভৃতির জল) বহুদোষ-দুষ্ট, অভিষ্যান্দ, অতএব পান করা গর্হিত।

২। জাঙ্গল বারি—উপরিউক্ত সমস্ত দোষযুক্ত নয় অতএব অনিন্দ্য, বিদাহপাক, তৃষ্ণানাশক এবং আনন্দদায়ক।

৩। সাধারণ বারিঃ—দীপন, স্বাদু, শীতল ও লঘু। উষ্ণোদক, কফ, মেদ, ও বায়ুনাশক, দীপন ও বস্তিশোধক।

৪। যে জল অগ্নি সহযোগে সিদ্ধ করিয়া চারি ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট এবং ফেনরহিত হয়, সেইরূপ উষ্ণোদকই পানের পক্ষে প্রশস্ত।

৫। উষ্ণোদক পর্য্যুষিত (বাসি) অবস্থায় কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ সে জল অম্লরসবিশিষ্ট হইয়া কফবর্দ্ধক হয়।

১। মদ্য-পানাৎ সমুদ্ভূতে রোগে পিত্তোত্থিতে তথা।
সান্নিপাতসমুত্থেচ শৃত শীতং প্রশস্যতে॥

২। স্নিগ্ধং, স্বাদু হিমং হৃদ্যং দীপনং বস্তিশোধনম্।
বৃষ্যং পিত্তপিপাসাঘ্নং নারিকেলোদকং গুরু॥

৩। দাহাতিসার-পিত্তাসৃঙ্মূর্চ্ছা-মদ্যবিষার্ত্তিষু।
শৃতশীতং জলং শস্তং তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দি-শ্রমেষুচ।

৪। অরোচকে প্রতিশ্যায়ে প্রসেকে শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মন্দাগ্নাবুদরে কুষ্ঠে জ্বরে নেত্রাময়ে তথা।
ব্রণেচ মধুমেহে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ।

বঙ্গানুবাদ।

১। মদ্যপান-জনিত, পিত্ত সম্ভূত এবং সন্নিপাতজনিত ব্যাধিতে উষ্ণজল, শীতল করিয়া ব্যবহার করা প্রশস্ত।

২। নারিকেলজল—স্নিগ্ধ স্বাদু, হিম, হৃদয়ের হিতকর, জঠরাগ্নির দীপ্তিকর, বস্তিশোধক, শরীরের স্থূলতা-সম্পাদক এবং পিত্ত ও পিপাসা-নাশক।

৩। দাহ, অতিসার, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, মদ্যপান-জনিত ব্যাধি, বিষপীড়া তৃষ্ণার্ত্তি, বমন এবং শ্রমরোগে উষ্ণোদক শীতল করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

৪। অরোচক, প্রতিশ্যায় (নাসাস্রাব) প্রসেক, শোথ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, উদর, কুষ্ঠ, জ্বর, চক্ষুরোগ, ব্রণ ও মধুমেহরোগে অতি অল্পপরিমাণ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

জলের দোষ গুণ সম্বন্ধে মহামুনিসুশ্রুতের এই সকল উপদেশ মানিয়া চলিলে অনেক ব্যাধির কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য—শ্রীউষানাথ কাব্যতীর্থ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামিচ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে অর্জ্জুন, অহং তপামি (অহং আদিত্যাদিরূপঃ ভুত্বা রশ্মিভিঃ নিদাঘকালে জগতস্তাপং করোমি) অহং বর্ষং (প্রাবৃষি) উৎসৃজামি (বিমুঞ্চামি) নিগৃহ্ণামিচ (আকর্ষয়ামি উৎসৃজ্য পুনঃ নিগৃহ্ণামি) অমৃতং (জীবনং) মৃত্যুশ্চ (নাশঃ) সত্ (স্থূলং দৃশ্যং) অসত্ চ (সূক্ষ্মং অদৃশ্যং) অহমেব (এবং মত্বা মামেব বহুধা উপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ।) ১৯

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন, আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই জল বর্ষণ করি, আমি জল আকর্ষণ করি ; আমিই অমৃত ও মৃত্যু, আমিই সত্ ও অসত্। ১৯

আলোচনা। সর্ব্বভূতাশ্রয় ভগবান্ সূর্য্যরূপে জগৎকে উত্তপ্ত করেন। আষাঢ়াদি মাসচতুষ্টয় বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সরস ও শস্যোৎপাদনোপযোগী শক্তি প্রদান করেন এবং কার্ত্তিকাদি আট মাস জল আকর্ষণ করিয়া ভূমিকে বপনোপযোগী করেন। ভগবদিচ্ছায়ই জীবের জীবন ও মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়—তিনিই জীবের জীবন ও মৃত্যু। সর্ব্বভূতে তাঁহার বিদ্যমানতাহেতু তিনি সত্ এবং বস্তুর ব্যক্তভাবের অনিত্যতাহেতু তিনি অসত্। পূর্ব্বোক্ত ১৫শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বহুপ্রকারে লোকে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে। ১৫শ শ্লোক হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবানের বহুধা মূর্ত্তিতে উপাসনা কথিত হইল। ১০

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

সান্বয়ব্যাখ্যা। ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদ-ত্রয়োক্তক্রিয়ানুষ্ঠান-পরায়ণাঃ) যজ্ঞৈঃ মাং (পরমেশ্বরং) ইষ্ট্বা (পূজয়িত্বা) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমরসং পিবন্তিতে সোমপাঃ) পূতপাপাঃ (সোমপানেন শোধিতপাপাঃ) সন্তঃ স্বর্গতিং (স্বর্গগমনং) প্রার্থয়ন্তে (যাচন্তে) তে পুণ্যং (পুণ্যফলরূপং) সুরেন্দ্রলোকং

(স্বর্গং) আসাদ্য (সংপ্রাপ্য) দিব্যান্ (স্বর্গীয়ান্) দেবভোগান্ অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে) ২০

বঙ্গানুবাদ। ঋগাদি বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ কাম্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আমার পূজা করিয়া সোমরস পান করতঃ নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ-কামনা করেন। সেই যজ্ঞকারী সকাম পুরুষগণ স্বর্গলাভ করিয়া স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ২০

আলোচনা। ঋক্‌সামযজুর্বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানকারিগণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাকে আমার স্বরূপে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া, স্বর্গসুখ-ভোগের কামনা করেন ও ইন্দ্রাদিলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করেন। ভগবানের নানাবিধ উপাসকের মধ্যে সকাম উপাসক কিরূপ গতি লাভ করেন—তাহাই এ শ্লোকে উক্ত হইল। ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

সান্বয়ব্যাখ্যা। তে তং (প্রার্থিতং) বিশালং (বিস্তীর্ণং) স্বর্গলোকং (তত্‌সুখং) ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে (বৈদিকযজ্ঞাদিকৃতপুণ্যে ক্ষীণে) মর্ত্তলোকং (ইমং) বিশন্তি (আবিশন্তি) (এবং (পুনরেব) ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ (বেদত্রয়-বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ) কামকামাঃ (কামান্ কাময়ন্তে কামকামাঃ) গতাগতং (গমনাগমনং) লভন্তে ২১

বঙ্গানুবাদ। প্রার্থিত সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে তাঁহাদের পুনরায় মর্ত্তলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই প্রকার যাঁহারা স্বর্গ-কামনায় বৈদিক ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের সংসারে বার-বার যাতায়াত করিতে হয়। ২১

আলোচনা। ভগবান্ ৭ম অধ্যায়ে বিংশ শ্লোকে বলিয়াছেন, যাঁহারা কামনা-শীল তাঁহারা অন্য দেবতার উপাসনা করেন। সকাম পুরুষগণ পুণ্যফলে স্বর্গলাভ করিলেও চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন না। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রাদিদেবতার উপাসনা করিয়া যে পরিমাণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ নির্দ্দিষ্ট কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা নিষ্কামভাবে ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহারা

ব্যতীত অন্য সকাম পুরুষেরা যতই পুণ্য সঞ্চয় করুন না কেন, তাঁহাদের সংসারে যাতায়াত করিতে হইবে।

"মীমাংসাদর্শনের" "অর্থসংগ্রহ"কার তাঁহার অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে বলিয়াছেন—"সোহয়ং ধর্ম্মো যদুদ্দিশ্য বিহিতস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ" অর্থাৎ বেদোক্ত ধর্ম্ম স্বর্গাদি-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে স্বর্গাদি-ফল-সাধক হয়, কিন্তু ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে মুক্তির কারণ হয়"। ২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥ ২২

সান্বয়ব্যাখ্যা। অনন্যাঃ (মদ্ব্যতিরেকেণ অন্যত্ কাম্যং ন অস্তি যেষাং তে) তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং) যোগক্ষেমং (যোগং অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং ক্ষেমং তত্‌রক্ষণং মোক্ষং বা) অহং বহামি। (তৈঃ অপ্রার্থিতঃ অপি অহমেঃ) প্রাপয়ামি। ২২

অনুবাদ। যাঁহারা অনন্যচিত্তে আমাকেই উপাসনা করেন, আমি সেই নিত্য মৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ বা মোক্ষ সম্পাদন করি। ২২

আলোচনা। ভগবান্ ভক্তের সমস্ত ভারই গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েই চিন্তা করেন না, নিজ দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহেরও কোনও ভাবনা করেন না, ভগবান্ তাঁহার সমস্ত বিষয়েরই ব্যবস্থা করিয়া দেন। লোকে কথায় বলে "সৃষ্টি ক'রেছেন, যিনি আহার দেবেন তিনি"। সত্য বটে, জীব মাত্রেই নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদন পায়, কিন্তু সকলকেই তদুপার্জ্জনে যত্ন-চেষ্টা করিতে হয়। ভক্ত সাধক তত্তাবৎ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহা সঙ্কুলন করিয়া দেন। একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বর-নির্ভরশীলতার ফলে ভগবৎকৃপায় বিনাচেষ্টায় সকলই পাইয়া থাকেন।

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
বিশ্বম্ভরো গুরুর্যেষাং কিং দাসান্ সমুপেক্ষতে॥"

বিষ্ণুপরায়ণগণ নিজ নিজ আহারাচ্ছাদনের জন্য বৃথা চিন্তা করেন, কেননা, যিনি বিশ্ব চরাচরের সকল প্রাণীকে ভোজন দেন, তিনি কি নিজ অনুগত সেবকদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন? যাঁহারা তাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছেন, তিনি সেই সাধু সাধকদিগের একমাত্র আশ্রয়।

পরমহংস রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন "বকলমার চেয়ে সহজ সাধন আর নাই। বকলমার মানে নির্ভরতা—আমার ব'লে কোন অভিমান না থাকা।"

"যে ভগবান্‌কে চায়, সে একবারেই তাঁহার কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। সে আর নিজের হিসাব বুদ্ধি রাখেনা বা কি খাবো কি পরবো কি ক'রে দিন যাবে— এসব কোন ভাবনা ভাবেনা।"

"এক ভক্তকে এক ধোপা মেরেছিল। ভক্ত ধোপাকে কিছু না ব'লে নারায়ণের উপর ভার দিলে। নারায়ণ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, অমনি উঠে বেরিয়ে এলেন। আর একটু বাদেই লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত। লক্ষ্মী সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারায়ণ বল্লেন, এক ভক্তকে এক ধোপা মেরেছিল, ভক্ত ভার দিয়েছিল, তাই যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভক্ত খানিক পরে ভাবিল যে, ধোপাকে কিছু না বলে যাওয়া ভাল হয়না, তাই ফিরে এলেম। যে নিজে ভার নিলে, তার ভার আর আমার নেবার আবশ্যক নাই। তাঁর শরণাগত হও, তা হ'লে সব পাবে। তিনি সদ্বুদ্ধি দিবেন, সব ভার লবেন।" ২২

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্‌॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে কৌন্তেয় যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ (অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা) অন্বিতাঃ (অযুক্তাঃ) (সন্তঃ) (তত্তদ্দেবতাঃ) যজন্তে (পূজয়ন্তি) তে অপি মামেব যজন্তি (সত্যং কিন্তু) অবিধিপূর্ব্বকং (মোক্ষপ্রাপকবিধিং বিনা। তে স্বর্গাদি ফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্তন্তে)

হি (যস্মাত্‌) অহং সর্ব্ব যজ্ঞানাং (সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং) ভোক্তা (তত্তদ্দেবতাত্বেন ভোক্তা) প্রভুঃ চ (স্বামী ফলদাতাপি) তে তু মাং তত্ত্বেন (যথাবৎ তদ্‌ভাবেন) ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি। (পুনরাবর্ত্তন্তে) ২৪

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়, যাঁহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকেন। ২৩

যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতা, কিন্তু আমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না থাকায় জীবগণ সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে। ২৪

আলোচনা। ভগবান্‌ বহু শ্লোকে বলিয়াছেন যে, জগতে চক্কার্টার [illegible]

কিছু আছে, আমি সে সকল বস্তুতেই বিগুমান আছি। যদি সকল বস্তুতেই তাঁহার বিগুমানতা থাকে, তবে অন্য দেবতায় ও তাঁহার বিগুমানতা আছে। বিশেষ ভগবান্ ৭ম অধ্যায়ে ২২শে শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে সকল সকামভক্ত অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহাদের প্রার্থিত ফল তত্তদ্দেবতারূপে আমিই দিয়া থাকি। এমত অবস্থায় ভগবানের পূজা করিলে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা অন্যদেবতার পূজা করিলে মুক্তি হইবে না কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয়-নিরাকরণ জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, মুক্তিদাতা তিনি (ভগবান) ব্যতীত অন্যে নয়। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা অন্য দেবতার উপাসনায়ও ভগবানের উপাসনা হয় এবং তিনি তৎসমুয়ের ফলদাতা ও স্বামী সত্য, কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ মোক্ষ-বিধি ব্যতিরেকে উপাসনা। জ্ঞানোদয় না হইলে জীব ভগবান্‌কে চিনিতে পারে না। অজ্ঞানীর ভক্তি থাকিতে পারে। অজ্ঞানী ভক্তই ভগবানের একত্ব না জানিয়া ভেদ-বুদ্ধিতে নানা দেবতার উপাসনা করে। জ্ঞানহীন ভক্তি, জীবকে মুক্তিলাভের অধিকারী করিতে পারেনা। সুতরাং জীব যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যফল-শেষে জগতে পুনরায় গতায়াত করে। ২৩। ২৪

শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত।

———:০:———

গীতার ধর্ম্ম।

স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ
নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ-ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ। লৌকি ব্যবস্থার বিরোধ না হয়, এমন ভাবে অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ঐহিক পারত্রিক সুখলাভার্থ অনুষ্ঠেয় যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম; আর উ ভোগাদিতে বিগতস্পৃহ হইয়া জন্ম মৃত্যু শোক প্রভৃতির কারণ স্বরূপ অজ্ঞানে উচ্ছেদ-সাধন-পূর্ব্বক নির্ব্বাণপদপ্রাপ্তির নিমিত্ত সংসারবিরাগী পরমহংস

যে শমদমাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, উহাই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম। প্রথমে সুখ ও পরে নির্ব্বাণ প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের ফল। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল কেবলই নির্ব্বাণ। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম জগৎরক্ষার কারণস্বরূপ। যে ধর্ম্মের দ্বারা প্রাণিগণের পরম শ্রেয়ঃসাধন হইতে পারে, এরূপ ধর্ম্মই ভগবান্ গীতাশাস্ত্রে প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে মোক্ষলাভই প্রাণিগণের পরম শ্রেয়ঃ। এই মোক্ষলাভের উপদেশ দেওয়াই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। মোক্ষ-লাভের উপায় কি? সত্য-ধর্ম্ম পালন করা। সত্য-ধর্ম্ম কি? সংসারের অত্যন্ত-নিবৃত্তিরূপ পরমনিঃশ্রেয়সই সত্যধর্ম্ম। ইহা আবার সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস-পূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতে প্রকাশ হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত সহজ কর্ম্মসকল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই মানবের পরম-নিঃশ্রেয়স-লাভ হইয়া থাকে—ইহাই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং ইহাকেই গীতার্থ-ধর্ম্মরূপে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ই অনুগীতাতে ও মহাভারতে (অশ্বমেধ-পর্ব্বে) বলিয়াছেন,—

"সহি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যে হেতু সেই ধর্ম্মই ব্রহ্মপদ জানিবার পক্ষে সুপর্য্যাপ্ত। এই ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান, ইহা হইতে ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে পরিশেষে ইহাই বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" অর্থাৎ অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও।

জগতের মঙ্গলার্থ যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, উহা ফলাভিসন্ধি-পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় এবং জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা প্রদান করে বলিয়া জ্ঞানোৎপত্তিরও কারণ হয়, সুতরাং ফলতঃ মুক্তিরও হেতু হইয়া থাকে। গীতাশাস্ত্রে উভয়বিধ ধর্ম্মই উক্ত হইয়াছে। গীতা বলিতেছেন, সত্ত্ব—রজঃ ও তমঃ এই তিন হইতে কেহই মুক্ত নহেন যথা—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। এই প্রকৃতির বৈষম্য হইতেই সৃষ্টির বিকাশ হয়। সকল বস্তুই ত্রি-গুণসমন্বিত সুতরাং মোক্ষের সম্ভব হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে যে; এই সংসার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আবাসভূমি। এই চারিটী বর্ণ ব্যতিরেকে অপর কোন বর্ণই

নাই। তাহাদের ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে বিহিত হইয়াছে, এবং সেই ধর্ম্মই তাহাদিগের প্রকৃতিজাত ধর্ম্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সত্বগুণাবলম্বীকে ব্রাহ্মণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম সাত্বিকভাবাপন্ন—ইত্যাদি। এই অনাদিকালবিহিত কর্ম্মকেই "স্বভাবজ কর্ম্ম" বলা যায়। কাহার কি স্বভাবজ কর্ম্ম, তাহা গীতা বলিয়াছেন।

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥

স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদে কর্ম্মণি অভিরতঃ তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কায়েন্দ্রিয়ানাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং লভতে প্রাপ্নোতি ততোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ। কিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানতএব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং লভন্তে? ন, কথং তর্হি? স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু। অর্থাৎ যথোক্ত-লক্ষণভেদবিশিষ্ট স্ব স্ব কর্ম্মে (পূর্ব্বকথিত স্বরূপানুসারে) অভিরত অর্থাৎ তৎপর হইয়া মনুষ্য সংসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। সংসিদ্ধি কাহাকে বলে? স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শরীর ও ইন্দ্রিয়-সকলের অশুদ্ধিক্ষয় হইলে যে জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা হয়, উক্ত যোগ্যতাই সংসিদ্ধি-নামে খ্যাত। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, তবে কি স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই সংসিদ্ধি হয়? না, তাহা নহে। তবে কি প্রকারে হয়? যেরূপে মানুষ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; পুনরায় বলিতেছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্মকুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেয়স্কর। স্বভাবনিয়ত শব্দের অর্থ—স্বভাবের দ্বারা নিয়ত। পূর্ব্বে 'স্বভাবজ' শব্দটি যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, এস্থলে স্বভাবনিয়ত শব্দটিও সেই অর্থেই প্রযুক্ত। যেমন বিষজাত কৃমির পক্ষে বিষ দোষজনক নহে, তদ্রূপ মানব স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম করিলে, পাপ প্রাপ্ত হয় না।

যাঁহার পক্ষে যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট, তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম এবং তাঁহাই তাহার সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। এমন কি, তাহাতে বৈগুণ্য ঘটিলেও তাহাই অনুষ্ঠেয়। এই জন্যই ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের ব্রাহ্মণোচিত অহিংসাদি-ভাব স্বীকার করা কর্ত্তব্য হইতেছে না বলিয়া, ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়জনোচিত কর্ম্মই

তাঁহার স্বভাবজ, সুতরাং তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠানোপযোগী। স্বভাবজ কর্ম্ম প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবিশেষ। উহা মনুষ্যকে জন্মের সহিত আশ্রয় করিয়া থাকে। এই প্রকার স্বভাবজ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম হিংসাপ্রভৃতিদোষদুষ্ট হইলেও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপফলোৎপাদক হওয়াত দূরের কথা, পরন্তু কল্যাণ-সাধকই হইয়া থাকে। স্বভাবজ কর্ম্ম হিংসা-দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাগ করিলে পরধর্ম্ম-স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পরধর্ম্মেও হিংসা-দোষ আছে। জৈনগণ বহু চেষ্টা করিয়াও জীব-হিংসা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা জীবহিংসা হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য পানীয় পান করিবার সময় পানীয়ের সূক্ষ্মকীট-হিংসার ভয়ে পানপাত্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পান করেন। ইহাতেও জীবহিংসার নিবৃত্তি হয় না। কারণ, জলীয় কীট জলের অভাবে জীবিত থাকিতে পারেনা এবং বস্ত্রখণ্ডে মুখ সংলগ্ন করিলে বস্ত্রখণ্ডস্থিত কীটাণুগণও নিহত হয়—সুতরাং হিংসা-নিবারণ হইল কিরূপে? কর্ম্মমাত্রেরই বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে কোনও না কোনও দোষ আছেই। কর্ম্মের দোষপরিহার কোনরূপেই সম্ভব নহে; কারণ, তাহার জন্য পৃথক কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক, সুতরাং তাহার শেষ নাই। এরূপে কেহ কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। যে কর্ম্ম সহজ বা স্বভাবজ, তাহা অনায়াসসাধ্য এবং তাহাতে ভ্রান্তি-সম্ভাবনা নাই। সহজ কর্ম্মই অনুষ্ঠেয় এবং তদনুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান। জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইয়াও কর্ম্মত্যাগ করা শ্রেয়ঃ নহে। সামান্যভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধি অর্থাৎ সকলপ্রকার আসক্তিনিমিত্ত ভোগ্যবস্তুতে সঙ্গ-রহিত জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ ব্যক্তিই সম্যগ্‌দর্শনের ফলস্বরূপ সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের দ্বারা পরমাসিদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মজনিত সিদ্ধি হইতে বিলক্ষণরূপ সদ্যোমুক্তিতে অবস্থানরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গীতা আরও বলিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি-রহিত হইয়া ও বাসনা পরিহার করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম, ইহা হইতেই অপূর্ব্ব বিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদাকুর্ব্বাণোমদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

আমাকে যে বিশেষরূপে সদা আশ্রয় করিয়া থাকে, সে সকল কর্ম্ম করিলেও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৎপর হইয়া সকল কর্ম্ম আমাকে মনে মনে সমর্পণ কর এবং বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ আমাকেই চিন্তা করিতে থাক।

শাস্ত্র বলেন—এই কর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ।

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেবচ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥

বৈদিককর্ম্ম দুইপ্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্তকর্ম্মফলে সুখ অভ্যুদয়াদি লাভ হয়, নিবৃত্তকর্ম্মফলে মুক্তিলাভ হয়। ইহলোক বা পরলোক সম্বন্ধে কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্তকর্ম্ম বলে; জ্ঞানপূর্ব্বককৃত নিষ্কাম কর্ম্মকে নিবৃত্তকর্ম্ম বলে। প্রবৃত্তকর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগের সমান হওয়া যায়, আর নিবৃত্তকর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করা যায়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

গীতা পুনরায় বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণিচ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥

যে ব্যক্তি কর্ম্মেতে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মেতে কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, সেইব্যক্তি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবং সেই ব্যক্তিই যোগী ও সকল প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

কর্ম্মে অকর্ম্ম অথবা অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শন কিরূপে হইতে পারে, এ প্রকার আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা "অকর্ম্ম" পরমার্থসৎ ব্রহ্ম, তাহাই অজ্ঞানাবৃত লোকের সমক্ষে কর্ম্মস্বরূপে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে, এবং "কর্ম্ম" অর্থাৎ প্রপঞ্চ অকর্ম্মের ন্যায় পরমার্থসৎ ব্রহ্মের ন্যায় প্রতীত হয়; সুতরাং ভগবদ্বাক্য বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যে হোম কর, যে দান কর, এবং যে তপস্যা কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ কর। এইভাবে কর্ম্ম করিলে তুমি শুভাশুভ-ফলের হেতু কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এই প্রকারে সন্ন্যাসযোগের সহিত তোমার অন্তঃকরণ যুক্ত হইলে তুমি বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিতে পারিবে, অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতেই বিমুক্তিলাভ করিবে এবং দেহাবসানে আমাকে অর্থাৎ মদ্‌ভাবকে প্রাপ্ত হইবে।

দেখাযায়—গীতা স্মৃতিশাস্ত্রের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণই গীতোপদিষ্ট ধর্ম্মলক্ষণ। মনু বলিয়াছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্যলক্ষণম্ ॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ—এই চারিটীকে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, গীতা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারও এই সকল লক্ষণ। মনু আরও বলিয়াছেন—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখম্:

শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ হইয়া থাকে। অতএব এই বাস্তব-গুণ-কথন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, "শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠেৎ" অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে—এইরূপ বিধি কল্পিত হইয়াছে। পুনশ্চ

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥

বেদত্রয়ের অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত, সায়ং প্রাতঃ হোম, ব্রহ্মচর্য্য-সময়ে ঋষিদেব-পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ, জ্যোতিষ্টোমাদি অপরাপর যজ্ঞ, ইহারা মানবদেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া থাকে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া জানাযায় যে, গীতা প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণরূপ উভয়বিধ ধর্ম্মের কথা বলিলেও নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মই প্রকৃত অভিমত, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। তাই ভগবান্ সকল ধর্ম্মের বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া অবশেষে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

গীতা নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মকেই মোক্ষলাভের চরম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

—:০:—

শিক্ষাষ্টকম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

পুনরায় নামমাহাত্ম্য কহিয়াছেন—

শ্রদ্ধয়া হেলয়ানাম রটন্তি মমজন্তবঃ।
তেষাং নাম সদাপার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম॥
ন নামসদৃশংজ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতং।
ন নামসদৃশংধ্যানং ন নামসদৃশং ফলং॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশংপুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ॥

কিঞ্চ—

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমাস্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ॥
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥
আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে।

আরও—

নামযুক্তান্ নরান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধোভবতি যোনরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তোভবার্জ্জুন॥

যে ব্যক্তি নাম-সঙ্কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়েন, তিনি পরম-স্থানে গমন করেন এবং আমার সহিত আনন্দানুভব করেন।

তজ্জন্য হে কৌন্তেয়! দৃঢ় মনে নামসকলের সেবা কর। যে ব্যক্তি নাম করেন, তিনি আমার প্রিয়; হে অর্জ্জুন, তুমি নামযুক্ত হও।

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যোমাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবন্ জপত্যনুদিনং মরণে ঋণীব
পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় প্রদদাম্যভীষ্টম্॥

বিষ্ণুরহস্যে।

ভগবান্ কহিয়াছেন, হে মনুষ্যগণ! আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় "হে মুকুন্দ"! "হে নরসিংহ!" "হে জনার্দ্দন!" প্রভৃতি নাম প্রতিদিন জপ করে, সে যদি পাষাণ কিম্বা কাষ্ঠসদৃশও হয়, তাহা হইলেও তাহার মৃত্যুসময়ে তাহার ঋণীর ন্যায় তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকি।

নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি
দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি।
বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি
ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ক কৃতান্তভীতিঃ॥

স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে

যে সকল মনুষ্য, "হে নারায়ণ!" "হে নরকার্ণবতারণ!" "হে দামোদর!" "হে মধুঘাতিন্!", "হে চতুর্ভুজ!", "হে বিশ্বম্ভর!", "হে বিরজ!", "হে জনার্দ্দন," এই বলিয়া জপ করেন, তাঁহাদের জন্ম কোথায়, এবং যমের ভয়ই বা কোথায়?

বাসুদেব-জপাশক্তানপি পাপকৃতো জনান্
নোপসর্পন্তি বৈবিষ্ণা যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে।

পাপকারী ব্যক্তিসকলও যদি বাসুদেব-নাম-জপে আসক্তচিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকট বিঘ্ন কিম্বা ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আসিতে পারে না।

ক্ক নাক-পৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণং।
ক্ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে।

পুনরাগমন-রূপ স্বর্গগমনই বা কোথায় এবং অত্যুত্তম মুক্তির কারণ বাসুদেবের নামজপই বা কোথায়? অর্থাৎ ভগবন্নাম-জপের নিকট স্বর্গ-সুখ-ভোগ অতি তুচ্ছ ফল; (কারণ পুণ্যফলে স্বর্গভোগ ঘটিলে পুণ্যক্ষয় হইলেই স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়) সুতরাং নাম-জপই মুক্তির অত্যুত্তম ফল স্বরূপ।

স্বপ্নেঽপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিতপাপরাশেঃ।
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥

আদিপুরুষ জনার্দ্দনের নাম স্বপ্নে স্মরণ করিলেও যখন সঞ্চিত পাপরাশি পলায়ন করে, তখন যত্নপূর্ব্বক আদিপুরুষ জনার্দ্দনের নামকীর্ত্তন করিলে যে সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয় হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি?

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপনিশ্চিতং।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্ণাম কলৌযুগে ॥ লঘুভাগবতে।

হে রাজন্! কলিযুগে যাঁহারা হরিনাম স্মরণ করেন কিম্বা স্মরণ করাইয়া দেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্, কৃতার্থ এবং ধন্য।

প্রয়াণে চাপ্রয়াণেচ যন্নামস্মরণান্নৃণাং।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥

পদ্মপুরাণে দেবহূতি-স্তবে।

মৃত্যুকালে বা জীবদ্দশায় যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের সদ্যঃ পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই চিৎস্বরূপকে নমস্কার করি।

যদনুধ্যানদাবাগ্নিদগ্ধকর্ম্মতৃণঃ পুমান্।
বিশুদ্ধঃ পশ্যতি ব্যক্তমব্যক্তমপি কেশবম্।
তদস্য নাম জীবস্য পতিতস্য ভবাম্বুধৌ
হস্তাবলম্বদানায় প্রবীণো নাপরোহরেঃ ॥

মনুষ্য, তাঁহার ধ্যানরূপ দাবাগ্নি দ্বারা যখন কল্মষময় তৃণ দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া অব্যক্ত কেশবকে ব্যক্তরূপে দর্শন করেন, তখন ভবসাগরে পতিত জীবের হস্তাবলম্বদান-নিমিত্ত হরিনাম ব্যতিরেকে আর অন্য শ্রেষ্ঠ উপায় নাই।

হরের্ণাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরং।
কীর্ত্তয়নীঞ্চ বহুধা নিস্কৃতীর্ব্বহুধেচ্ছতা॥

জাবালিসংহিতায়াং।

যাঁহারা বহু প্রকারে সুখানুভব করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের কেবল, সর্ব্বদা হরিনামজপ, হরিনামচিন্তা এবং হরিনামকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলাঘক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুল্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥

শ্রীভাগবতে ৬। ১৬। ৪৪

চিত্রকেতু কহিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! আপনার দর্শন মাত্রে মনুষ্যগণের সমুদায় পাপ নষ্ট হয়, ইহা অসম্ভব নহে। আপনার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে।

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥
ইদং কিরাটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্॥
কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দনির্ভরঃ।
ব্রহ্মানন্দমবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনাম-মাহাত্ম্যে।

পুণ্যস্বরূপ সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের অবতার-সম্বন্ধীয় একটি নামও সেইফল প্রদান করেন।

অর্জ্জুন এই নাম জপ করিয়া যুদ্ধজয়ী হইয়া পশুপাত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই শ্রীকৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় নামের মাহাত্ম্য আর অধিক কি বলিব, অর্জ্জুন ঐ নামের গুণে মানুষানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া অন্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্‌ব্রজংস্তথা।
যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধ্রুবঃ॥
দ্বারকা-মাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সম্বাদে।

কলিকালে মনুষ্য কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে অতীত সপ্ত পুরুষ এবং ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলকেই উদ্ধার করেন।

কলিযুগে যিনি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় এবং গমন করিতে করিতে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া নিত্য কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয় কৃষ্ণরূপী হইবেন।

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্॥
নৃসিংহপুরাণে।

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ!
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরং॥
প্রভাসখণ্ডে। শ্রীভগবদ্বাক্যে।

যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সগচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥
পদ্মপুরাণে—উত্তরখণ্ডে।

সত্যং ব্রবীমিতে শম্ভো! গোপনীয়মিদং মম।
মৃত্যুসঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যামবধারয়॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—শ্রীভগবদ্বাক্য।

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ইত্যন্তকালে
জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।
আত্তঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ
ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽস্তাবৃণস্থৌ॥
ভারতে।

যে ব্যক্তি অন্তকালে 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ', বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, আত্মনাম তাঁহার মুক্তির কারণ হইয়া থাকেন এবং অন্য দুটি নাম লজ্জায় অবনতমুখে ঋণীর ন্যায় থাকেন।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরি-নামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদাবিকারো
নেত্রেজলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

শ্রীভাগবতে ২। ৩। ২৪

শৌনক সূতকে কহিয়াছিলেন যে হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে এবং তজ্জনিত যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণসদৃশ কঠিন।

নাম্নি সংকীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসোন জায়তে।
সরোমপুলকং গাত্রং সভবেৎ কুলিশোপমঃ॥

ইতিহাসোত্তমে।

বিষ্ণুর নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে যে ব্যক্তির শরীর রোমাঞ্চিত না হয়, সে বজ্রতুল্য।

নামসঙ্কীর্ত্তনায়াতং পুণ্যং নোপচয়ন্তি যে।
নানাব্যাধিসমাযুক্তাঃ শতজন্মসু তে নরাঃ॥
সাহানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ॥

কাত্যায়ন-সংহিতায়াং।

যে সকল ব্যক্তি নামসঙ্কীর্ত্তনজনিত পুণ্য সঞ্চয় না করে, তাহারা শত জন্ম নানা-ব্যাধি-সমাযুক্ত হইয়া থাকে।

যে মুহূর্ত্তে কিম্বা যে ক্ষণে বাসুদেব চিন্তিত না হন, তাহাই মহৎ হানি, তাহাই মহচ্ছিদ্র তাহাই মোহ এবং তাহাই বিভ্রম।

অবমত্য চ যে যান্তি ভগবন্নামকীর্ত্তনং।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে।

যে সকল মনুষ্য ভগবানের নামসঙ্কীর্ত্তনকে অনাদর করিয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়, তাহারা সেই পাপকর্ম্ম দ্বারা ঘোর নরকে গমন করে।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

—:০:—

কবিতা ও উচ্চতত্ত্ব।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া অথবা তাঁহার যশে প্রলুব্ধ হইয়া, অনেকে উচ্চ উচ্চ তত্ত্বকথাগুলিকে পদ্যে মিলাইয়া লেখা-কেই কবিত্বের উৎকর্ষবিধান মনে করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের নোভল-পুরস্কার-প্রাপ্তির পর হইতে, মনে হয় যেন এই ভাবটি অধিকতর বিস্তারলাভ করিতেছে।

উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবকবিগণের গ্রন্থ পর্য্যন্তে অত্যুচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বকথার অভাব নাই। বাঙ্গালী কোনও কবি যে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও নূতন কথা বলিয়াছেন ইহা জানিনা। আর কতগুলি উচ্চ উচ্চ মুখস্থ করা তত্ত্বকথা বলিতে পারিলেই যে কবিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাও বোধ হয় না। একসময় লোকেরা উপাসনার মধ্যে বড় বড় কথা বলিতেন। মনে করিতেন—উচ্চকথা বলিতে পারিলেই উচ্চদরের উপাসক হওয়া যায়। ইহার পরে একজন সাধক গাহিলেন—

"কি ব'লে প্রার্থনা বল করি আর;
আমার সকল কথা ফুরাইল, ফিরিল না মন আমার।"

একদা দুইজন গ্রাম্যলোক, পরস্পরের নিকট বিনয় প্রকাশ করিতেছিল, তাহার নমুনা দিতেছি।

১ম ব্যক্তি—মহাশয় পক্ষিরাজ, আমি আপনার কাছে পিপি"

২য় ব্যক্তি—আমি আপনার নিকট দল। (পুরাতন পুষ্করিণীতে দলের উপর পিপিপক্ষী বসে)

১ম ব্যক্তি—আমি আপনার কাছে জল (জল, দলের ও নীচে থাকে)

২য় ব্যক্তি—আজ্ঞে, আমি আপনার নিকট "কেদা" (কর্দ্দম বা কাদা। কাদা জলেরও নীচে থাকে।)

১ম ব্যক্তি—আজ্ঞে আমি আপনার নিকট জেলা (জেলানামক মাছ [illegible] নীচে থাকে।)

এইরূপে দুইব্যক্তি বিনয় প্রকাশ করিতে করিতে ক্রমশঃ তলে ঢুকিতে লাগিল। অনেকের তত্ত্বকথা-লেখার ভঙ্গীও এইরূপ। ক্রমশঃ উঠিতে উঠিতে এমন স্থানে তত্ত্বটা লুকাইয়া যায় যে, তাহার আর তত্ত্ব পাওয়া যায় না। শেষে ধর্ম্ম-কথাটা একেবারেই ধর্ম্মহীন ও মর্ম্মহীন হইয়া পড়ে।

আজকাল "বিশ্বপ্রেম" ও "বিশ্বমানব" এই দুইটী কথা, ছোট বড় কবিদের রচনার বিশেষ উপাদান হইয়াছে। তাঁহারা অনেকে মনে করেন, এই তত্ত্বটা পশ্চিমের আমদানী এবং ভারতবাসীর পক্ষে একান্তই "নূতন কথা"। গী বলেন—

"অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।"

খণ্ড খণ্ড বস্তুকে অখণ্ডরূপে দেখাই সাত্ত্বিকবুদ্ধির কার্য্য। ইহা অপেক্ষা "বিশ্বপ্রেমের কথা" বা "বিশ্বমানবতত্ত্ব" আর কে কি বলিয়াছেন জানি না।

ভক্তবর সুন্দরদাস বলিয়াছেন,—

পূর্ণব্রহ্ম বাতায় দিয়া গুরু।
এক অখণ্ডিত ব্যাপক সারে॥
রাগ দ্বেখ করব আর কৌনসেঁ।
যোহি মূলে সোহি ডারে।"

গুরু আমাকে পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম অখণ্ডিত ব্যাপক এবং সার। এখন আমি কাহার সঙ্গে রাগ করি, কাহাকেই বা দ্বেষ করি। মূলে যে বস্তু, শাখাপ্রশাখায় আমি তাঁহারই প্রকাশ দেখিতেছি। ইহা অপেক্ষা বিশ্বপ্রেমের মূলমন্ত্র আর কোথায় কি আছে?

উপনিষদে, গীতায়, ভাগবতে, পুরাণে, তন্ত্রে, কবিরে, নানকে, নিশ্চলদাসে, সুন্দরদাসে, সুরদাসে, তুলসীদাসে এবং আধুনিক বৈষ্ণবশাস্ত্রে এইভাবের কোথাও অভাব নাই। শুধু কথায় নহে, চিরকালই এদেশের সাধকগণ এই ভাব জীবনে দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন।

ভক্তবর বাসুদেব দত্ত, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে,

"জগতের দুঃখে মম হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু, দেহ মোর শিরে।"

বাসুদেব জীবের পাপতাপ দেখিয়া কাতর হইয়া, তাহাদের পাপভার মস্তকে লইয়া, নিজে নরকভোগের কামনা করিলেন। বাসুদেবের নরকভোগ, অনুতাপের তাপ-ভোগ নহে। তাঁহার নরকে যমদূতেরা নিয়ত অগ্নিকুণ্ডে এবং তপ্ততৈলে জীবগণকে ভাজাভাজা করিতেছে! বাসুদেব জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য সেই নরকই চাহিলেন! তাঁহার দেবতা দূরস্থ অদৃশ্য নিরাকার ঈশ্বর নহেন, তিনি সাক্ষাতে উপবিষ্ট মূর্ত্তিমান্ ভগবান্,—এখনই "তথাস্তু" বলিয়া বাসুদেবকে নরকে পাঠাইতে পারেন—তাঁহারই কাছে প্রার্থনা করিলেন। পরের হিতের জন্য, অনেকে সম্পদ্ ও শরীর সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের কল্যাণকামনায় কেহ যে ইহকাল ও পরকাল বিসর্জ্জন দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত ত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যে ব্যক্তি বুঝিয়া পাঠ করিবেন, উচ্চ তত্ত্বকথা-উচ্চারণের বাহাদুরী করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইবে না।

যদি বলেন, তবে কি এখনকার কবিরা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কথাই বলিবেন না? আমি বলিব, বলিবেন না কেন? বলিতে জানিলে পুরাতন কথাও নূতন হয়।

"সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।"

যথাযোগ্যস্থলে দুষ্মন্তের মুখে এই কথাটা বলাইয়া কালিদাস একটা অত্যুচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই কথাটার মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সৎব্যক্তির অন্তঃকরণ অজ্ঞাতসারেও অবৈধ কার্য্য করিতে পারেনা। অন্ধকারে যদি কাহারও মুখে একটা দুর্গন্ধ বিস্বাদ বস্তু দেওয়া যায়, কিছুমাত্র বিচার বিবেচনা না করিয়া, সে যেমন উহা "থুথু" করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ সদাত্মা ব্যক্তির নিকট পাপকার্য্য মাত্রই অসহ্য হয়। অগ্নির উত্তাপ যেমন বিচার করিয়া অনুভব করিতে হয় না, ইহাও সেইরূপ। সদাত্মার এই ধর্ম্ম সহজ, যাঁহাকে ইংরেজিতে বলে (Instinct)। কালিদাস যদি এইরূপ কতগুলি তত্ত্ব লইয়া উপদেশ দিতে বসিতেন, তবে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা হইত এবং উহা একখানি সংগৃহীত

উপদেশগ্রন্থ হইতে পারিত, কিন্তু কাব্য বা কবিতা হইত না। তিনি এমনই কৌশলে এমনই যোগ্যভাবে কথাটী বসাইয়াছেন যে, সহস্র বৎসরের পুরাতন তত্ত্ব হঠাৎ নবীন হইয়া দেখা দিয়াছে। এরূপ কলা-কৌশল না থাকিলে, উচ্চ উচ্চ তত্ত্বগুলিকে পদ্যে গাঁথিয়া দিলে, সেগুলি নৈতিকবিদ্যালয়ের শিশুপাঠ্য হইতে পারে, উৎকৃষ্ট কবিতারূপে আদরণীয় হইতে পারে না।

বস্তুতন্ত্রতা।

এইরূপ মুখস্থ করা ভাব লইয়া কিছু লিখিলে, তাহাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকেনা। বিপিনচন্দ্র "বস্তুতন্ত্রতা" কথাটাকে বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত করিয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র; এরূপ একটা শব্দের অভাব ছিল। বস্তুতন্ত্রতা বলিতে কে কি বুঝেন, তাহা লইয়া আলোচনা করিব না। আমরা এই বুঝি যে, সকলকেই যে সকল ভাব ও সকল রস সম্ভোগ করিয়া লিখিতে হয় তাহা নয়, তবে ভাবের ঘরে চুরি চলেনা। যিনি আপনাকে যে ভাবের মধ্যে নিমগ্ন করিতে পারেন, তিনি যদি আত্মবিস্মৃত হইয়া লিখিতে পারেন, তবেই সে রচনায় বস্তুতন্ত্রতা থাকিল। আসল কথা, কবির মন "তদাকারাকারিত" হওয়া চাই। অভিনেতৃগণ সকলেই কিছু সকল ভাবের ভুক্তভোগী নয়, অনেক-সময়ই তাহারা বিপরীতভাবের ভুক্তভোগী, কিন্তু তাহারা যখন প্রেমের, ভক্তির, বীরত্বের ও কারুণ্যের অভিনয় করে, তখন একেবারেই আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। সেরূপ না হইলে তাহাদের অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়না। ৩০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে কোন এক বালিকাকে প্রহ্লাদ সাজিয়া অভিনয় করিতে দেখিয়াছিলাম। সে যে স্ত্রীলোক এবং প্রহ্লাদ নহে—তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেও এতই আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল যে, সে যে কে, তাহা তাহার মনেই ছিলনা। "হলো তার বাহ্যস্মৃতি-বিস্মরণ," সত্যই এরূপ হয়। সত্যই সে অন্তরে প্রহ্লাদ হইয়া গিয়াছিল। সে আপনি "পুরুষ কি প্রকৃতি" তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। আর একস্থানে দশরথের "হা রাম, তুমি কোথায়" বলিয়া মূর্চ্ছিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণের মধ্যে অনেকে "হায় হায়" করিয়া উঠিয়াছিল। এরূপ ঘটনা বিরল নয় এবং বস্তুতন্ত্রতাশূন্যও নহে। যে ভাব কৃত্রিম, তাহাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকিতেই পারেনা। ভাষা, ছন্দ, ঝঙ্কার ও সুর এবং অলঙ্কার—ইহারা প্রকৃতভাবকে ভূষিত করিয়াই প্রকাশিত করে, উহাতে রসাভাস কিম্বা অন্য কোন দোষ থাকেনা। দুঃখের বিষয় উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া যে সকল নব্য কবি কবিতা লিখিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের কবিতা যথেষ্টরূপে

রসাভাস দোষ দুষ্ট। এই সকল কারণে উচ্চ উচ্চ তত্ত্বকথা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটা সঙ্কট বিশেষ হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভাষার মধ্যে রসাভাস—কৃত্রিমতা আবর্জ্জনার মতন জমিয়া যাইতেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

—:০:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

একেশ্বরবাদিসম্মিলন। আগামী ২৬শে ডিসেম্বর, ২৭শে ডিসেম্বর ও ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় সিটিকলেজ-ভবনে ভারতীয় একেশ্বরবাদিদিগের সাম্মিলনসভার অধিবেশন হইবে। স্যার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছেন। একেশ্বরবাদিগণের মনোমত একেশ্বরবাদ কিরূপ রহস্যময়, তাহা বস্তুতই দুর্ব্বোধ্য। জগতের কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননা। বহুদেববাদীরা এক ঈশ্বর ভিন্ন বহু ঈশ্বর মানেন না। 'দেবতা' ও 'পরমেশ্বর' শব্দ একভাবের বোধক নহে, ভিন্নভাবের বোধক। এক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী কে নয়—তাহা বুঝাই কঠিন!

সৎকর্ম্ম। কাশীমবাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর নাকি বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'বিজ্ঞান-মন্দিরের' জন্য দুইলক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে সুখের কথা। কাশীমবাজারাধিপতির দানশীলতা প্রসিদ্ধ।

একটাকার নোট্। আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে একটাকার নোট্ প্রচারিত হইবে। সময়ানুরূপ ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়স্থাপন। বীরভূম—কুণ্ডলার জমিদার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে কুণ্ডলা-গ্রামে 'কৃপাসিন্ধু গোপেন্দ্রচন্দ্র হাই ইংলিশ স্কুল" স্থাপন করিয়াছেন। উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে। কুণ্ডলায় চতুষ্পাঠী আছে ত? সাম্যরক্ষা চাই।

কর্জ্জদানের সুদের অন্যূন হার—

হ্যাণ্ডনোটে অথবা খতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক শতকরা ১ টাকা তদূর্দ্ধ ১০০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸৶০ তদূর্দ্ধ ৸০ আনা।

সোণা রূপার জিনিষ, জহরত, কোম্পানির কাগজ, ও জীবনবীমা ব্যতীত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ॥৶০ তদূর্দ্ধ ৫০০০৲ পর্য্যন্ত ॥/০ তদূর্দ্ধ ॥৵

এই কোম্পানির আমানত বন্ধকে ॥৵ স্থাবর সম্পত্তি ও পোলিসি বন্ধকে— ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸৶০ তদূর্দ্ধ ২৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸/০ তদূর্দ্ধ ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৸০ তদূর্দ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ॥৶, তদূর্দ্ধ ২৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ॥৶০, তদূর্দ্ধ ৫০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ॥/৪, তদূর্দ্ধ ১০০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ॥/০, তদূর্দ্ধ ॥৵

সামবেদ-সংহিতা।

ইহাতে মূল সংস্কৃত, সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য, অন্বয় ও হিন্দীভাষানুবাদ আছে। উত্তম কাগজে সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত, কাপড়ে বাঁধাই। বেদ হিন্দুশাস্ত্রের মূল, বেদের উপরই হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বেদ পাঠ না করিলে হিন্দুশাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল, বেদ না বুঝিলে হিন্দুধর্ম্ম বুঝা যায় না। বেদশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যই একমাত্র সহায়। আমরা সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য ও অনুবাদসহ এই সামবেদ কেবল বেদ-প্রচারোদ্দেশে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ৫৲ মূল্যে প্রদান করিব। ডাকমাশুল ॥০ আট আনা। পুস্তক অল্প সংখ্যক মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

প্রাপ্তিস্থান—সনাতনধর্ম্ম প্রেস
মুরাদাবাদ, ইউ, পি,।



বাঙ্গালপল্টনে কর্ম্মখালি।

প্রত্যেক রংরুটকে প্রায় ৫০৲ টাকা দেওয়া হয়। ভর্ত্তির সময় ১০৲ টাকা এবং করাচিতে গিয়া বাকি ৪০৲ টাকা পাইবেন। পেন্সন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে পোষাক ও খাদ্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়, যাঁহারা সরকারী অফিসে চাকুরী করেন, তাঁহারা বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিলে, চাকুরী তো থাকিবেই, পরন্তু অফিস হইতে অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। ইউনিভারসিটিতে যাঁহারা পড়িতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিলে তাঁহাদের Attendance ও percantage এর কোন ক্ষতি হইবে না। সিপাহীর মাসিক ১১৲। উত্তমরূপ কাজ করিতে পারিলে ১২৲ টাকা বেতনে নায়েক বা লান্সনায়েক, ২০৲ টাকা বেতনে হাবিলদার, ৬০৲ টাকা বেতনে জমাদার এবং ৩৭৲ টাকা বেতনে সুবাদার পর্য্যন্ত হইতে পারিবেন। যাঁহাদের উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চ, বয়স ১৮ হইতে ২৫ বৎসর তাঁহারা সত্বর স্থানীয় সব ডিভিসানাল অফিসার, রেজিষ্ট্রার, অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। ঠিকানা ডাঃ এস, কে মল্লিক ৬৬ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reg. No C. 534

২৪ বর্ষ। মাঘ। ১০ম সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
সহকারি-সম্পাদক
স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর,
হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইং—৩১শে জানুয়ারী ১৯১৮।
বাং—১৮ই মাঘ ১৩২৪।
শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। হিন্দুসমাজের সমস্যা।	৪৩৩	৭। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা।	৪৬৯
২। বঙ্গসাহিত্য ও বৈষ্ণবকবি।	৪৪০	৮। বন্দী-বন্দনা।	৪৭২
৩। শিক্ষাষ্টকম্।	৪৫০	৯। যমুনা-দর্শনে।	৪৭৩
৪। চোখের জল।	৪৫৫	১০। ভক্ত-কথা।	৪৭৮
৫। অহামসম্মিলন।	৪৬১	১১। সংবাদ ও মন্তব্য।	৪৭৯
৬। রামকেলি ও রূপ-সনাতন।	৪৬২		

শ্রী——, সাহিত্যরত্ন শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্থ, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী. শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত, শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রী——, শ্রীআত্মনাথ কাব্যতীর্থ, সম্পাদক।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৪ বর্ষ, ২৪শ খণ্ড | মাঘ | ১৩২৪ সাল।
১০ম সংখ্যা। | ১৮৩৯ শকাব্দ।

হিন্দুসমাজের সমস্যা।

(প্রথম প্রবন্ধ)

ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ বহুদিন হইতেই দুর্দৈবের ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে মহামূর্চ্ছার ক্রোড়ে শায়িত। সাড়া শব্দ নাই; সমস্ত অঙ্গে স্তব্ধতার আধিপত্য। আপাততঃ বোধ হয় মৃত্যু ইহাকে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু নিপুণভাবে অনুসন্ধান করিলে, ইহার হৃৎপিণ্ডে প্রাণ-স্পন্দনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক কৃতীপুরুষ সেই স্পন্দনের ছন্দ অনুসরণ করিয়া "মৃত্যু নহে, মূর্চ্ছা" স্থির করিয়া, ইহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা সম্যক্ ফলপ্রসূ হয় নাই; তবে প্রচুর চেষ্টার ফলে ইহা ক্ষণকালের জন্য চক্ষুরুন্মীলন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পরক্ষণেই মূর্চ্ছার—গাঢ়নিদ্রার ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। মূর্চ্ছাভঙ্গ ঘটে নাই—ঘুমের ঘোর কাটে নাই।

ইংরাজরাজত্ব-সময়েও ভারতবর্ষকে—বিশেষভাবে হিন্দুসমাজকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, তত্ত্ববিদ্যাসমিতির (Theosopical

society) নেতৃবর্গ প্রভৃতি ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া ভারতবর্ষকে—ভারতীয় হিন্দুসমাজকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যভাবে ইহার প্রতিক্রিয়ারও আয়োজন প্রচুর হইয়াছে। এক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত জাগরণ-চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'না না—জাগিয়া কাজ নাই। এমন সুখসুষুপ্তি ভাঙ্গিও না। বেশ আছে, এইভাবে থাকিতে দেও।" এই ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যদিয়া অনুকূল-প্রতিকূল-চেষ্টার সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়া জাগরণচেষ্টাই বিশেষভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। রাজনীতির দিক্ দিয়াও ভারতকে জাগাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সে চেষ্টার কেন্দ্রস্থান জাতীয় মহাসমিতি বা National congress. ভিতর হইতে জাগাইবার চেষ্টা এই দুইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের জাগরণের অনুকূল ব্যাপার বাহির হইতেও প্রকাশ পাইয়াছে। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রযুদ্ধ, রুস-জাপযুদ্ধ, চীনযুদ্ধ এবং চীনের প্রজতন্ত্রপ্রবৃত্তির তোপধ্বনিতে ভারতবর্ষ ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মেলিয়া আবার ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ বিশ্বক্ষোভকর ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের শ্রবণবিদারক তোপধ্বনি ভারতের কর্ণপথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অন্যরূপ প্রচেষ্টার ফলে ভারত যেরূপ ক্ষণিক ক্ষীণ-সংজ্ঞালাভ করিয়াছিল, এবার তদপেক্ষা অধিক স্পষ্ট প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও ভারত পূর্ণরূপে সুপ্তি হইতে মুক্ত হয় নাই, কিন্তু এই নবজাগরণের সূচনায়—স্তিমিতভাব অবসাদ ক্রমে কমিতেছে। তমোময়ী রজনীর অবসানে তরুণ অরুণরাগে দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতের হিন্দুসমাজদেহে যে পরিমাণ জাগরণের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছে, তদপেক্ষা মুসলমান্ সমাজদেহে উহা অধিকমাত্রায় প্রকট হইয়াছে—ইহা উভয় সমাজদেহের অঙ্গচালন-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যাইতেছে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলে, ইহার ভাগ্যগগনে পরে রক্তরবির আলোকপুলক আধিপত্য করিবে, কি মসীকৃষ্ণ মন্থরমেঘ দেখা দিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

মুসলমান্সমাজকে জাগান সহজ, কিন্তু হিন্দুসমাজকে জাগান সুকঠিন। সমগ্র জগতের মুসলমান্সম্প্রদায় এক সুবিশাল মুসলমান্সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ইহাদের মধ্যে একই প্রাণ বিদ্যমান—সর্ব্বত্রই এক-প্রাণতার লীলাখেলা—একই বেদনার একই চেতনার অনুভব। একস্থানে একটী চিমটী কাটিলে সমগ্র মুসলমান্সমাজদেহ সাঁড়া দেয়। হিন্দুসমাজেও পূর্ব্বে এইএক প্রাণতা

ছিল। বেদের পুরুষসূক্তে সমাজস্থ সকল লোককে (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের জনসমূহকে) এক বিরাট্‌পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পুরুষের মুখ বা উত্তমাঙ্গ, ক্ষত্রিয় বাহু বা বক্ষোদেশ, বৈশ্য উরু বা উদরদেশ, শূদ্র পদ বা নিম্নভাগরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই বর্ণনায় বুঝা যায়, সমগ্র হিন্দুসমাজদেহ বৈদিকযুগে একটী ব্যক্তিগত দেহের মত বিবেচিত হইত। উহার প্রত্যেক অঙ্গের বা বর্ণের মধ্যে পরস্পর উপযোগিতা অনুসারে একপ্রাণতা ছিল। তখন সে সমাজের সর্ব্বত্র একই প্রাণের খেলা দেখা যাইত—সমগ্র সমাজদেহের সুখ দুঃখ একই অনুভবের বিষয় হইত। তখন হিন্দুসমাজ নিদ্রিত বা মূর্চ্ছিত ছিল না, সম্পূর্ণ জাগরিত ও সমুন্নত ছিল। এখন হিন্দুসমাজে সে ভাব সে একদেহত্ববোধ—সেরূপ একপ্রাণতা নাই। এখন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রাণস্পন্দন চলিতেছে, এক অংশের সুখদুঃখবোধের সহিত অন্য অংশের সুখদুঃখবোধের সামঞ্জস্যও নাই, সম্বন্ধও নাই। কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ আর একটী ব্যক্তিগত দেহের মত নাই। ইহা বহু বিভিন্ন-ভাবাপন্ন দেহের সামঞ্জস্যবিহীন কল্পিত সমষ্টিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এখন পুরুষসূক্তের শিক্ষা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই বহুধা বিভিন্ন হিন্দুসমাজকে জাগাইতে হইলে বহুস্থানে বোধশক্তি জাগাইতে হইবে। বহুস্থান প্রবুদ্ধ করিতে হইলে, তাহাদের মধ্যে যে ভেদবোধ আছে, তাহা দূর করিতে হইবে এবং একত্ববোধের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একত্ববোধ চাই, নচেৎ একপ্রাণতা আসিবে কিরূপে? তুর্ক-মুসলমানগণের দুর্গতিকে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের মুসল্‌মানেরা নিজেদের দুর্গতি মনে করেন। বিশেষ কারণে ঐ দুর্গতির প্রতীকার করিতে তাঁহারা চেষ্টা করুন্ বা না করুন্, ঐ দুর্গতি দূর করিতে পারুন বা না পারুন্, কিন্তু ঐ দুর্গতি তাঁহারা প্রাণে অনুভব করেন, ইহা সত্য। ইহা মুসলমানসম্প্রদায়ের নিন্দার কথা নহে; ইহা সত্য কথা ও গৌরবের কথা। সেদিন আরাজেলায় কতিপয় মুসলমানের উপর কতকগুলি হিন্দু কিছু অত্যাচার করায় সমগ্র ভারতের মুসলমান্‌সমাজ দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু ঐ সম্পর্কে যদি কোনও হিন্দুর উপর অন্যায় করা হইয়া থাকে, তবে কি সেজন্য সমগ্র হিন্দুসমাজে দুঃখের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব? বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বর্ত্তমানে একত্ববোধ নাই। হিন্দুসমাজে সার্ব্বজনীন একত্ববোধ ত নাইই, অধিকন্তু ক্ষুদ্র ২ গণ্ডীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

একত্ববোধও লোপ পাইতে চলিয়াছে। ধরুন—ব্রাহ্মণসমাজ, ইহার মধ্যে কত ভেদ। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়ীয়, মৈথিল, মহারাষ্ট্রীয়, উৎকলীয়, মাথুর, মাগধ, দ্রাবিড় প্রভৃতি কত প্রাচীন ভেদ। অধুনাতনকালে এক বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, বর্ণকব্রাহ্মণ প্রভৃতি, মধ্য-শ্রেণী, উৎকলশ্রেণী প্রভৃতি আরও বহুভেদ আছে। বৈদিকসমাজে পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য ভেদ। আরও অনেক অবান্তরভেদ মস্তক উত্তোলন করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণসমাজের একপ্রাণতায় বাধা জন্মাইতেছে। শুধু বাঙ্গালায় নহে, বম্বে, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, মধ্যদেশ, যুক্তপ্রদেশ সর্ব্বত্র এই এক ভাব—সর্ব্বত্রই ভেদবুদ্ধির রাজত্ব। ব্রাহ্মণসমাজে যে ভাব, ব্রাহ্মণেতর সমাজসমূহেও সেই ভাব। সর্ব্বত্রই একত্ববোধ লুপ্ত।

একত্ববোধ লুপ্ত হওয়াতেই ভারতের দুর্গতি হইয়াছে। যতদিন ভারতে একত্ব-বোধ জাগরিত ছিল, একপ্রাণতা ছিল, ততদিন ভারত জগতে গৌরবিত ছিল। আলেক্‌জাণ্ডার, মহম্মদ ঘোরী, সুলতান্ মামুদ্ প্রভৃতির আক্রমণে যে ভারতবর্ষ দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও নিপীড়িত হইয়াছে, তাহার কারণ একত্ববোধের অভাব। ভারতে যদি সমস্ত সম্প্রদায়ের একপ্রাণতা থাকিত, তাহা হইলে ঐ সমস্ত আক্রমণকারিদের কাহারও ভাগ্যে সাফল্যের বরমালা-লাভ ঘটিত না, ইহা নিশ্চয়।

তর্ক হইতে পারে, বৈদিকযুগে যে বর্ণবিভাগ ছিল, তাহাও ত একত্ববোধের প্রতিকূল। আর যদি চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ থাকা সত্বেও সমগ্র সমাজে কার্য্যকারী একত্ববোধ থাকিতে পারে, তবে বহুজাতিভেদ ও নানা-সম্প্রদায়-ভেদেই বা একত্ব-বোধ বিলুপ্ত হইবে কেন ? প্রত্যুত্তরে বলিব—বৈদিক চতুর্ব্বর্ণ-বিভাগের সীমাচিহ্ন কার্য্যতঃ অলঙ্ঘ্য ছিল না। তখন গুণকর্ম্ম অনুসারে উন্নয়ন অবনয়ন ছিল। শূদ্র যে চিরদিন (ব্রাহ্মণোচিত-গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইলেও) শূদ্রই থাকিবে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না—এরূপ সঙ্কীর্ণতা তখন হিন্দুসমাজে স্থান পাইত না। শূদ্র মনে করিত, "একদিন গুণকর্ম্মবলে আমি ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিব, চিরদিনই শূদ্র থাকিতে বাধ্য হইব না।" এই আশা তাহাকে ত্রিবর্ণ-সমাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিত। কৃষক যখন দেখিত, তাহার গুণবান্ জ্ঞানবান্ ভ্রাতা যজ্ঞকার্য্যে পৌরোহিত্য করিবার অধিকার পাইয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয় ব্রাহ্মণসমাজকে আর 'পর' মনে করিতে পারিত না। কর্ম্মদোষে পতন ও

কর্ম্মগুণে 'উত্থান সে সমাজে ছিল। (১) ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের পুত্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার কর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয় বীতহব্য, (২) বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, বৈশ্য নাভাগারিষ্টের পুত্রদ্বয় (৩) ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন, হীনশূদ্র কবষ ঋষিত্ব পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তখন এক মহর্ষি শুনকের বংশধরগণ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন। (৪) যেখানে উন্নতির আশা ও অবনতির ভয় থাকে, সেখানে একলক্ষ্যে এক উদ্দেশ্যে সকলেই ধাবিত হইতে পারে। সেখানে কিছু পৃথক্‌ভাব বা ভেদজ্ঞান থাকিলেও কার্য্যতঃ হানিকর হয় না। আজ আমেরিকার একজন শ্রমজীবী যেমন এই জীবনেই আমেরিকার দেশপতিত্ব বা প্রেসিডেন্টপদ পাইবার আশা পোষণ করিতে পারে, সেইরূপ তখন শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব পাইবার আশা পোষণ করিত। ব্রাহ্মণকে শূদ্র "যোগ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা" বলিয়া মনে করিত, স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বস্তুতই মনে করিত না। কাজেই একপ্রাণতার বাধা ঘটিত না। যে সমাজের লোক ঐরূপ উচ্চাশা পোষণ করিতে পারে না, সে সমাজে জড়তা আসিয়াছে; তাহার মঙ্গলে সন্দিহান হইতে হয়। হিন্দুগণের উচ্চাশার অধিকার ছিল বলিয়া সূতপুত্ররূপে পরিজ্ঞাত কর্ণও ক্ষত্রিয়োচিত মর্য্যাদা, রাজ্যসম্পদ্, ও

শ্রীভাগবতে আছে—

(১) যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎতেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।

গোতম বলেন—
বর্ণান্তরগমনমুৎ কর্ষাপকর্ষাভ্যাম্।

মনু বলেন—
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।

(২)—যথা রাজা বীতহব্যোমহাযশাঃ।
রাজর্ষিত্বঞ্চ সংপ্রাপ্তো ব্রাহ্মণং লোকসংকৃতম্।

(৩) নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।
হরিবংশ (১১ অ ৬৫৮)

(৪) বিষ্ণুপুরাণ (৪ অংশ ৮ অধ্যায়ে)
গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ-প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।
হরিবংশ (২৯ অ ২০) আছে—
পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকোযস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ।
বায়ুপুরাণেও অবিকল এই শ্লোক আছে।

ক্ষত্রিয়সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। পৌরুষপ্রকাশের অবকাশ ছিল বলিয়াই কর্ণ বলিতে পারিয়াছিলেন—

সূতো বা সূতপুত্রো বা যোবা কোবা ভবাম্যহম্ দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।

কর্ণ সূত বা সূতপুত্রই হউন্ কিম্বা যে কেহই হউন্ তাহাতে কিছু আসে যায় না। নির্দ্দিষ্টবংশে জন্মগ্রহণ দৈবাধীন, কিন্তু ঐহিক উন্নতির মূলীভূত পুরুষকার তাঁহার করায়ত্ত ছিল ; কাজেই সেই পুরুষসিংহ পৌরুষবলে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বহুচারিণী দাসী জবালার পুত্র সত্যকাম যে সত্যনিষ্ঠ বলিয়া ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন, তাহার মূলেও গুণের মর্য্যাদাই দেখা যায়। যতদিন সমাজে এইরূপ তিরস্কার-পুরস্কার-ব্যবস্থা থাকে, ততদিন সে সমাজে ভেদবুদ্ধির বিষবেগ প্রকাশ পায় না। যখন এই সত্যের অবমাননা আরব্ধ হয়, গুণের অনাদর উপস্থিত হয়, তখনই সে সমাজে বিপ্লবের ভাব জাগিয়া উঠে। ক্রমে সমাজের এক অংশের সহিত অপর অংশের সহানুভূতিসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়—সমাজের জীবনস্রোত রুদ্ধ ও বদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। এখন গুণকর্ম্মের পূজা নাই, উন্নয়ন অবনয়ন নাই, কাজেই স্বার্থসঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়সমূহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্ব্বর্ণ থাকায় ক্ষতি হয় নাই যে কারণে, সে কারণ এখন লুপ্ত, সুতরাং একত্ববোধ না জাগিলে চারিজাতি বা চারিশত জাতি যাহাই হউক্ ফল সমানই। বৈদিকযুগে একত্ববোধ ছিল,—একভাষা, একভাব, একলক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য লইয়া চারিবর্ণ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেন। সেদিন সমাজদেহ একই ছিল, এখন বহুদেহের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

পার্থক্যজ্ঞান বা ভেদবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি দেহ হইতে খসিয়া পড়িতেছে। হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গের অবজ্ঞায় উপেক্ষায় যে সকল অংশ সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, মুসলমান্‌সম্প্রদায় ও খৃষ্টান্‌সম্প্রদায় তাহা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া স্ব স্ব সমাজদেহে সংযুক্ত করিয়া লইতেছেন। হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত লোক কেবল যে খৃষ্টীয় ও মহম্মদীয় সমাজে গৃহীত হইতেছে, তাহা নহে, তাহারা নিজ নিজ নাম ভাব প্রথা পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন নামাদি গ্রহণ করিতেছে এবং নিজেদের হিন্দুজাতত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে হিন্দুসমাজের জনবল দিন দিন নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অন্য সমা-

ঙ্গের তুলনায় অনুপাতে হিন্দুসংখ্যা অধিকতরভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। একবার সেন্সাসে দেখা গেল, কোনও স্থানে হিন্দুর সংখ্যা জনসংখ্যার $\frac{২}{৩}$, এবং মুসল-মানের জনসংখ্যা $\frac{১}{৩}$, কিন্তু পরবর্ত্তি সেন্সাসে দেখা গেল—কালচক্রনেমির আবর্ত্তনে জনবলে নবীন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে,—সমগ্র জনসংখ্যার $\frac{২}{৩}$ মুসলমান্ এবং $\frac{১}{৩}$ হিন্দুতে দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গের বহুস্থানে এইরূপভাবে হিন্দুসংখ্যা কমিতেছে ও মুসলমান্ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমান্‌সম্প্রদায় আরব পারশ্য বা তুরস্ক হইতে লোক আনাইয়া স্বসমাজের পুষ্টিসাধন করি-তেছেন না। হিন্দুসমাজের পরিত্যক্ত লোক লইয়াই প্রধানতঃ তাঁহাদের পুষ্টি হইতেছে। মরণের হারও মুসলমানসম্প্রদায় অপেক্ষা হিন্দুসম্প্রদায়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। যেরূপ দ্রুতগতিতে হিন্দুর সংখ্যা-সম্পত্তি কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে ঘোরতর আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই সংখ্যাহ্রাস হিন্দুসমাজের কঠোর সমস্যা। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ উচ্চাশা বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমে হিন্দু-সমাজের বাহিরে যাইতেছেন। যদি এই অনিষ্টের প্রতীকার করা না যায়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের অস্তিত্বলোপের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। হিন্দু-সমাজ কাহাদের লইয়া? উচ্চবর্ণের লোকসংখ্যা নিম্নশ্রেণীর তুলনায় নিতান্ত অল্প; সুতরাং মাত্র উচ্চবর্ণ লইয়া থাকিলে হিন্দুসমাজ ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। "শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডল" ও "ব্রাহ্মণসভা" প্রভৃতির নেতৃবর্গ ইহার প্রতীকারার্থে কি করিতেছেন, হিন্দুসাধারণ তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। এই বিপৎপাতের প্রতীকার করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য নয়? হিন্দুসমাজের এই ভীষণ ক্ষয়ব্যাধির নিদান কি, এবং উহার সমাধান-সাধনে বা অনিষ্ট-প্রশমনেই বা কর্ত্তব্য কি, বর্ত্তমানে ইহা প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য ও বৈষ্ণবকবি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজীশিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীগণ বঙ্গভাষাকে "বর্ব্বরের ভাষা" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের তাদৃশ আচরণে আমাদের জাতীয় মর্য্যাদা হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। কাল-চক্রের আবর্ত্তনে বঙ্গভাষার সে দুঃসময় চলিয়াগিয়াছে। এখন ইংরেজি-শিক্ষিতের অগ্রণীরাই আমাদিগের মাতৃভাষার চরণসেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। এখন আমাদিগের বঙ্গভাষা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তিতে বঙ্গ-সিংহাসনে আসীনা। ইঁহার রূপের প্রভা সুদূর ইউরোপের প্যারিস্, বার্লিন্, লণ্ডন প্রভৃতি নগরেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহার ভাবৈশ্বর্য্যের আলোচনায় আজ দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত। ইঁহার গৌরবে আজ আমরা কতই গৌরবান্বিত!

বঙ্গ-ভাষার উৎপত্তি কোথায়? ৺দয়ানন্দস্বামীর মতে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হউক্ আর পরম্পরাভাবেই হউক্, সংস্কৃতভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃতভাষা একটী সুবিশাল মহীরুহ-বিশেষ; যাবতীয় ভাষা উহারই শাখা-প্রশাখা, পল্লব-উপপল্লব মাত্র। ভারতের সনাতন-ধর্ম্মই যেমন পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের মূল উৎস, তদ্রূপ ভারতের সংস্কৃত-ভাষাই যাবতীয় ভাষার মূল ভিত্তি। ভারতীয় ভাষাগুলিতে সংস্কৃতের প্রভাব অতীব স্পষ্ট। অতএব বলিতে পারা যায় যে বঙ্গভাষা পবিত্র দেবভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। স্বর্গীয় পণ্ডিত ৺রামগতি ন্যায়রত্ন তদীয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা সংস্কৃতের দৌহিত্রী। তাঁহার মতে "প্রাকৃত" সংস্কৃতের কন্যা, প্রাকৃতের কন্যা—বঙ্গভাষা। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের দৌহিত্রী কি দুহিতা, তদালোচনায় আমাদিগের সময়-ক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। এ কথা ঠিক্ যে সংস্কৃতের শোণিত বঙ্গভাষার শিরায় ২ বহিতেছে। সংস্কৃতের স্বর্গীয় লাবণ্যও ক্রমে ইহার অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রবাদ আছে, পতিদেবতা সীতাদেবী লাঙ্গলাগ্রে পৃথিবী হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন। এ ব্যাপারটী নিতান্ত অনৈসর্গিক। সুবিজ্ঞ পাঠক ইহাতে

বুঝিয়া লইবেন যে, সীতার জন্ম বৃত্তান্ত পরিস্ফুট নহে। জন্ম-ব্যাপার যেরূপই হউক্, গুণে সীতা জগন্মান্যা। নদীর জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে; নদীটি সূর্য্যরশ্মিস্নাত, মলয়-সেবিত, কুসুমাস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জন্মিয়াছে, কি ঘোর তিমিরাবৃত দুর্গমস্থানে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে না। আমাদের বাঙ্গালাভাষা, ভাষার হিসাবে ঐশ্বর্য্যশালিনী কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে। "নীল" নদের উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করিতে যাইয়া যেমন বিস্তর ব্যক্তি বিপথগামী হইয়াছিলেন, বঙ্গভাষার উদ্ভব অন্বেষণ করিতে গিয়াও সেইরূপ অনেকে অনেক পথে চলিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—বঙ্গভাষা "অনার্য্যভাষা" হইতে উৎপন্ন, অপর কেহ বলিয়াছেন "প্রাকৃত" হইতে, কেহবা বলিয়াছেন "সংস্কৃত" হইতে। তাই শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—"বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করা সেতুবন্ধনের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার।"

নুরজাহান ও পদ্মিনী শৈশবাবস্থায় ধূলা-মাটী মাখিয়া খেলা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহাদের অনুপম-সৌন্দর্য্যের কিছু হানি হইয়াছিল? যৌবনের মারুত-হিল্লোলে যখন তাঁহাদের দেহলতা কুসুম-কুন্তলা ব্রততীর ন্যায় মধুর-ভঙ্গীতে দুলিয়া ২ মর্ত্ত্যে "নন্দনের" অভিনয় দেখাইতেছিল, তখনও কি সেই ধূলমাটী তাঁহাদের অঙ্গে লিপ্ত ছিল? আমাদিগের বঙ্গভাষার বাল্যাবস্থায় কতকগুলি প্রাদেশিকশব্দের আবর্জ্জনা, কতকগুলি হিন্দী ও ব্রজবুলির ধূলি, কতকগুলি আরবী-পার্শির ছাইমাটী উহার গাত্রে লাগিয়াছিল। তাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে, ছাই-মাটী দিয়াই ভাষাটী গঠিত? স্বভাব-সুন্দরী কন্যা গোময় মাখিয়াছে, তাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে কন্যাটীর দেহ গোময় দ্বারাই গঠিত? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির লেখনী-মুখে যে ভাষা নির্গত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল আবর্জ্জনা আছে কি? বঙ্কিমবাবুর 'চন্দ্রশেখর'-গ্রন্থের নরক-বর্ণনা, "উদ্ভ্রান্তপ্রেমে"র শ্মশান-বর্ণনা প্রভৃতির তুলনা কোথায়? কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা প্রভৃতির লহরী-লীলা কতই মনোহারিণী! তাই বলিতেছিলাম, বাল্যখেলার ধূলি-মাটী ধর্ত্তব্য নহে। বঙ্গভাষা এখন যুবতী। ইহাঁর অঙ্গে এখন ধূলা-মাটী নাই। স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে এখন ইনি ঢল ২ করিতেছেন। যদি সামান্য একটু-আধটু ধূলি-মাটী ইহাঁর অঙ্গে থাকেই, তাহাতেই বা অগৌরবের কথা কি আছে? সন্তানেরা

আব্দার করিয়া ক্রোড়াচ্ছলে মায়ের গায়ে কত ধূলা-মাটী দিয়া থাকে; তাহাদের মায়ের কি তাহাতে গৌরবের কিছু লাঘব হয়? আমরা বহুকোটি লোক বঙ্গভাষার সন্তান। আমাদের মধ্যে কত জন মায়ের সঙ্গে খেলা করিতে ২ কত মলা তাঁহার গায়ে দিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে মায়ের শ্রী তাহাতে কিছুমাত্র নষ্ট হইতেছে না। সে মলা-মাটীর ভিতরেও বঙ্গমাতার জ্যোৎস্না-মধুর প্রীতি-প্রফুল্ল লাবণ্যরাশি উচ্ছলিত—উদ্ভাষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণ বঙ্গভাষার জন্মের একটা সময় নিরূপণ করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন—কামধেনুতন্ত্রে "ক"-বর্ণের মূর্ত্তিবিষয়ক একটী স্তোত্র লিপি-বদ্ধ আছে। যে আজ পঞ্চশত বৎসরের কথা। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে ৮০০ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধযুগ। ইহার অব্যবহিত পরেই বঙ্গভাষার উৎপত্তি।

দেবভাষা সংস্কৃত তাঁহার এই শিশু-কন্যাটীকে লালন-পালন করিবার ভার "প্রাকৃত" ভাষার হস্তে ন্যস্ত করেন। "প্রাকৃত" হইলেন বঙ্গভাষার "ধাত্রী মাতা"। দেবভাষার কন্যা বলিয়াই নন্দন-কাননের পারিজাত-প্রসূনের মত বঙ্গভাষা সকলেরই আদরের পাত্রী; তাই আদর করিয়া অনেকে অনেকসময় ইঁহাকে সাজাইয়াছেন। বঙ্গভাষা—আদুরে মেয়ে; তাই সকলেই মনের মত করিয়া সোহাগভরে ইঁহার পোষাক-পরিচ্ছদের প্রচুর আড়ম্বর করিয়া দিয়াছেন।

এখন বিচার্য্য, বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি হইল কিরূপে? বৈষ্ণবকবিগণ ভাব-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে সুধা পাইয়াছিলেন, তাহাই এই শিশুকন্যাকে প্রচুর পরিমাণে পান করাইয়াছিলেন। সেই ভাবোদ্ভূত সুধায়ই বঙ্গভাষার পুষ্টি। বঙ্গভাষার দেহলতা অমিয়-বৰ্দ্ধিত, তাই ইহার লাবণ্য-ভঙ্গী ভুবন-মোহিনী।

বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির নিমিত্ত বৈষ্ণবকবিগণ যে ভাণ্ডে অমৃত আনিয়াছিলেন, তাহার নাম 'পদাবলী'। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ১৪৫ জন হিন্দু বৈষ্ণবকবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও ৯ জন মুসলমান বৈষ্ণব-কবির পদাবলী আছে। সুতরাং বলা যায়, ১৫৪ জন বৈষ্ণবকবি বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই ১৫৪ জন বৈষ্ণবকবির মধ্যে বিদ্যাপতির আবির্ভাবই প্রথমে হয়। ইনি মিথিলা-প্রদেশে, সীতামারি-মহকুমার অন্তর্গত জাবৈল পরগণায় বিসপী

গ্রামে ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোভাব হয়। চণ্ডীদাস ইঁহার সমসাময়িক। চণ্ডীদাস ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর সকলের আবির্ভাব ইঁহাদের পরে হয়।

বিদ্যাপতি মিথিলার লোক হইলেও আমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র; কেননা, আমাদের বাঙ্গালাভাষা তাঁহার সময়ে মিথিলা-প্রদেশেই শিশু-কন্যাটির মত লালিত পালিত হইতেছিলেন। বিদ্যাপতির ভাবামৃতে ইঁহার শরীর গঠিত হইতেছিল। চণ্ডীদাস খাস বাঙ্গালী : সুতরাং আমাদিগের বড়ই স্বজন। ইনি বীরভূমের লোক। বীরভূম জেলা আমাদিগের তীর্থ-ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু চণ্ডীদাস নহেন, আরও অনেক ২ মহাজন তাঁহাদের শ্রীপাদস্পর্শে এই জেলা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানদাস, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই জেলারই অধিবাসী ছিলেন।

যতটুকু আলোচনা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, বিদ্যাপতির সময় হইতেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বঙ্গভাষা ভাবৈশ্বর্য্যে মহিমান্বিতা। এক এক জন মহাজনের "পদাবলী"-ভাণ্ডে ভাবামৃত কম ছিল না। আউল মনোহর দাসের "পদ-সমুদ্র" গ্রন্থে ১৫০০০ পদ আছে। "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থের শ্লোক-সংখ্যা ১২০৫১টী।

বঙ্গভাষার ভাব-সম্পদ্ বৈষ্ণবকবিগণই দিয়া গিয়াছেন। সেই সম্পদের তুলনা নাই। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে সংস্করণ বাহির করেন, তাহার উপক্রমণিকাভাগটী বঙ্গগৌরব-রবি ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের লেখনী-নিঃসৃত।

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ"—

উপক্রমণিকা-লেখক, চণ্ডীদাসের এই ভুবনমোহিনী উক্তিটী ইংরেজী-ভাষায় অনুবাদ করিয়া উপক্রমণিকায় সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—"এই উক্তিটীর ভাব এতই সুন্দর, এতই গূঢ় ও প্রাণস্পর্শী যে, অনুবাদে ইহার সৌন্দর্য্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল।" ৺রমেশ-চন্দ্রের মত ইংরেজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাচীন বৈষ্ণবকবির মর্ম্মস্পর্শী ঝঙ্কারে বিস্ময়-বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াই ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। লজ্জার কথা, পরিতাপেরও কথা, অধুনা অর্দ্ধশিক্ষিতের দল বৈষ্ণবকবির

নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সভ্যতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত হয়েন। তাই বলিতেছিলাম, বৈষ্ণবকবিগণের ভাবৈশ্বর্য্য অতুলনীয়।

শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বলেন—“উপমার যশঃ ভারতবর্ষে একমাত্র কালিদাসেরই একচেটিয়া। যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে, তবে বোধহয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না।” আমরা কালিদাসকে লইয়া যত গৌরব করিতে পারি, আমার মনে হয়, বিদ্যাপতিকে লইয়া আমাদিগের গৌরব তদপেক্ষা অধিক। বিদ্যাপতির “উপমা” আমাদিগের খাস সম্পত্তি—আমাদিগের নিজস্ব, কারণ ইহার আস্বাদ লইবার জন্য পণ্ডিতের পদে আত্মসমর্পণ করিবার আবশ্যক নাই। আমি মনে করি, আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ “বেল” ফুলটীর সৌরভ, বসোরার “গোলাপের” গন্ধ অপেক্ষাও প্রিয়তর। বিদ্যাপতির কবিতায় রস কিরূপ তর ২ করিয়া বহিতেছে, পাঠক একবার আস্বাদন করিয়া দেখুন :—

১। কিশলয় শেজি ভূমে শুতলি আয়াসে
কোর কমল-কলেবর উঠয়ে তরাসে ॥

২। পূর্ণমিক ইন্দু নিন্দ মুখ সুন্দর
সো ভেল অধশশি রেহা।
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥

৩। সজল নয়ান করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুনঃ ঐছন
দূরহ করল মুরারি ॥

চণ্ডীদাসকে পাইয়া আমরা আরও গৌরবান্বিত। বিদ্যাপতির গায়ে একটু মৈথিল-গন্ধ আছে, চণ্ডীদাসে সে টুকু নাই। বিদ্যাপতির কবিতা যেন “কেওড়া”দেওয়া পানীয়; আর চণ্ডীদাসের কবিতা দামোদরের স্বচ্ছ, স্বাদু সলিল। “বড়মানুষী”-ভাবে “কেওড়ার জল” বিলাস-দ্রব্যরূপে পানীয় হইলেই ভাল হয়; সাধারণ-ভাবে আহারে বসিয়া খাঁটী নির্ম্মল জলেই তৃপ্তি অধিক। বিদ্যাপতির ভাষা আড়ম্বরময়ী, চণ্ডীদাসের ভাষা সরলা। বিদ্যাপতি শিক্ষিত, চণ্ডীদাস সুশিক্ষিত নহেন, অথচ স্বভাবতঃ ভাবুক। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবী বীণার ঝঙ্কার কত মধুর, কত প্রাণোন্মাদকারী, পাঠক, একবার শুনিয়া সংসারক্লিষ্ট প্রাণ জুড়াইয়া লউন্।

(১) কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ-দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

(২) কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

(৩) জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথ পরশ না গেল॥

(৪) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সায়রে সিনান্ করিতে
সকলি গরল ভেল॥

পাঠক! দর্শনের কর্কশ-তর্ক-ক্রকচধ্বনিতে বা ভগবদ্গীতার গম্ভীর পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষে সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা পরিস্ফুট শব্দ আছে কি? সুখ-দুঃখ দুশ্ছেদ্য—ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট—এই তথ্য কেমন সুললিত তানে প্রাণটাকে কেমন কুসুমাস্তীর্ণ সুকোমল শয্যায় ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে—হৃদয়কে কেমন সুধারসে ডুবাইতে ডুবাইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে! যতদিন বাঙ্গালাভাষা থাকিবে, যতদিন মানুষের দেহে "হৃদয়" বলিয়া একটী বস্তু থাকিবে, ততদিন চণ্ডীদাসের ঝঙ্কার বিলুপ্ত হইবে না। বসন্ত-প্রভাতে বিস্তর পাখীর কাকলীই আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু যখন পিকের কুহুতান উচ্চে স্ফুরিত হইয়া বায়ু-সমুদ্রে অমিয়-লহরীর বিক্ষেপ ঘটাইয়া দেয়, তখন আমাদিগের মনঃপ্রাণ যেমন সেই তানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, তদ্রূপ, যত দেশের যত কবির যত গাথাই আমরা পড়িনা কেন, যখন বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের ঝঙ্কার আমাদিগের কাণে আসে, অমনি তখন প্রাণটা সেইদিকেই গড়াইয়া পড়ে—শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হই। মনে হয় যেন আমরা বিষয়-কর্কশ পৃথিবীতে আর নাই, অন্য কোন পুণ্যক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের

মধুর ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে যেন কত অতীতজীবনের ঘুমন্ত ভাবগুলি সুদূর স্বপ্নের মত ধীরে ২ প্রাণের মধ্যে একটী ২ করিয়া জাগিয়া উঠে— যেন কেমন এক রকম মধুর আবেশে প্রাণ পুরিয়া উঠে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস অতুলনীয়। অন্যান্য বৈষ্ণবকবিও উচ্চশ্রেণীর ভাবুক। এ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞের উক্তি এই—"পদকর্ত্তাগণ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি হইতে নিম্নে স্থান পাইবার যোগ্য, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন। এই দলে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম, রায় বসন্ত, যদুনন্দন, বংশীবদন এবং বাসুঘোষ শ্রেষ্ঠ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেম ভিন্ন অন্য ভাব নাই, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হইয়াছে। ভক্তির সঙ্গে নির্ম্মলতা প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গাঢ়তার হ্রাস হয়। প্রেমেতে অঙ্কিত মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে প্রাণ জুড়ায়, ভক্তিতে অঙ্কিতমূর্ত্তির পদস্পর্শ করিতে পারিলে কৃতার্থ জ্ঞান হয়, সুতরাং প্রেম অপেক্ষা ভক্তিতে উদ্দিষ্ট ছবি একটু দূরে স্থাপিত হয়।"

যতদূর বলা হইয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝিলাম, বঙ্গভাষা হইতে বৈষ্ণবকবির সংস্রব উঠাইয়া ফেলিলে, ভাষার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, লাবণ্য, জীবন আর কিছুই থাকে না। বৈষ্ণবকবিরা বঙ্গভাষাকে এমন একটী সামগ্রী দিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই। সে দুর্লভ রত্ন—সে কোহিনুর বঙ্গভাষারই গলদেশে দুল্ দুল্ করিয়া দুলিতেছে। রত্নের নাম—"প্রেম-বিজ্ঞান।" প্রেমের কথা সকল দেশেই—সকল ভাষাতেই আছে, কিন্তু এমন প্রেমের পারাবার আর কোথায়? প্রেমমন্দিরে যাইবার এমন সুন্দর সোপানাবলী বৈষ্ণবকবি ব্যতীত আর কে কোথায় গাঁথিয়াছেন? বিশৃঙ্খল প্রেমকে সুশৃঙ্খল করিয়া, আর কে কোথায় ক্রম-বিকাশের পথে আনিয়াছেন? প্রেমের মধ্যে একটা "সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি"র সুর আর কে কোথায় বাঁধিয়াছেন? অন্যান্য দেশে, অন্যান্য ভাষায় প্রেমের "ফেরী" দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবকবিরা শৃঙ্খলার সহিত প্রেমের একটী "বাজার" বসাইয়াছেন। যে যেরূপ অধিকারী, প্রেমের বাজারে সে সেইরূপ খরিদ করে। আগে পটোল-বেগুণ কিনিয়া শেষে ঘৃত দুগ্ধ সন্দেশ ক্রয় করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বাজার হইতে নিস্ক্রান্ত হয়। শ্রীযুত দীনেশ বাবুও বলিয়াছেন:—"পদাবলী-সাহিত্য ভালবাসার বিজ্ঞান; ভালবাসা-রহস্যের এরূপ গূঢ় ভেদ আর কোনও দেশের সাহিত্যে নাই। লতা যে ক্রমে ও কৌশলে তরুকে জড়াইয়া

বশীভূত করে, এই বিজ্ঞানে সেই ক্রম লিখিত হইয়াছে। প্রেমের নানালীলা হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ সূত্র রচনা করিয়াছেন। অলঙ্কার গ্রন্থে ৩৬০ রূপ নায়িকা-ভেদ বর্ণিত আছে। এই ভেদ-প্রকাশক সূত্রে এক একটী চিত্র-নির্দ্দেশক রেখাপাত করা হইয়াছে, সেই রেখার উপর কবিগণ তুলি দ্বারা সজীব বর্ণ ফলাইয়াছেন। এই সূত্রগুলি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায় কঠোর নহে, যুবকগণ তৎপাঠে আনন্দ উপভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। যথা,—নায়িকা স্বীয় সৌন্দর্য্য-দর্পে মানিনী হইয়া কর্ণোৎপল দ্বারা নায়ককে তাড়না করিতেছেন, এই চিত্র প্রগল্‌ভার; তমালকুঞ্জে অধীরা নায়িকা প্রণয়ি-সঙ্গ অপেক্ষায় পত্র-কম্পনে আশান্বিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন, এই চিত্রের নাম বাসক-সজ্জা; এই অপেক্ষা যখন আক্ষেপে পরিণত হই-তেছে, তখন বিপ্রলব্ধা, মানিনী খণ্ডিতায় বিষাদ ও রোষ-স্ফীতা; প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এখানে মান ও ক্রোধ অশ্রুজলে মগ্ন; এখানে নায়িকার মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর, কারণ "যা কান্তায়াঃ মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী।" এইরূপ আরও অসংখ্য সূত্র আছে।" তাই বলিতেছিলাম, বৈষ্ণবকবিরা প্রেমকে বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"পরাণ ছাড়িলে * পিরীতি না ছাড়ে।" পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানেও সেই কথা সমর্থিত হইতেছে। এটা বৈজ্ঞানিক যুগ বিজ্ঞানের চশ্‌মা চোখে দিয়া দুনিয়াটা দেখাই এখনকার পদ্ধতি। বিজ্ঞানের মাপ-কাঠি যাহার অঙ্গস্পর্শ না করিল, সেটা এখনকার হিসাবে কিছুই নহে। তাই চণ্ডীদাসের প্রাগুক্ত ভাব-পীযূষ-সিক্ত উক্তিটী বিজ্ঞানের দিক্ দিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। আজকাল স্থির হইয়াছে, মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার একটী চিন্তা বা চিন্তার কণাও বিনষ্ট হয় না, উহা বায়ুমণ্ডলে অক্ষুণ্ণ থাকে, ব্যোম-পটে লিপিবদ্ধ হইয়া যায়। পৃথিবীতে উপযুক্ত আধার জন্মিলেই উহারা বা উহাদের প্রভাব ঐ আধারে আসিয়া আবিষ্ট হয়। চিন্তা যদি বিনষ্ট না হইল, তবে "আপনাহারা" স্বর্গীয় ভালবাসা বা উৎকট অনুরক্তিই বা বিনষ্ট হইবে কেন? মরি! মরি! কতদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণবকবি প্রেমের এই নিগূঢ় তথ্য প্রাণ-মাতানো সুরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন! তাই বলিতেছিলাম, বৈষ্ণবকবিরাই প্রেমবিজ্ঞানের একমাত্র আচার্য্য ছিলেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কোন দেশে প্রেম-পারাবারে কামোদ-কানেড়া-বেহাগের সুললিত লহরী ছুটে নাই।

বৈষ্ণবকবিগণের প্রসাদে খাঁটী বঙ্গভাষায় দার্শনিক তথ্যেরও প্রচার হইয়াছে। আমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ ষড়দর্শন সংস্কৃতভাষায় লিখিত, কিন্তু "চৈতন্য-চরিতামৃত"গ্রন্থে বিস্তর দার্শনিক তত্ত্ব, বঙ্গ-পল্লীর কুসুম-কাননের বাসন্ত-কুসুমের মত ফুটিয়া ২ সৌরভ ছড়াইতেছে। ৬০ খানি সংস্কৃতগ্রন্থ মন্থন করিয়া, নয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে, চির-কুমার সংসার-বিরাগী কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে এই পুস্তক লিখিয়া সমাপ্ত করেন। দিগ্বিজয়ী ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পাণ্ডিত্যের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবকবিগণের নিকট আমরা জীবন চরিত, দেশপর্য্যটনবৃত্তান্ত এবং ভৌগোলিক তথ্যও প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বলিয়াছেন—"নানাকারণে আমরা চৈতন্য-ভাগবতকে বঙ্গ-ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি; প্রাচীন বঙ্গ-দেশের যে কোন বিষয় লইয়া ইতিহাস-রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্য-ভাগবত হইতে ন্যূনাধিকপরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে।"—শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ বৃত্তান্ত গোবিন্দদাসের করচায় বিবৃত হইয়াছে। ঐ করচায় আমরা ত্রিমন্দ, সিদ্ধবটেশ্বর, মুন্নানগর, বেঙ্কটনগর, ত্রিপদীনগর, পানা নরসিংহ, কাঞ্চিভরম, চাইপল্লী (আধুনিক ত্রিচিনোপল্লী), নাগর নগর, তাঞ্জোর, পদ্মকোট, ত্রিপাত্র, রঙ্গধাম (আধুনিক শ্রীরঙ্গম), রামনাথ, ত্রিবঙ্কু, পয়োষ্ণি, চিতোল, গুঞ্জরী, পূর্ণ, নাসিক, ত্রিমুখ (আধুনিক ত্রিম্বুক), ভঁরোচ, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানের পরিচয় পাই। গোবিন্দদাসের করচার মধ্যে পাঠক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নানাতত্ত্ব পাইবেন; + + + করচা, কাব্য বা ইতিহাসের রেখাপাতমাত্র, ইহা একখানি বিস্তৃত চরিতাখ্যান।"

দেখা যাইতেছে, বঙ্গভাষা বৈষ্ণবকবিগণের নিকট হইতে কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, প্রেম, ভক্তি, পারমার্থিক তথ্য, সংগীত, জীবন-চরিত প্রভৃতি অসংখ্য রত্নরাজি লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ পরমভাগবত। তাঁহারা মৎস্য-মাংস-বর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ; সত্ত্বগুণের জীবন্তমূর্ত্তি; সদ্গুণের শ্রেষ্ঠ আধার। তাঁহারা পবিত্রতার দিব্যলহরী, তর্ ২ করিয়া পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছেন, তার সঙ্গে ২ পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের প্রাণে শান্তি আসিয়াছে। তর্ক উঠে, মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ যখন এবম্প্রকার উচ্চশ্রেণীর জীব, তাঁহাদিগের আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্ম যখন এরূপ পবিত্র বস্তু, তখন লাম্পট্যের আদর্শ কোথা হইতে আসিল? কেনই বা তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের

শৃঙ্গার-রসাত্মক ব্যাপার অত বিনাইয়া ২ বর্ণনা করিয়া গেলেন? জয়দেব গোস্বামী সংস্কৃতে গ্রন্থরচনা করিলেও আমরা তাঁহার একটু আলোচনা করিব; কেননা, তিনিও একজন বৈষ্ণবকবি—তিনিও একজন প্রেমের আচার্য্য। পাঠক জয়দেবীয়রসের একটু আস্বাদ গ্রহণ করুন্:—

(১) পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগং ॥

অর্থ—কোন গোপী ঘনোন্নত কুচভরে হরিকে নিপীড়িত করিয়া অনুরাগসহকারে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কোকিলকণ্ঠে সংগীতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

(২) গোপকদম্বনিতম্ববতী-মুখচুম্বন-লম্ভিত-লোভং
বন্ধুজীব মধুরাধরপল্লব মুল্লসিতস্মিতশোভং ॥

অর্থ—যে সময়ে বিশাল-নিতম্বিনী গোপবালাদিগের বদন-চুম্বনে তদীয় বলবতী বাসনা জন্মে, তখন বন্ধুজীবপুষ্পসদৃশ মনোহর অধর-কিশলয়দ্বয় বিকশিত হয় এবং মধুর-হাস্য-সহকারে তদীয় বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

(৩) জলদপটলবলদিন্দু-বিনিন্দক-চন্দন-তিলক-ললাটং
পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন নির্দ্দয়-হৃদয়কবাটং ॥

অর্থ—তদীয় ভালতটস্থ চন্দন-তিলক জলদ-বেষ্টিত বালচন্দ্রমাকেও তিরস্কৃত করে। তিনি যে সময়ে নিষ্ঠুরহৃদয়ে পীনকুচ মর্দ্দন করিতেন, হায় সখি! সেই সময়ের সেই মধুর ভাব এখনও আমার হৃদয়মন্দিরে উদিত হইতেছে।

সাধকপ্রবর জয়দেব গোস্বামীর "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থের বর্ণে বর্ণে শৃঙ্গার-রস ঝরিয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকগণের সংগীতেও আদিরসের ছড়াছড়ি। হীনবুদ্ধি ব্যক্তিবর্গ এই আদিরসের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ধর্ম্মের নামে লাম্পট্যের স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। বৈষ্ণব-কবিগণ দ্বারা সর্ব্ববিষয়ের প্রভূত উপকার হইলেও দেশে ব্যভিচার-স্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে মনে হয়। গুপ্ত ব্যাপার একটা বাহ্য লাম্পট্যের আবরণে কেন যে আবৃত করিয়া রাখা হয়, তাহা মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, মহোদয় তদীয় সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থে (The philosophy of the gods এ) সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। তদংশের অনুবাদ এইরূপ:—"ঐহিক জীবের অপবিত্র দৃষ্টি যাহাতে জীবনের উচ্চতর গুহ্য বিষয়ের প্রতি নিপতিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে পুরাকালীন ঋষিগণ কতিপয় "বাহ্য আবরণ" ব্যবহার করিতেন + + + অনেকগুলি গূঢ় ব্যাপার, ব্যভিচারের আবরণে

আবৃত। + + + + আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আধ্যাত্মিক তথ্য-গুলিকে আবৃত করিবার পক্ষে সম্পট্যই উপযুক্ত পরিচ্ছদ। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা হৃদয়ে পাপাসক্ত, কল্পনায় কামাতুর, কেবল তাহারাই ঐ আবৃত ব্যাপারগুলিতে দোষ দেখিতে পায়। কবিবর মিল্‌টন্ খৃষ্টধর্ম্মের "পিউরিট্যান্" অর্থাৎ "অতিনৈষ্ঠিক"-সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনিও আদম ও ইভের শৃঙ্গাররসাত্মক বিলাসবর্ণনা করিতে দ্বিধা মনে করেন নাই।"—অতএব আমরা জানিতে পারিলাম, বৈষ্ণবকবিগণের হৃদয়ে কুৎসিত কামভাবের লেশও ছিল না। তাঁহারা পরমপবিত্র, মহাভাগবত। নন্দন-কাননচারী সুরভি-মলয়ের ন্যায় তাঁহাদের জীবন পৃথিবীতে একটা পুষ্পের হিল্লোল তুলিয়া, একটা স্বর্গীয় প্রেমের ফুর্‌ফুরে উচ্ছ্বাস দিয়া, চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একটা সুন্দর সুমিষ্ট সৌরভ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই গীতে মুগ্ধ হইয়া সর্প-সর্পীরা তাঁহাদের বিহারস্থানে সমবেত হয়। ফুলের গন্ধে বনের সর্প আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্পকুল সুস্বর শুনিতেও ভালবাসে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির সুমধুর বীণা-ঝঙ্কারে কামুক-সর্প-কুলের যে আমদানি হইবে, সেটা বিচিত্র ব্যাপার নহে। ফলতঃ বৈষ্ণবকবিগণ সকলেই পারমার্থিকদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ।

শিক্ষাষ্টকম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

হরিনাম-মাহাত্ম্য কেবল যে পুরাণাদিতে আছে তাহা নহে—বেদেও আছে, যথা—

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥
ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ২ অষ্টকে ২ অধ্যায়ে ২ বর্গে ৩ সূক্তম্

পূর্ব্বাং অনাদিসংসিদ্ধং ইতি সায়ণাচার্য্যঃ।
ঋতস্য ব্রহ্মণঃ গর্ভং সারভূতং সচ্চিদানন্দঘনং।
যথাবিদ জানীথ ইত্যর্থঃ।
জনুষা জন্মনা স্বত এব কেনচিদ্বয়লাভাদিনা।
পিপর্ত্তন স্তোত্রাদিনা প্রীণয়ত।

আ=সমন্তাৎ।

অস্য=মহানুভাবস্য বিষ্ণোঃ

নামবিৎ=সর্ব্বৈর্নমনীয়মভিধানং সার্ব্বাত্ম্যপ্রতিপাদকং বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম।

জানন্তঃ=পুরুষার্থপ্রদমিত্যধিগচ্ছন্তঃ।

বিবক্তন=বদত, সংকীর্ত্তয়ত।

হে স্তোতৃগণ! কিম্বা নামকারিগণ! তোমরা সেই অনাদি, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ জান, সেইরূপেই তাঁহার কীর্ত্তন কর; সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম যে পুরুষার্থপ্রদ, তাহা জানিয়া সংকীর্ত্তন কর এবং আপন জন্মের সাফল্য কর। (এক্ষণ সাক্ষাৎ করিয়া কহিতেছেন) হে বিষ্ণো! কিম্বা হে সর্ব্বাত্মক দেব! তুমি মহৎ, তোমার নাম ভজনা করিতেছি। এখানে "পুরুষার্থ" অর্থে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চারি পুরুষার্থের অতীত পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দ তাহাই বলিতেছেন, যথা—

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরমপুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥

শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ৭ পরিচ্ছেদে।

এখানে নামের আনন্দ, মোক্ষ বা ব্রহ্মানন্দেরও অধিক, ইহা বলা হইল। ব্রহ্মানন্দ যে প্রেমভক্তির নিকট অতিতুচ্ছ তাহাও কহিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তি-সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ লহর্য্যাং

যদি ব্রহ্মানন্দকে দ্বিপরার্দ্ধ গুণ করা যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্রহ্মানন্দ-সুখ ভক্তিসুখসাগরের পরমাণুরও তুল্য হইতে পারে না।

নামের শক্তি আরও অধিক। নামের গুণে ভগবানের সামীপ্য-লাভ ঘটে যথা—

ভগবন্নামগ্রহণং খলু দ্বিধা ভবতি কেবলত্বেন স্নেহসংযুক্তত্বেন চ। তত্র পূর্ব্বেণাপি প্রাপয়ত্যেব সদ্যস্তল্লোকং তন্নাম। পরেণ চ তৎসামীপ্যমপি প্রাপয়তি।

ক্রমসন্দর্ভে।

ভগবানের নাম-গ্রহণ দুই প্রকার হইয়া থাকে—এক 'কেবল' ও অন্য 'স্নেহসংযুক্ত'। 'কেবল' নাম-গ্রহণ ভগবল্লোকে লইয়া যান এবং 'স্নেহ-সংযুক্ত' নাম-গ্রহণ নামীর নিকটে লইয়া যান।

এই সকল শক্তি বলাতেই বোধ হয়, নামকীর্ত্তনকারীকে জ্ঞান-যোগাদি কিছুই করিতে হইবে না; কারণ সর্ব্বশক্তির মধ্যে যোগশক্তি, জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এই নামের এরূপ শক্তি যে "হরেকৃষ্ণ" এইরূপ নাম অনন্তকাল বলিলেও মনুষ্যের বিরক্তি জন্মে না; প্রত্যুত নামে লালসা এবং আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ অন্য কোন চারি অক্ষরের শব্দ কয়েকবার বলিলেই বিরক্তি জন্মে। এজন্য বলিয়াছেন যে, "অভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ" অর্থাৎ যেই নাম সেই কৃষ্ণ।

হে কৃষ্ণ! তোমার এত কৃপা, কিন্তু আমার এমন দুর্দ্দৈব যে, এতাদৃশ সুখসাধ্য নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না!

এ নাম-উচ্চারণের অধিকারী কে? এবং কিরূপে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে নামের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার লক্ষণ বলিতেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।৩

অমানী ব্যক্তি সর্ব্বদা হরির নাম-কীর্ত্তন করিবেন অর্থাৎ আপনাকে মান-শূন্য ভাবনা করিয়া সর্ব্বদা হরিনাম-কীর্ত্তন করিবেন। সে মানশূন্যতা কিরূপ, তাহাই বলিতেছেন। আপনি উৎকৃষ্ট হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে আপনাকে হীন বোধ করাই মানশূন্যতা।

পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, তৃণের অপেক্ষা আপনাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করা; কারণ তৃণেরও রজোগুণ আছে, যেহেতু তৃণের উপরে পদার্পণ করিলে সে অসহ্য বিবেচনায় মস্তক উত্তোলন করে। তাহাও না করার নাম "তৃণ অপেক্ষাও নীচ হওয়া।"

"তরোরপি সহিষ্ণুনা"—

তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু। বৃক্ষের সহিষ্ণুতাগুণ অত্যন্ত কারণ পত্র, পুষ্প, ফল ত্বক্ আদি লইলেও বৃক্ষ শারীরিক যাতনা সহ্য করিয়া থাকেন যথা—

পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপ-হিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ।
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া-মূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধ-নির্য্যাস-ভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥
এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩২—৩৫।

শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে কহিয়াছিলেন যে "হে সখাগণ। এই যমুনাকূলের বৃক্ষসকলকে দর্শন কর; ইঁহারা মহাভাগ্যবান্, কারণ পরের জন্য ইঁহাদের জীবন; ইহারা আপন মস্তকে বায়ু, বর্ষা, উত্তাপ ও হিম সহ্য করিয়া, আমাদিগকে ঐ সকল হইতে রক্ষা করেন। অহো! ইঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ জন্ম, কারণ ইহারা সকল প্রাণীর উপজীবিকা; দয়াশীল ব্যক্তির নিকট হইতে যাচকের ন্যায় ইঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থিগণ বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি ও পল্লবাদির অঙ্কুর দ্বারা জীবের অভিলাষ পূর্ণ করেন। প্রাণ, ধন, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রাণিদিগের মঙ্গলাচরণ করাই মানবগণের জন্মের সাফল্য।

বৃক্ষের আরও সহিষ্ণুতা যে—

ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ।

হিতোপদেশে।

বৃক্ষকে ছেদন করিতে গেলেও বৃক্ষ ছেদনকারীর উপরস্থ ছায়াকে সংহার করেন না। তদ্ভিন্ন তরু জলাভাবে শুকাইলেও কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না; শুষ্ক হইয়া যান। তাহা হইলে বৃক্ষের সহ্য করিবার শক্তি নাই, আর তিনি মরিয়া গেলে আত্মঘাতরূপ পাপে লিপ্ত হন। কিন্তু হরিনামামৃতপানকারী আত্মঘাতী না হইয়াও তরু অপেক্ষা অতিসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া নামকীর্ত্তন করেন। তিনি অন্যের ভোজন দর্শনে তৃপ্তিলাভ করিয়া

থাকেন এবং তিনি অন্যকে ভোজন করাইয়াও তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা আবশ্যক যে, অনেকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে কর্ম্মের বিরোধী মনে করিয়া থাকেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা স্থূলদর্শী, কারণ বৈষ্ণবগণ যে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অতীত পঞ্চম-পুরুষার্থের কথা কথা বলেন, তাহা বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে—

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।

শ্রীচরিতামৃতে আদি লীলায়াং ৭ম পরিচ্ছেদে।

এই ভগবানে প্রীতি এবং তাহা হইতে সমুদ্ভুত লোকের সেবাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাণ। লোকের সেবা কর্ম্ম-বিমুখতা নহে, কিন্তু তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের নামান্তর মাত্র—

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ॥

বেদান্তদর্শনে ৩।৩।৫০।

শব্দস্য = শ্রুতিবাক্যের।

তাদ্বিধ্যং = ঈশ্বরের প্রীতিকার্য্য।

ভূয়ঃ = বারম্বার ইহাই বলিয়াছেন।

ত্বনুবন্ধঃ = পরমেশ্বরের এবং জীবের প্রতি প্রীতি।

পরমেশ্বরের এবং জীবের প্রতি প্রীতি ও পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য এই দুইপ্রকার সাধনাই মুখ্য উপাসনা; শ্রুতি ইহাই বারম্বার বলিয়াছেন। ভগবানে নির্ম্মল রতি এবং লোকের সেবাই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। মহাপ্রভুও সনাতন-প্রভুকে কহিয়াছিলেন—

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।
এই তিন কর্ম্ম ভিন্ন নাহি সনাতন॥

"মানদেন"—

মানহীন জনকেও সম্মান দান করিয়া মানদ হয়েন অর্থাৎ নীচ জাতিকেও সম্মানাদি দ্বারা পূজিত করিয়া থাকেন—

হরৌরতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥ (১)
ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয়লহর্য্যাং
পঞ্চদশাঙ্কে ধৃতং পদ্মপুরাণবচনং।

(১) প্রসঙ্গক্রমে জয়দেবেরিপ্রকৃত বাঁকুড়া-বাজসীগ্রামনিবাসী (অন্যান্য

মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি ছিলেন; তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি লাভ করিয়া, ভিক্ষা নিমিত্ত শত্রুগৃহেও গমন করিতেন এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচজাতিকেও প্রণাম করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

চোখের জল।

কাঁদিতে এসেছি ভবে, 'কাঁদিব না' ব'লে আর,
বসনে মুছিব না'ক নয়নের বারিধার।
এই যে চোখের জল,
কে বলেগো অমঙ্গল?

গোলকবাসী) পরমভাগবত ভক্ত জগদ্দুর্লভ গোস্বামি-প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা কিছু বর্ণনা করিতেছি। ইনি কালনা-নিবাসী সিদ্ধদশা-প্রাপ্ত ভগবান্ দাস বাবাজীর নিকট বৈষ্ণব-শাস্ত্র-শিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে "বৈষ্ণবশাস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন নাই—কেবল বৈষ্ণবের সেবা কর, তাহাহইলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।" ঐ গোস্বামি-প্রভুপাদ প্রতিদিন সমাগত বৈষ্ণবগণের পাককার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের সেবার শেষে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পাত্র ও স্থান পরিষ্কার করিতেন। দ্বাদশবৎসরের পর ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় উক্ত প্রভুপাদকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার আর বৈষ্ণব-সেবার আবশ্যক নাই—যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাই স্ফুরণ হইবে।" তাঁহার শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যা যতবার শুনিয়াছি, ততবারই নূতনত্ব পাইয়াছি। তাঁহার গুরুবোধে রাত্রিকালে এক-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভঙ্গের পর যখনই জাগরিত হইয়াছি তখনই দেখিয়াছি যে, তিনি মালায় নামব্রহ্ম উচ্চারণ করিতেছেন—কখন নিদ্রা যাই-তেন জানিতে পারিতাম না। তাঁহার অভিমান (জাত্যভিমান বা পাণ্ডিত্যা-ভিমান) ছিলনা। তাঁহার ভগবদ্ভক্তেরও অনেক ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি—তন্মধ্যে একটি এই:—একদিন তাঁহার গৃহে ২৫ জন বৈষ্ণব পাদ সেবার সময় আসিয়াছিলেন। গৃহে তাঁহাদের সেবার উপকরণ ছিল না—তাহাকে

মঙ্গলময়ের এযে অতি প্রেমময় দান—
এতে যে অঙ্কিত হবে কবির কোমল প্রাণ!
এ নিয়ে যে জগতের সাধিত সকলে কাজ!
ধরণী ক্ষুধিত এরি এক ফোঁটা—তরে আজ!
শুভ কাজে থাক্ মানা
লভুক্ নিষেধ না-না—
তবুও চোখের জল বড় ভালবাসি হায়!
মানবের মানবত্ব ইথে বুঝি বোঝা যায়!
নিন্দাস্তুতি মিথ্যাকথা, তা'তে নাহি কোন ফল,
বুক্-ব্যথা পাশরিব ফেলে আজি আঁখিজল।
কাঁদিতে এসেছি যবে,
কাঁদিব না কেন তবে?
আঁখিজলে ভেসে যাবে পাপ-কালী অবিরল।
হৃদয় শীতল হ'বে ভক্তি পূত আঁখিজল।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।

প্রভুপাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া সাধ্বী ভক্তিমতি পত্নীও কহিয়াছিলেন যে "এক উপায় আছে, একভরি আখিম্ তুমি অর্দ্ধেকটা খাও আর আমি অর্দ্ধেকটা খাই। এসকল বৈষ্ণব বিমুখ হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।" এইরূপ কথোপকথনের পর ডাকপিয়ন্ একখানি রেজেষ্টারি পত্র আসিয়া দিল, তাহাতে পাঁচটাকার নোট ছিল। কিছুক্ষণ পরে একভার ব্যঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারপর এক গোয়ালিনী পথভ্রমে তাঁহার বাটীতে দধি ও দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছিল। এইরূপে বৈষ্ণব-পাদগণের সেবাকার্য্য সাধিত হইয়াছিল।

উক্ত প্রভুপাদ রাঁচি—কুণ্ডুগ্রামে নবরাত্রিতে আসিয়াছিলেন শ্রবণ করিয়া এই জীবাধমও রাঁচি হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে গমন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে বেদান্ত-বিষয়ক তিনটি প্রশ্ন করিবার ইচ্ছাও করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কুণ্ডু গ্রামে পঁহুছিবার পরদিনে তিনি ঐ তিন প্রশ্ন আপনিই উত্থাপন করিয়া গোবিন্দভাষ্য-মতে সমাধান করিয়াছিলেন। উহাই তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর, তিনি উপরোক্ত রসামৃতসিন্ধুর শ্লোকটি কহিয়াছিলেন। ধন্য নিরভিমানতা! লেখক।

মহাসম্মিলন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে, অদ্বৈততত্ত্ব অধিকপরিমাণে প্রচারিত হইলে মনুষ্যগণ নিশ্চেষ্ট ও অলস হইয়া পড়িবে। কারণ, এই জ্ঞানে মনুষ্য, ভগবানের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলী মাত্র। ভগবান্ যাহা করান মানুষ তাহাই করে। এমতে মানুষের উদ্যম, শক্তি সামর্থ, পুরুষার্থে জলাঞ্জলি দিতে হয়। উত্তরে বলিব—না, ইহাতে কিছুই ভয় নাই। সাধারণ লোকের আমিত্ব-জ্ঞান এতই প্রবল যে, তাহাকে উক্ত তত্ত্ব বলা হইলে সে সহজে তাহা বিশ্বাস করে না। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে করিতে দ্বৈতাদ্বৈত-জ্ঞান জন্মে। ইহাই অদ্বৈতজ্ঞানের আরম্ভ। যে পর্য্যন্ত না মানুষ ভগবানের কৃপায় সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ প্রকৃত অদ্বৈত-বাদী হইতে পারে না। আবার অদ্বৈতবাদী হইলে ভগবৎপ্রেম এতই প্রবল হয় যে, সাধক ভগবানের ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছা মিলাইয়া, কেবল জগতের মঙ্গল-সাধনে আপনাকে নিয়োজিত করেন। মানুষ প্রথমতঃ দ্বৈতবাদী থাকে, পরে পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ ও আলোচনা করিতে করিতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী হয়। পরিশেষে ব্রহ্ম-কৃপায় অদ্বৈতবাদী হয়। হঠাৎ অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিবার বিধান নাই।

জগতে এক শক্তি, এক আত্মা, এক তত্ত্ব, এক সত্তা, এক জ্ঞান, এক প্রাণ, এক প্রভু, এক দেবতার অধিষ্ঠান,—কেবলই জ্ঞান প্রেম পুণ্য মঙ্গল ও শান্তির বিধান ও আয়োজন চলিতেছে,—ইহা স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে, প্রাণ মন আনন্দে বিভোর ও শরীর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়। এই ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলে মহাভাবের সঞ্চার হয় এবং স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ হয়—পবিত্র স্বরূপ ভগবান্ যেন স্বয়ং চন্দ্র, সূর্য্য, ভূলোক, দ্যুলোক, নিমেষ মুহূর্ত্ত, দিবারাত্রি, পক্ষ মাস, ঋতু-সম্বৎসর, বিপিন গিরি, সিন্ধু নদ, ক্ষিত্যপ্তেজো-মরুদ্ব্যোম, রূপ-রস-গন্ধ, শব্দ-স্পর্শ, পিতা মাতা, পুত্র কলত্র, আত্মীয় বন্ধু স্বজন, সহায় সম্বল, সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি-বল, সুখ শান্তি, ভক্তি মুক্তি, ইহকাল পরকাল, শাস্ত্র-বিধি, গুরু আচার্য্য, স্রষ্টা পাতা, উপায় উদ্দেশ্য ও ভবকর্ণধার দয়াল হরি সাজিয়া ভক্তকে বেষ্টন করিয়া ভক্ত সঙ্গে নিত্য লীলা করিতেছেন। ভক্ত তখন আনন্দে

বিভোর হইয়া হাসে কাঁদে, নাচে গায়, ভূতলে বিলুণ্ঠিত হয়, প্রণত হয়, নমস্কার ও জয়-ধ্বনি করে এবং তাঁহাতেই সর্ব্বসুখ, সর্ব্বশান্তি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়। এই ভাব প্রাণে আসিলে জগতে কি আর মতভেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, ঈর্ষা, দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থান পায়? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—উন্নত আত্মার পক্ষে সকলই সম্ভব। যাহারা অনুন্নত, সতত্তই নিন্দা-কলহ-প্রিয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বহুদেবোপাসক, নাস্তিক, এরূপ লোকদিগকে কিরূপে এক-মতাবলম্বী করা যাইতে পারে? এরূপ লোকদিগকে একমতাবলম্বী করিতে হইলে অদ্বৈত-তত্ত্বই সহজ ও অমোঘ উপায়। অন্য কোন তত্ত্ব বাদী, তাহাদের ভিতর তত সহজে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিবেন না। অদ্বৈত-তত্ত্ব অনুন্নত জীবগণকে যে কোন অবস্থা হইতে উন্নত করিতে পারে। কারণ জগতের সর্ব্বপ্রকার উপাসনা অদ্বৈততত্ত্বে অভিনিবিষ্ট। অন্য তত্ত্ব-বাদীগণ অনুন্নত ব্যক্তি-গণকে যে পর্য্যন্ত না বিশেষরূপে শিক্ষিত ও জ্ঞানী করিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। ভারতে ত্রিশ কোটি লোকের বাস। তাহাদের মধ্যে প্রতিশতকে, অতি অল্পই শিক্ষিত, বোধ হয় ছয় জন মাত্র। এতাধিক লোককে সুশিক্ষিত করিয়া ধার্ম্মিক করা কতই না শ্রম ও আয়াস-সাধ্য! শ্রম-সাধ্য হইলেও ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও অবশ্যকর্ত্তব্য—স্বীকার করিতে হইবে। তবে অদ্বৈত-তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষোন্নতি হইবার পূর্ব্বেও একেশ্বরের পূজায় নিযুক্ত করা যায়। যাহারা সাকার-দেবোপাসক, তাহাদের নিকট প্রচার করিতে হইবে, তোমাদের দেবতা কেবল প্রতিমাতেই আবদ্ধ—এরূপ মনে করিও না। তোমাদের দেবতা প্রতিমাতেও আছেন এবং প্রতিমা কেন জগৎ অতিক্রম করিয়াও অধিষ্ঠান করিতেছেন। তোমাদের দেবতা অনন্তদেব,—এরূপ বিশ্বাস কর। যাহারা পঞ্চ-দেবোপাসক, তাহাদের নিকট প্রচার কর, তোমাদের দেবতার অপার শক্তি। তিনি একে পাঁচ এবং পাঁচে একরূপ দেখান। তোমাদের দেবতার শক্তিরূপ অনন্ত সজ্জা ও অনন্ত বিভূতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তিরূপ সজ্জা পরিধান করিয়া বা শক্তিরূপ বিভূতিতে আবৃত হইয়া তোমাদের নিকট প্রকাশিত হইলে, তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে চিনিতে পার না। একই দেবতাকে বহু ভাবিয়া পূজা কর। ফলতঃ তোমাদের দেবতা এক। তোমরা কুম্ভকারের কুলাল-চক্র দেখিয়াছ। চক্রটী যখন স্থির থাকে, তখন তাহার প্রকৃত রূপটী কি প্রকার, সুন্দররূপে দেখিয়াছ, কিন্তু তাহাতে শক্তি-সংযোগ করিয়া

ঘূর্ণিতকর, দেখিবে, যতপ্রকার বেগ দিবে ততপ্রকার মূর্ত্তি বাহির হইবে। বস্তুবিক কি যন্ত্র বহু? না, না,—ইহা একটিমাত্র, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কুলালযন্ত্রটী অবিকৃত ও একটিমাত্র থাকিলেও বহু বলিয়া বোধ হয়। ভগবান্‌ও ঠিক্ সেইরূপ। ফলতঃ এক ও অবিকৃত থাকিয়া বহুধা-শক্তি-যোগে বহু দেবতা, এমন কি জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। ফলতঃ দেবতা এক অদ্বিতীয়।

যদি এরূপভাবে প্রচার করা হয়, সকলে ভগবানের অনন্তত্ব অদ্বিতীয়ত্ব মনোযোগপূর্ব্বক শুনিবে, ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে এবং আনন্দপ্রকাশ করিবে; কোন সংশয় উপস্থিত হইলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবে। ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিতে ও জানিতে আগ্রহান্বিত হইবে, এবং কালে প্রকৃত অদ্বৈতবাদী হইয়া পড়িবে। এরূপ-ভাবে প্রচার না করিয়া যদি বলা যায়—তোমাদের সাকারমূর্ত্তির ভাবনা মূঢ়তা, ভস্মে ঘৃতাহুতি, বাল-ক্রীড়ামাত্র,—তাহা হইলে শুনিবামাত্র তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া তোমার সারগর্ভ কথাতেও কর্ণপাত করিবে না।

এমন কি নাস্তিকগণের নিকটও প্রচার করা যাইতে পারে, ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকে লোকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করে কেন জানিনা। তোমরাও যে আনন্দময়ী পরমমাতার পূজক। তোমাদের দেবতা আনন্দ। তোমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, তোমরা অঞ্জলি অঞ্জলি আনন্দ-রস পান করিবে—আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া থাকিবে। এ আকাঙ্ক্ষা কাহার নাই? আস্তিকও তাহাই বাঞ্ছা করেন।

প্রাচীন ঋষিগণও বলিয়াছেন,—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ-আনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি॥" (উপনিষৎ)

"কেবা শরীর-চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত? যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনি লোকসকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।"

ঋষিগণ ভগবানের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ অর্থাৎ আনন্দময়ী, অভয়া, ও জ্ঞানময়ী এইতিন শক্তির অভিব্যক্তি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াই বলিতেছেন, যদি রস-স্বরূপ ভগবানের আনন্দরস আমাদিগের প্রাণে সঞ্চালিত না হইত, আমরা ভগবান্‌কে লইয়া কৃতার্থ হইতে পারিতাম না। এমন কি শরীর ধারণ করিয়া জীবিত থাকিবার ইচ্ছা হইত না। মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিত।

নাস্তিকগণ! তোমরা আনন্দের সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া কিছুই অন্যায় কার্য্য কর নাই। তবে তোমার অযথাস্থানে আনন্দ অনুসন্ধান করিতেছে। তোমারা ক্ষুদ্র জড়জগতে আনন্দ অনুসন্ধান করিতেছ। এখানে যে পাইবে না, এমত নহে। পাইবে, কিন্তু যাহা পাইবে, তাহা অতি ক্ষুদ্র অনিত্য। কখন হাসিবে—কখন কাঁদিবে। নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আনন্দ পাইবে না। ভাবিয়া দেখিতেছ না, তোমাদের তৃষা অনন্ত। আবার নিত্য নব আনন্দ-রস আবশ্যক। অদ্য যে রস মিষ্ট, কল্য তাহা তিক্ত! কিন্তু তোমাদের উপায় সীমাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র জড় জগৎ। পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র জড় তোমাদের অনন্ত পিপাসা কিরূপে নিবারণ করিবে! সুতরাং এ পন্থা পরিত্যাগ কর।

এক সিদ্ধঋষি বলিতেছেন, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥" যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখ-স্বরূপ। ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ স্বরূপ। অতএব তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

তোমরা এই ঋষিবাক্যে ও অন্যান্য স্বদেশীয় বিদেশীয় সাধুগণের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রকৃত তৃপ্তি-স্থল, পবিত্র শান্তি-নিকেতন, ভূমা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা কর। সুখ-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে পাইয়া তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইবে। যদি জানিতে চাও, এ পন্থা ধরিয়া কেহ কি কৃতকার্য্য ও সিদ্ধ হইয়াছেন, তবে শুন,—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥"

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

প্রাতঃকালের সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় অকৃত্ অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মবাদী কহিতেছেন,—হে অমৃতপুরুষের পুত্রেরা—দ্যুলোক ও ভূলোকবাসী দেব মনুষ্যেরা! শ্রবণ কর। আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। ইঁহাকেই জানিয়া সাধক মৃত্যু-ভয় অতিক্রম করেন। তিনি অনন্তকাল সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষের সহচর অনুচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

উক্ত ঋষি জগৎকে প্রতারিত করিবার জন্য ঐ প্রকার উক্তি কখন করেন নাই। জগতের মঙ্গল-সাধন জন্য সত্য কথাই বলিয়াছেন। এরূপ প্রতারণা-বাক্য-প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কি স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে?

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সাধকগণকে অনন্তদেবের পূজায় নিযুক্ত করিতে পারিলে, একেশ্বরের পূজায় জগৎ মাতোয়ারা হইয়া যাইবে এবং ইহা ব্রহ্মময় পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠিবে। কালে ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হইলে মনুষ্যগণ ভ্রাতৃত্ব ও সখ্য-সূত্রে দৃঢ় আবদ্ধ হইবে।

অদ্বৈততত্ত্বই জগতে জ্ঞান, প্রেম, একতা, সৌহার্দ্দ, মঙ্গল, মিলন শান্তি ও মুক্তি-প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদী শিব জলদ গম্ভীরস্বরে তাই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন "নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।

মানবমনে অনন্ত ইচ্ছা বা চিন্তা দৃষ্ট হয়। মন একস্থানে, ইচ্ছা বা চিন্তা অন্য স্থানে, কদাপি দৃষ্ট হয়না। মন ছাড়িয়া ইচ্ছা বা চিন্তা কদাপি থাকেনা। একাধারে উভয়ই সতত রহিয়াছে। মহাশক্তি এবং তাঁহার আধার ও আশ্রয় মহাপুরুষ সদ্রূপ সতত একাধারেই রহিয়াছেন। শক্তি একস্থানে এবং তাহার আধার-পুরুষ অন্যস্থানে কদাচ থাকেননা। কিন্তু আমরা ভ্রম-ক্রমে পুরুষ একস্থানে শক্তি অন্য স্থানে মনেকরি। মনে করিবার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। পুরুষ সদাই শিব-সুন্দর, মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের আকর, কিন্তু শক্তি কখন শিবা, কখন অশিবা; কখন ভুবনমোহিনী, কখন সর্ব্ব-নাশিনী প্রলয়ঙ্করী উগ্র-চণ্ডা। পুরুষ সদাই স্থির গম্ভীর। শক্তি বাল-স্বভাবা চঞ্চলা। পুরুষ ও শক্তিতে অসম্মিলন দেখিয়া আমরা শক্তি ও পুরুষকে এক মনে করিনা, পৃথক্ মনে করি। তজ্জন্যই কেহ মহানপুরুষকে কেহ শক্তিকে পূজা করেন। শক্তিকে পুরুষ, জগৎ-সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন বাট, কিন্তু পুরুষ আপনার চিরাভিপ্রেত কল্যাণ-সম্পাদন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় থাকিয়া সমানরূপ শান্তভাব—সদাই শক্তিকে আপন ক্রোড়ে লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাই তাঁহার লীলা। এই কারণে তত্ত্বজ্ঞানিগণ পুরুষকে সদাশিব নাম দিয়াছেন। শিব ও শক্তি সততই একাধারে বিশ্ব-মন্দিরে বাস করেন। শক্তি শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী। শক্তি যেরূপ ভাবেই জগতে কার্য্য করুন না, শিব শক্তির সমস্ত কার্য্যকেই কল্যাণ ও অমৃতে পরিণত করিতেছেন। শক্তির সহিত শিব সততই সম্মিলিত— সততই সংযুক্ত; এই স্বতঃসিদ্ধ সহজ সত্যটি সম্যক্ বুঝিতে পারিলেই ও বোঝাইতে পারিলেই জগতে মহাসম্মিলন—মহান্ কল্যাণ সংঘটিত হয় এবং সাম্প্রদায়িকতা বিতাড়িত হয়—গরল সুধার সহিত মিলিয়া মধুময় হয়। শোক তাপ শান্তিতে পরিণত হয়। ভয় ও বিপদ্, বরাভয় ও সম্পদে পরিণত হয়। মৃত্যু

অমৃতের সোপান হয়। অজ্ঞানতা, অপবিত্রতা ও অপ্রেম, দিব্যজ্ঞান, পুণ্য ও প্রেমে পরিণত হয়, বহুত্ব একত্বে পরিণত হয়। বহু পূজা বহু উপাসনা, এক পূজা ও উপাসনায় পরিণত হয়। এক মহান্ মহেশ্বর মহাদেব শিব-সুন্দরের পবিত্র পূজায় অনাহত-জয়ঘণ্টা-রবে "ওম্ ওম্" মন্ত্র-নিনাদে ভূলোক ও দ্যুলোক পূর্ণ হয়। হায়! কবে সেই শুভদিন আসিবে এবং কবে "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপারসংবিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥" কীর্ত্তনটী গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশে দেশে গীত হইবে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দত্ত।

রামকেলি ও রূপ-সনাতন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যবনাধিকারে হুসেন্‌সাহ বাদসাহার রাজত্ব-কালে শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় ন্যায়, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি বহু-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় সনাতনের ৬৪ প্রকার বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। শুনাযায়,—বাদসাহ হুসেন্‌সাহ শ্রীরূপ-সনাতনের বুদ্ধির প্রাখর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে গৌড়ের রাজদরবারে আনয়ন করেন। কালে সনাতন উজির এবং শ্রীরূপ কোষাধ্যক্ষের পদে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সনাতনের বাদসাহ-প্রদত্ত উপাধি ছিল "দবিরখাস" এবং শ্রীরূপের "সাকর মল্লিক"। সর্ব্বসাধারণে শ্রীরূপ-সনাতনকে গৌড়ের মুকুটমণি কহিত। রূপসাগর এবং সনাতন-সাগর নামে দুইটি বৃহৎ দীর্ঘিকা গৌড়ে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পিরোজপুরের নিষ্করভোগী মিলিক-দার মিঞাদের একটি আরবিভাষায় লিখিত দলিলে বাদসাহের পাঞ্জাসই আছে এবং সনাতনের নাম দেবভাষায় এইরূপ লিখিত আছে—"শ্রীল শ্রীযুক্ত গোব্রাহ্মণ-প্রতিপালক সনাতন দবিরখাস।" কদমরসুলনামক দরগার নিষ্করভূমির আর একটি দলিলেও সনাতনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার দস্তখতে কেবল "শ্রীসনাতন দবিরখাস" মাত্র লেখা আছে। "গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক"

উপাধি ইহাতে লেখা নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রথমোক্ত দলিলটিতে শ্রীরূপের হস্তাক্ষরে সনাতনের নাম লেখা হইয়াছে, তাই এই বিশেষণের আড়ম্বর।

শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া চতুর্বিংশতি বৎসর পর্যন্ত তাঁহার জন্মভূমি নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন। অষ্টাদশবর্ষ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে, এবং ছয় বৎসর-কালব্যাপী বিহার ও দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে জীবের কল্যাণ-সাধন করেন। তৎপরে আটচল্লিশ বৎসরে নীলাচলে লীলাগোপন করেন। মহাপ্রভু যে সময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহার কিছুপরেই তিনি পুরুষোত্তমে গমন করেন ও তথা হইতে একবার নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্বপ্নে একদিন সনাতনকে দেখা দিয়া বৃন্দাবন আবিষ্কারের অনুমতি প্রদান করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতকার ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সনাতন তখন ঘোর বৈষয়িক। এই স্বপ্নের এক বর্ণও তিনি বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুর যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া কাঙালবেশে পথের পথিক না করিয়া তিনি ছাড়েন না। তাই তিনি স্বয়ং সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে গৌড়ে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনকে চরিতার্থ করিলেন। রায় নৃসিংহানন্দ প্রভুর প্রীত্যর্থ বহুলোক নিয়োজিত করিয়া রাজমহল পর্য্যন্ত পথের সংস্কার করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দও তাঁহার ভক্তগণসহ চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগমন করিলেন। বৈষ্ণবের পরমতীর্থ গৌড়ের এই রামকেলিগ্রামে মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যে কদম্বমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা নাকি এখনও বর্ত্তমান। মহাপ্রভু ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন দিতে উদ্যত হইলে, সনাতন অতিবিনীতভাবে বলিয়াছিলেন "হে প্রভো! আমি অত্যন্ত হেয়, নীচ সঙ্গে সর্ব্বদা কালাতিপাত করিতেছি, আমার এই ঘৃণিতদেহ কখনই আপনার বরবপুর স্পর্শযোগ্য হইতে পারেনা।" ইহাতে নিত্যানন্দ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সমধিক কবিত্বপূর্ণ যথা—"শালগ্রামের অঙ্গ-স্পর্শে কূপোদক চরণামৃতনামে অভিহিত হয়। স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহাতে আর পাপের আশঙ্কা কি?

প্রয়াগতীর্থে বল্লভ ভট্টের আবাসে শ্রীরূপ যে সময়ে সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন বল্লভভট্ট শ্রীরূপকে আলিঙ্গন দিতে গেলেও রূপ এইরূপ সনাতনের ন্যায় অত্যন্ত দীনভাবে মহাপ্রভুর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে তৎকালীন ঘটনা এইরূপ বর্ণিত আছে—

"ভট্ট আলিঙ্গিতে যায় রূপ পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঁই না ছুঁইও মোরে॥
ভট্টের বিস্ময় হইল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিল প্রভু তার বিবরণ॥
ইঁহা না স্পর্শিও ইহোঁ জাতি অতিহীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥"

উপরোক্ত এই সমস্ত প্রয়োগে অনেকে শ্রীরূপ-সনাতনকে অত্যন্ত হীন-জাতি এবং যবনবাদে বিশেষিত করিয়াছেন, কিন্তু, বাস্তবিক তাহা নহে, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল। মহাপ্রভুর এই প্রয়োগ শ্লেষ-প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে,—বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রদর্শনই কেবল মাত্র ইহাতে সূচিত হইয়াছে। জীবনের অধিকাংশ কাল শ্রীরূপ-সনাতন যবন-সাহচর্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, ইহাতেও তাঁহাদের আচার-ব্যবহার তৎকালিক প্রচলিত দেশাচারের সহিত নিতান্ত বেমানান্ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগকে যবনবাদে বিশেষিত করিবার ইহাও আর একটী প্রকৃষ্ট কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়।

রামকেলির কেলি কদম্বমূলে মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতন-প্রদত্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য হেমময় পাত্রে সাজাইয়া তদুপরি তুলসী-মঞ্জরী অর্পণ করতঃ শ্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুকে প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্ত-বৃন্দ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের প্রসাদ কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। এই মহোৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল তদবধি গৌরাঙ্গের ভক্তগণ অদ্যাপি মহাপ্রভুর আগমনের দিন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মহোৎসব এবং পরদিন "বাশি মহোৎসব" করিয়া আসিতেছেন। এতদুপলক্ষে বৎসর বৎসর রামকেলিতে একটি মহতী মেলারও আয়োজন হইয়া থাকে। সে সময়ে গৌড়ের অরণ্য সত্য সত্যই লোকারণ্যে পরিণত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এই মেলা-মহোৎসবে মকারাদিরও কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, কিন্তু পরমভক্ত সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট জে, এন্, রায় মহোদয় এই কুৎসিত অভিনয় উঠাইয়া দিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের এবং গৌড়ের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

গৌড়ে মহাপ্রভুর এই লীলাক্ষেত্র "রামকেলি" নামে কেন অভিহিত হইল—তাহার কারণ-নির্ণয় নিতান্ত কঠিন। চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিতেছেন—

"গৌড়ের নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমাদোঁহা দেখিতে মোর ইহা আগমন॥
এই মোর মন-কথা কেহ নাহি জানে।
সবে কহে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥"

মহাপ্রভুর গৌড়ে আগমনের পূর্ব্বেও সাধারণে যে এই ক্ষুদ্র স্থানটীকে রামকেলি বলিত, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জনপদের নাম "রামকেলি" কেন হইল? তাহা নির্দ্দেশ করিতে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবের মতে রামকেলি গুপ্ত বৃন্দাবন।

শুনা যায়, শ্রীরূপ-সনাতন এবং কনিষ্ঠ অনুপম বংশপরম্পরায় রামমন্ত্র-উপাসক ছিলেন। চৈতন্যমহাপ্রভুর গৌড়ে আগমনের পর শ্রীরূপ এবং সনাতন রামমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতন, কনিষ্ঠ অনুপমকেও রামমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু অনুপম কুলদেবতা পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণে নিপতিত হইয়া ইহাতে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজকালকার দিনের স্বধর্ম্মপরিত্যাগী, পরধর্ম্ম-লোলুপ, কাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত অবিশ্বাসী—অধার্ম্মিকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়, তাই তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—শ্রীরাম রমণশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণশক্তি, এবং শ্রীহরি জগন্মোহনশক্তি। সুতরাং শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহরিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। কলিযুগের তারক-ব্রহ্ম নামও সেইজন্য শাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছেন—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

শুনা যায়, সনাতন কনিষ্ঠভ্রাতার এই যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "কুলজলধিরত্ন"—সম্বোধনে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

রামকেলি শ্রীরূপ-সনাতন এবং কনিষ্ঠ অনুপমের সাধনক্ষেত্র। ইহাদের কুলদেবতার নামানুসারে যে ইহার নামকরণ হইয়াছে—তাহা অনুমান করা যায়। যবনরাজ্যে, যবন অধিকারে সর্ব্বদা যবন-পরিবেষ্টিত থাকিয়া রাজকার্য্যাবসানে ক্য় ভাই এই গুপ্তসাধনক্ষেত্রে—বসিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেন। এই নিমিত্তই বোধ হয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহা গুপ্তবৃন্দাবন নামে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীরূপ সনাতনের ন্যায় অনুপমও গৌড়ের রাজদরবারে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই অনুপমই সর্বপ্রথমে মধ্যম শ্রীরূপকে উৎসাহিত করিয়া, একদিন নিশিযোগে সনাতনের অজ্ঞাতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, প্রয়াগতীর্থে বল্লভভট্টের আলয়ে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

কি অতুল্য শ্রীসম্পদ্ লইয়া যে মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, এবং নয়ন প্রেমাশ্রু হইয়া উঠে। তাঁহার ভুবনভুলান রূপ দেখিয়াই বোধ হয় গৌড়বাসী মজিয়াছিল। কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে গৌরাঙ্গের যে তৈল চিত্র আছে, তাহা দেখিলে অতিবড় পাষণ্ডেরও হৃদয় গলিয়া যায়। মস্তকমুণ্ডিত, দণ্ড-কমণ্ডলুধারী, সাঙ্গোপাঙ্গ-বেষ্টিত সেই কিশোর সন্ন্যাসীর পায়ে যেন ব্রহ্মাণ্ড প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু ১০ দিন পর্য্যন্ত প্রয়াগতীর্থে অবস্থান করিয়া শ্রীরূপকে অষ্টশক্তি প্রদানে প্রবুদ্ধ করেন। অষ্টশক্তি সম্বন্ধে কবিরাজ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"প্রিয় স্বরূপে, দয়িত স্বরূপে
প্রেমস্বরূপে, সহজাভিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে"

মহাপ্রভু এই অষ্টশক্তি শ্রীরূপকে প্রদান করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-বিরচিত বৃন্দাবনের মহিমা-প্রকাশক নয়টি শ্লোক আছে; তাহা পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে সে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। শ্রীরূপের এই কবিত্ব-শক্তি যে মহাপ্রভু প্রদত্ত অষ্টশক্তির সার শক্তি, তাহা নিসন্দেহে বুঝিতে পাবা যায়। "ললিতমাধব", "বিদগ্ধমাধব" "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" "হংসদূত" প্রভৃতি কতিপয় সম্পদ্ যাহা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রাপ্তি সত্ত্বেও কবিত্ব-জগতে তাঁহাকে চির অমরত্ব প্রদান করিয়াছে।

শ্রীরূপ এবং অনুপম সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইলেও সনাতন কিছুদিন পর্য্যন্ত বাদশাহের উজিরের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, রাজকার্য্যে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। দিবানিশি মহাপ্রভুর ধ্যান এবং

ভ্রাতৃদ্বয়ের চিন্তা তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয়ের মত করিয়াছিল। কথিত আছে, এমন সময়ে শ্রীরূপের স্বাক্ষরিত অষ্টাক্ষরযুক্ত সাঙ্কেতিক লিপি পাইয়া তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সে অষ্টাক্ষর এইরূপ "শু, হি, রা সূ, য, পা, কু, কং"। মহানুভব সনাতন শ্রীরূপ প্রদত্ত উক্ত অষ্টাক্ষর লিপির যেরূপ অর্থানুভব করিয়াছিলেন তাহা কবিতাকারে এইরূপ লিখিত আছে।

(১) শু—"শুম্ভনামে দৈত্যপতি যাহার প্রতাপে।
গর্ব্বে ভ্রমে সুরকুল শূকরের রূপে॥
সপ্তদ্বীপ-আধিপত্য যার করতলে।
এখন কোথায় সেহ ভাবিয়া দেখিলে॥"

(২) হি—"হিরণ্যকশিপু নামে দুর্দ্দান্ত দৈত্যেশ।
মৃগতুল্য দেবদলে যেমন মৃগেশ॥
কয়কি ঐশ্বর্য্যমত্ত অনন্ত নিখিলে।
এখন কোথায় সেই ভাবিয়া দেখিলে॥"

(৩) রা—"রাবণ রক্ষেশবলী বিজয়ী ত্রিপুরে।
দেবগণ অনুজ্ঞা-অনুগ যার দ্বারে।
লক্ষ হেম গৃহস্তম্ভ রত্ন সমুজ্জ্বলে॥
এখন কোথায় সেহ ভাবিয়া দেখিলে॥"

(৪) সূ—"সূর্য্যবংশ সূর্য্যতুল্য নরেশ উজ্জ্বল।
করদানে নৃপকুল যাঁর করতল॥
অলকা-লজ্জিত যাঁর পুরির উজ্জ্বলে।
এখন কোথায় সেহ ভাবিয়া দেখিলে॥"

(৫) য—"যদুবংশ যাঁহার ছাপ্পান্নকোটী সীমা।
কবির অবর্ণ্য সুখ ঐশ্বর্য্য গরিমা
মহাবলী দম্ভে কম্প ভুবন মণ্ডলে।
এখন কোথায় সেহ ভাবিয়া দেখিলে॥"

(৬) পা—"পাণ্ডুকুলরত্ন পঞ্চ পাণ্ডব দোর্দ্দণ্ড।
ত্রিলোকে অসহ্য যাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড॥
রাজসূয়ে কর-করে দ্বারে নৃপকুলে।
এখন কোথায় সেই ভাবিয়া দেখিলে॥"

(৭) কু—"কুরুকুল-পতি দুর্য্যোধন মহামানী।
সুরসম রথিদলে শোভে রাজধানী॥

কারুকার্য্য স্পর্শমণি মুকুট মণ্ডলে।
এখন কোথায় সেহ ভাবিয়া দেখিলে॥"

(৮) ক—"কংসনামে নৃপতি দুর্দ্দণ্ড চণ্ডপতি।
অসহিষ্ণু দম্ভে ভূয়োভূয় কম্পে ক্ষিতি॥
ঐশ্বর্য্য কুবেরজয়ী কার্ত্তবীর্য্য বলে।
এখন কোথায় সেহ ভাবিয়া দেখিলে॥"

উল্লিখিত কবিতা কয়েকটী সনাতনের রচিত, কিংবা তাহার পরবর্ত্তী কোনও বৈষ্ণবকবির দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণাভাব। যে সনাতনের কথা মহাপ্রভু বলিতেছেনঃ—

"ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হয় নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম॥"

তাঁহার লেখা কি এই কবিতা? ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ বলেন, রূপের প্রেরিত সাঙ্কেতিকলিপির মধ্যে কেবলমাত্র এই শ্লোকটি লেখা ছিল—

"যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী।
রঘুপতে ক্ব গতোত্তরকোশলা॥"

ইহা বিশ্বাসযোগ্য। যাঁহার মধুময় লেখনী হইতে "কলিন্দগিরিনন্দিনী কমল-কন্দলান্দোলিনী। সুগান্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥" প্রভৃতি ললিত পদাবলী নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি যে একটী শ্লোক না লিখিয়া দিয়া কতকগুলি চ, বা, তু হি লিখিয়া তাঁহার সাঙ্কেতিক-লিপি-পরিপূর্ণ করিবেন, ইহা নিতান্ত অবিশ্বাসযোগ্য। পূর্ব্বেই সনাতন বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। শ্রীরূপের এই সাঙ্কেতিক লিপি প্রাপ্তে এই সময়ে মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ তাঁহার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন আবিষ্কারে শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। যে সময়ে উড়িষ্যার বিদ্রোহ উপস্থিত, সনাতন সেই সময়ে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন। বাদশাহ এই দুঃসময়ে কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সনাতন কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে। বাদশাহ শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরন্দরবসুকে সচিবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ ৩০

সান্বয়ব্যাখ্যা। সুদুরাচারঃ অপি চেৎ (যদ্যপি) অনন্যভাক্ (অনন্যভক্তিঃ অনন্যচিত্তঃ সন্) মাং (পরমেশ্বরং) ভজতে, সঃ সাধুরেব মন্তব্যঃ (সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব জ্ঞাতব্যঃ) হি (যস্মাত্) সঃ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ (ভগবদ্ভজনে সম্যক অধ্যবসায়ং কৃতবান্ যত্নশীলঃ ইত্যর্থঃ) ৩০

বঙ্গানুবাদ। অতি দুরাচর ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তবে সে সাধু বলিয়া গণ্য হয়, কেননা তাহার অধ্যবসায় উত্তম। ৩০

আলোচনা। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের ক্ষালন হয় ইহা শাস্ত্রের উক্তি। সুদুরাচার অর্থাৎ বহুপাপী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা কৃত-পাপ বিনষ্ট করিতে পারে। বিশেষ বিশেষ পাপ-মোচনে বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। কিন্তু বহুপাপকারী বারংবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এক জন্মেও পাপ-মুক্ত না হইতে পারে, তাই ভগবান্ বলিতেছেন "যে, দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্ত হইয়া একমাত্র আমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাহইলে সেও সাধু বলিয়া গণ্য হয়—অর্থাৎ সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত যাগ যজ্ঞের লক্ষ্যই ভগবান্। তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিয়া যে একান্তমনে তাঁহাকেই ভজনা করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবান্ কার্য্য দেখেন না, মন দেখেন। যাহার সঙ্কল্প সাধু, অধ্যবসায় সাধু, তিনি সাধু বলিয়াই পরিগণিত হন। ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১

সান্বয়ব্যাখ্যা। (সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা ভবতি (ততঃ) শশ্বত্ শান্তিং (নিত্যশান্তিং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) হে কৌন্তেয়, মে (মম) ভক্তঃ (সুদুরাচারোঽপি) ন প্রণশ্যতি (ইতি) প্রতিজানীহি (নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু) ৩১

বঙ্গানুবাদ। সে ব্যক্তি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তিলাভ করে। আমার ভক্ত কখন প্রণষ্ট হয় না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। ৩১

আলোচনা। একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করার এমনি মহিমা, যে দুরাচার মহাপাতকীও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয় এবং সে নিত্য শান্তিলাভ করে। এই অনন্যচিত্ততা ও ভক্তি ঐকান্তিকী হওয়া চাই। তাহাহইলে মহাপাতকের শান্তি লাভ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই শ্লোকটীর টীকায় জ্ঞানীভক্ত শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে "হে কৌন্তেয়, পটহাদিমহা-ঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতি জানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি প্রতিকুলবাদিদিগের সভায় যাইয়া ঢক্কা-নিনাদ-পূর্ব্বক বাহু উত্তোলন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে মহাপাপীও ভগবদ্ভক্ত হইলে সে কখনও বিনষ্ট হয় না। রত্নাকর বাল্মীকি জগাই মাধাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃপাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২

সান্বয় ব্যাখ্যা। হে পার্থ, যেঽপি পাপযোনয়ঃ (পাপজন্মানঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ, তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) পরাং গতিং (প্রকৃষ্টাং গতিং) হি (নিশ্চিতং) যান্তি। ৩২

হে অর্জ্জুন, নীচকুলজাত ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র বা যে কেহ আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই পরমাগতি লাভ করে। ৩২

আলোচন। যাঁহাদের শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম, তাঁহারা শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন, পণ্ডিত-সংসর্গ ইত্যাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধির সুবিধা পাইয়া ভগবদ্ ভক্তিলাভ করিয়া পরমপদের অধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মাকৃত পাপ-ফলে যাহারা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা শূদ্র সাধারণতঃ বেদাদি-পাঠে শাস্ত্রানুসারে যাহাদের অধিকার নাই এবং যাহারা বৈশ্য অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি সাংসারিক ব্যাপারে সাধারণতঃ অনবকাশ, তাহারাও যদি ভক্তি-পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করে, তাহাহইলে তাহারাও মুক্তি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ কেবল বেদাধ্যয়ন শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতিরই মুক্তির কারণ হয়না। নিকৃষ্ট-জন্মা অশিক্ষিত অনক্ষরও যদি ঐকান্তিকী ভক্তি-সহকারে ভগবানের সেবা করে, সেও মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্য-মসুখং লোক মিং প্রাপ্য ভজস্বমাম্॥ ৩৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। পুণ্যাঃ (সুকৃতিনঃ) ব্রাহ্মণাঃ (তথা) ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (রাজান এব তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ) (পরাংগতিং যান্তি ইতি) কিং পুনঃ ? (অতঃ) অনিত্যং (ক্ষণভঙ্গুরং) অসুখং (সুখ বর্জ্জিতং) ইমং (মনুষ্য-লোকং) প্রাপ্য মাং ভজস্ব (সেবস্ব) ৩৩

বঙ্গানুবাদ। সদাচারসম্পন্ন ভক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে পরমাগতি লাভ করিবে, তাহাতে আর কথা কি ? অতএব তুমি এই অনিত্য সুখ-রহিত মনুষ্যকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আমার আরাধনা কর। ৩৩

আলোচনা। দুরাচার পাপীও যখন ভক্তি-প্রভাবে মুক্ত হইতে পারে, তখন সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ভক্তিমান্ হইলে যে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সংযম শিক্ষা করিয়াছ, তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ, আমি তোমাকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেছি, অতএব তুমি ভক্তি পরায়ণ হইয়া আমাকে ভজনা কর। ৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

সান্বয় ব্যাখ্যা। মন্মনাঃ (ময়ি এব মনোযস্য সঃ তাদৃশঃ) ভব, মদ্ভক্তঃ (মৎ সেবকোভব) মদ্যাজী (মৎপূজন-শীলোভব) মাং নমস্কুরু (সর্ব্বং মামেব মত্বা প্রণম ইত্যর্থ) এবং (এভিঃপ্রকারৈঃ) মৎপরায়ণঃ (সন্) আত্মানং (মনঃ) যুক্ত্বা (সমাধায়) মামেব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ৩৪

বঙ্গানুবাদ। তুমি মদগত-চিত্ত, মদ্ভক্ত, ও মদীয় পূজা-পরায়ণ হও। আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে মন সমর্পণ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৪

আলোচনা। যাঁহারা সংসারের সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, যাঁহারা অনন্য-ভক্তি হইয়া কেবল একমাত্র ভগবান্ই সর্ব্বময় জানিয়া তাঁহাতে ভক্তি, ভগবান্ই একমাত্র আরাধ্য জানিয়া তাঁহারই পূজা, জগতে ভগবান্ই প্রণম্য ইত্যাদি ভাবনা করেন, কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণাগত হইতে পারেন, ভগবান্ তাঁহাদের অনন্যশরণ জানিয়া আপন ক্রোড়ে আশ্রয় দেন। ঈদৃশ ভক্ত অন্তিমে পরমপদ মুক্তিলাভ করিয়া চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় পান। ৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদুর্গাচরণ দাশগুপ্ত।

বাণী-বন্দনা।

অয়ি শতদল-বাসিনি!
বিমলকান্তি জড়িত শান্তি,
বিশ্ব-মানস-মোহিনী।
চুম্বি অমল কমল চরণ
ভ্রমিছে কত না ছন্দে—
ভ্রমরী ভ্রমরা প্রেমে মাতোয়ারা,
লুটিছে মলয়মন্দে।
চাঁচর চিকুর মাঝে মনোহর
বদনে মধুর হাসি—
যেন মেঘকোলে সৌদামিনী খেলে
চমকিয়া দশদিশি।
কিবা শোভে মালা উরস-উজলা,
সুচারু বরণখানি।
সুর নর-শির-নমিত-চরণে
নমি মা জগৎরাণি!
উর মা যাহার রসনা উপর
ধন্য হয় সে এ বিশ্বে,
তোমার মুরতি হেরে যে মা সেই
নিয়ত নিখিল দৃশ্যে;
মোহ-মুকত হয় যে মানবে
ওচরণ যুগ পাই;
জগৎপালিনী জগৎ আধার
তুঁহু ভগবতী মায়ি!
লভে যে তোমার করুণা অপার
সার্থক তার জন্ম,

আর যেবা পারে, মহিমা মা তব—
প্রচারিতে, সেই ধন্য !
শান্তি সায়রে রাখ মা মানবে
বরষি আশীষ-বাণী।
সকল প্রাণের সাধনা মা তুমি,
সকল হৃদয়-রাণী।

শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য।

যমুনা-দর্শনে।

তুমি কি যমুনা সেই বিপুলমানিনী ?
খরস্রোতা স্রোতস্বতী, জনশ্রুত-কীর্ত্তিমতী
সমৃদ্ধিদায়িনী ?
গরুত্মতী তরী কত শত,
ক্রীড়নক সম অবিরত—
নাচা'তে কি বক্ষে ধরি তুমি তরঙ্গিনি !

পূর্ব্বস্মৃতি-চিহ্নরূপা সেই প্রবাহিনী—
তুমি কিগো ! ভীমোদরা, কৃতান্তের সহোদরা,
ভীতি-বিধায়িনী ?
অরাতির কত রণতরী—
গ্রাসিয়াছ বিচূর্ণিত করি ;
অতীতের সাক্ষী সেকি তুমি গরবিণি !

শত অরি-রক্ত মাখি', কালজল যা'র
দেখাইত রণ-রঙ্গে রক্ত-ধারা মাখা অঙ্গে—
মূর্ত্তি কালিকার ?
তুমি কি, সে' ভয়ঙ্করী ?
শ্রবণ-ভৈরব রব করি',
কাঁপা'ত কি বীর-চিত্ত বীরত্ব তোমার ?

বঙ্গাধিপ "প্রতাপের" বিজয়-নিশান
উড়িত যে দুর্গশিরে, দুর্জ্জয় যবন-বীরে
কাঁপাইয়া প্রাণ!
ঊর্ম্মিমালা, যমুনে তোমার,
কাঁপায়ে সে' প্রতিবিম্ব তা'র,
দেখা'ত কি বল-বীর্য্যে কে কার প্রধান?

রণোল্লাসী চমূচয় তীরে আসি যা'র
স্তব্ধচিত দরশনে রণরঙ্গ বায়ুসনে
তরঙ্গমালার!
দাম্ভিক শার্দ্দূল-ঋক্ষগণে—
স্তম্ভিত, কুর্দ্দন-নিরীক্ষণে,
পলাইত দূরবনে শুনি হুহুঙ্কার!

বলিষ্ঠ বিহগ নিজ সামর্থ্য বুঝিয়া,
হ'ত কভু অগ্রসর, উত্তরিতে যে দুস্তর,
সাহসে পুরিয়া,
সংহার-মূরতি হেরি পরে,
ক্লান্ত-পক্ষ, সশঙ্ক অন্তরে
আবার আসিত ফিরে, অর্দ্ধপথে গিয়া!

তুমি কি, সে' হিতৈষিণী, সাধিতে কল্যাণ—
বণিকের মনোমত সুন্দর সাজায়ে কত
বন্দর প্রধান!
পণ্যপূর্ণ অগণিত তরী—
আনি' দিতে নিজবক্ষে ধরি,
করিতে দক্ষিণ-বঙ্গে সৌভাগ্য-বিধান!

তুমি কি দক্ষিণবঙ্গ-মাতৃ-স্বরূপিণী?
স্নেহ-প্রীতি-পূর্ণ-প্রাণে পীযূষ-সলিল-দানে
শরীরপোষিণী?
সহর্ষ হরিৎশীর্ষ-ভরা,

বেলাভূমি আলোকিত করা,
তুমি কি, সে কৃষিবল উৎকর্ষ-সাধিনী ?
স্বভাবজ সুবিশাল পাদপ-সকুল
কোথাও নিবিড়বন, কোথা মঞ্জু কুঞ্জবন—
মণ্ডিত দুকূল !
পুষ্ট তা'রা প্রসাদে যাহার,
ঢালি দিত ভক্তি-উপহার,
অর্ঘ্যের অঞ্জলি করি পত্র ফল ফুল ?
শ্রান্তিদূর করিতে সে তীর-তরুগণে,
দুরিত-হারিণি ! অঙ্গে চামর ঢুলা'ত রঙ্গে—
মেদুর ব্যজনে !
বনরাজি সজীব করিয়া,
মধুস্বরে দিগন্ত ভরিয়া,
শুনাইত স্তুতিগান বিহঙ্গমগণে ?
তুমি কি, সে পুণ্যতোয়া তপন-নন্দিনী ?
হিন্দুর বন্দিতা অতি, অতুল্য কারুণ্যবতী
কৈবল্যদায়িনী ?
যা'র জলে ত্যজিলে শরীর,
মুক্ত প্রাণ হয় পাতকীর,
তুমি কি সে মুমুক্ষুর মোক্ষ-বিধায়িনী ?
তোমারি কি পুণ্যতট অটবী গভীরে,
জ্যোতিঃরূপে অবতরি, দেখা দিলা মহেশ্বরী
"যশা" পাটুনিরে ?
"প্রতাপে"রে দিতে পদ-ছায়া,
আবির্ভূতা হ'লে মহামায়া,
"যশোহরে" মহাতীর্থ প্রচার অচিরে ?
যমুনে !
তুমি কি সে সুমঙ্গলা, ভীম-দরশনা ?
নীরশূন্যা, নিরাকারা, পড়ি' আছ ধূলিসারা,

হারায়ে চেতনা ?
কেহ নাহি সুধা'লে কাহারে,
এখন চিনিতে কেবা পারে,
পরাণ শিহরে, হে'রে কালের রচনা !

নীরময়ী দেবি ! আজি মৃণ্ময়ী-দশায়
(করি') মূর্ত্তি-বিপর্য্যয়, অভিনব অভিনয়
দেখাইছ হায় !
নীলাম্বুর পরিবর্ত্তে আজি,
সুশ্যামল তৃণ-শস্যরাজি
মারুত-হিল্লোলে দুলে লহরী-খেলায় !

আজি সে বিশালবক্ষে করে অবস্থান,
শুভ্র, পীত, তুঙ্গদেহ হর্ম্ম্যমালা, পর্ণগেহ-
ধৃত জনস্থান !
নানাবর্ণ অচল নিয়ত
পোতশ্রেণী যেন ইতস্ততঃ
আজো মা তোমার বক্ষে আছে ভাসমান !

মীন-কূর্ম্ম-নক্র আদি জলচর দল
পুলকে ভ্রমিত যথা, এখন বিচরে তথা
ভূচর-সকল !
উচ্ছৃঙ্খল কোলাহল তায়,
বীচিরব রাখিছে বজায়,
হয়েছে উরসি তব শিশু-ক্রীড়াস্থল !

উষায়, মধ্যাহ্নে দেবি, দিবা অবসানে,
"কুমারে" সংসার-নীতি শিখা'তে মা নিতি নি
দৃষ্টান্ত-প্রদানে ?—
প্রতিকূল দুর্জ্জয় সমীর
যত রোধ করে স্রোত-নীর,
ততই উদ্দাম গতি, ধায় সিন্ধু-পানে।

"প্রতাপ" জীবন যুদ্ধে বিজয় লভিতে
ভাবিত, "এভাবে যদি　　আমার (ও) জীবনাবধি
কর্ম্মে বাধা দিতে,
বহুবিঘ্ন ঘটে অহরহঃ,
তথাপি এ জীবন-প্রবাহ
নিবৃত্ত হবেনা কভু কর্ত্তব্যে মিশিতে !"

এরূপে প্রকৃতি-কোলে বসি' কুল্লপ্রাণে,
সুশিক্ষার স্তন যেন　　চুষি' নিত্য, অনুক্ষণ
জ্ঞান-দুগ্ধ পানে,
নব প্রাণে পেয়ে নব বল,
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট কেবল
ধীরে ধীরে "বীরপুত্র" পবিত্র বিধানে !

নবোদিত সে "আদিত্য" সর্ব্বত্র পূজিত,
ক্রমে দীপ্ত "যশোহর"　　বিমলিন দিল্লীশ্বর,
হিংসায় পীড়িত !
"প্রতাপের" মৃত্যুর কারণ
যত ধূর্ত্ত পাত্র-মিত্রগণ,
মানসিংহ-সহ হয়ে গোপনে মিলিত !

তীব্রতম ঘৃণা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিলা,
স্বেচ্ছাক্রমে হায় হায়,　　মধ্যাহ্ন-আদিত্য তা'য়
প্রাণাহুতি দিলা।
প্রতাপের শোকের আগুনে
তাপশুষ্কা হয়ে মা যমুনে,
তুমিও কি চিরতরে জীবন ত্যজিলা ?

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভগবান্ ব্যতীত যদি আর কিছুই মনে স্থান না পায়, তবে আর আত্ম-রক্ষার ভয় কি? পরমেশ্বরকে প্রিয়তম না করিতে পারিলে, নিখিল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সকল ভালবাসা, দেহ, গেহ, বিষয়, পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র বন্ধু বান্ধব—সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে প্রিয়তম ভাবনা করা যায় না। এইজন্যই দেবর্ষি নারদ ভক্তির লক্ষণ করিলেন যে, "পরমেশ্বরে পরমপ্রেমই ভক্তি।" এই কারণেই দৈত্য-কুল-পাবন প্রহ্লাদ শ্রীমন্নরসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন "প্রভো! অবিবেকী ব্যক্তির বিষয়ে যেমত অনপায়িনী প্রীতি হয়, তোমার স্মরণে আমারও যেন সেইরূপ প্রীতি হৃদয়ে স্থান পায়; আর উহা যেন আমার হৃদয় হইতে কখনও অপসৃত না হয়।" ঐ ভগবৎপ্রেমই প্রেমিক সাধুজনের সেব্য। উহার সেবায় নিখিল ভবরোগের ক্ষয় ও ত্রিতাপ উন্মূলিত হয়। যাহা লাভ করিয়া পুরুষ সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন, তাহাই অমৃতস্বরূপা ভক্তি। প্রাকৃত অমৃত লাভ করিয়াই দেবগণ আপনাদিগকে সিদ্ধ, অমর ও তৃপ্ত বোধ করেন বটে, কিন্তু তল্লাভে প্রকৃত সিদ্ধি বা অমরত্ব বা প্রকৃত তৃপ্তিলাভ ঘটেনা। যদি তাহাহইত, তবে, দেবতাগণের ঈর্ষা, দ্বেষ, ভয় বা অসন্তোষ প্রভৃতি লক্ষিত হইত না। স্বর্গে ঐ সকল দোষ আছে, তাহা চির প্রসিদ্ধ। জ্ঞানিদিগকেও স্বর্গাদি হেয় জ্ঞান করিয়া উৎকৃষ্টসুখাদি-লাভের চেষ্টা করিতে দেখা যায়। তাঁহাদের চেষ্টার সাফল্যও শ্রবণ করা যায়। অতএব ভক্তির পরমপুরুষার্থ-প্রদত্ত অবিসংবাদী। উহা যে কেবল কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, পরন্তু জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ।

যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি। ভক্তি অন্ধতা আনয়ন করে না, পরন্তু সাধককে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত করিয়া রাগোন্মত্ত করিয়া তুলে। সুতরাং তখন তাহার আর অন্য প্রযত্ন থাকে না। তখন তিনি আত্মাতেই রত হন। জ্ঞানীকে আত্মারাম বলা হয়, কিন্তু, ভক্তই প্রকৃত আত্মারাম। জ্ঞানীর জ্ঞান নিস্তরঙ্গ, ভক্তের জ্ঞান তরঙ্গায়িত, উহা তাহাকে প্রতিপদেই অভিনব আনন্দ প্রদান করে। যে জ্ঞানে তরঙ্গ

নাই, সে জ্ঞানও জড়তা আনয়ন করিয়া থাকে। জ্ঞানীর জড়ত্ব অপরিহার্য্য, ভক্তের জড়ত্বের কোন সম্ভাবনা নাই। ভক্ত ভগবল্লীলা-রসাস্বাদনে চরিতার্থতা অনুভব করেন। অতএব ভক্তিই জীবের চরম সাধন।

"সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ॥

ভক্তি যাবতীয় কামনার "নিরোধ করিয়া দেয় বলিয়া উহা সকাম নহে। ভগবৎপ্রীতিকামনায় ভক্তির পর্য্যবসান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে আপাততঃ ভক্তিকে সকাম বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু [illegible] নহে। ভক্তিতে সর্ব্ববিধ বাসনার নিরোধই অবস্থান করে। যেখানে কামনা থাকে, সেখানে আমরা সাধারণতঃ কামনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবৎপ্রীতিকামনা তাহা নহে। যখন সকল কামনার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই ভগবৎ-প্রেম-প্রবাহ আপনা হইতেই উচ্ছ্বলিত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রবাহ পূর্ব্বোক্ত নিরোধ হইতে অতিরিক্ত নহে।

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ॥

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের সন্ন্যাসই নিরোধ শব্দের অর্থ। যতদিন পর্য্যন্ত লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় না। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম সকাম, ভক্তি নিষ্কামা। ভক্ত, আত্মসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়াই ভক্ত হইয়া থাকেন। তবে চরমে তিনি যে, বিপুল সুখস্বরূপ ভগবান্‌কে উপভোগ করেন, তাহা স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবানের ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্ স্বতন্ত্র নহে, একই পদার্থ। শ্রীভগবানে অনন্যমমতা ও তদ্বিরোধী বস্তুতে উদাসীনতাও নিরোধপদবাচ্য। ভগবান্ ভিন্ন অন্য আশ্রয় ত্যাগ করাই একনিষ্ঠা বা তৎপ্রবণতা। আবার লৌকিক ও বৈদিক আচার পালন ও তদ্বিরোধী আচার বর্জ্জন হইতেই একনিষ্ঠা জন্মে। একনিষ্ঠা ব্যতীত কিছুতেই চিত্তের বিক্ষেপ দূর হয়না। তাহা হইলে শান্তিসুখও অলীক হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ

শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ইণ্টার্ণের কথা। ইংরাজকুমারী ডাইসিম্, বার্লিনস্থিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক বঙ্গীয়যুবকের সহিত পত্রব্যবহার করায় তাঁহাকে ইণ্টার্ণ করা হইয়াছে। ব্যাপার রহস্যময়!

রহস্য। গত পৌষমাসে পরমভাগবত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ভীষ্মদেবের একটি পুত্র হইয়াছিল। পুত্রটির জন্মের পর হইতে তাহার অনেক সুলক্ষণ দেখিয়া শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বিস্মিত হইতেছিলেন। দশদিন পরে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় বালকটী বিজয় করিয়াছিল, ঠিক্ সেই সময়ে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীর বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া উপর হইতে পতিত হইয়াছিলেন। এখনও ভগবানের লীলায় আমরা বিশ্বাস করি না! অবিশ্বাসীর উত্তর আছে কি? থাকা সুসম্ভব নয়।

অন্ধকবি পরলোকে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পদ্যানুবাদক অন্ধকবি যুধিষ্ঠির পাত্র মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। অন্ধব্যক্তির সাহিত্যসেবা প্রশংসারই কার্য্য। বিশেষতঃ গীতার মত সুগভীরতত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ পদ্যে অনুবাদ করা বিশেষভাবেই শক্তির পরিচায়ক। কবি পরলোকে কল্যাণ লাভ করুন্।

উপাধিপ্রাপ্তি। হায়দ্রাবাধিপতি মাননীয় নিজাম্ বাহাদুরের নামের পূর্ব্বে এতদিন "হিজ্‌হাইনেস্" লেখা হইত, সম্প্রতি 'হিজ্‌এক্‌জল্টেড্‌হাইনেস্' লিখিতে হইবে। মহামহিম সম্রাট্ এদেশে একমাত্র হায়দ্রাবাদেশ্বরকেই এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন।

লবণ-প্রস্তুতের আদেশ। নোয়াখালীজিলার হাতীয়া সন্দীপ প্রভৃতি স্থানের জনসাধারণ স্বগৃহে ব্যবহারের জন্য লবণ-প্রস্তুত করিতে পারিবে—কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা দ্বারা দরিদ্রগণের প্রভূত উপকার হইবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী অন্য সমস্ত স্থানে জনসাধারণের প্রতি এইরূপ অধিকার প্রদত্ত হইলে আরও উপকার হইবে।

সংকর্ম্ম। রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বিক্রমপুরে তাঁহার নিজগ্রামে (শেখরনগরে) একটী হাইইংলিশ স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এই সংকর্ম্মের দ্বারা তাঁহার যশ আরও বর্দ্ধিত হইল। ভগবান্ তাঁহাকে সংকর্ম্মময় দীর্ঘজীবন প্রদান করুন্।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা। বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকারে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা-প্রবর্ত্তনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি গৃহীত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে নবীন আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে। সম্প্রতি সতারা-মিউনিসিপ্যালিটী স্বীয় অধিকারের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিকশিক্ষা-প্রবর্ত্তনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক না হইলে, দেশে শিক্ষাবিস্তারের পথ সুপরিষ্কৃত হয় না। বঙ্গে কি হইতেছে?

২৪ বর্ষ। চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

হিন্দু-পত্রিকা।

WITH WHICH IS INCORPORATED
"THE BRAHMACHARIN."

(ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি-বিষয়ক
মাসিক-পত্রিকা।)



সম্পাদক
বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
সহকারি সম্পাদক
স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাচার্য্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী।

যশোহর
হিন্দু-পত্রিকা-প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ইং—৩রা এপ্রিল ১৯১৮।
বাং—২০শে চৈত্র ১৩২৪।
শকাব্দাঃ ১৮৩৯।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র, এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। হিন্দুসমাজের সমস্যা।	৫২৯	৭। ধর্ম্মশাস্ত্রের উপকারিতা।	৫৬৬
২। ব্যাপক ও পরিচ্ছিন্ন উপাসনা।	৫৪৩	৮। অনাবৃত।	৫৬৯
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।	৫৪৮	৯। অনুভূতি।	৫৭০
৪। বুদ্ধদেব।	৫৫৩	১০। গীতার বেদনিন্দা।	৫৭০
৫। [illegible]।	৫৫৮	১১। সংবাদ ও মন্তব্য।	৫৭৩
৬। প্রচার-পুস্তিকা।	৫৬০	১২। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।	৫৭৪

বর্ত্তমান সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রী——, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত শ্রীদেবানন্দ শর্ম্মা, শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ, শ্রী———, শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী——, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকদ্বয় প্রভৃতি।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

২৪ বর্ষ, ২৪শ খণ্ড ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩২৪ সাল। ১৮৩৯ শকাব্দ।

হিন্দু-সমাজের সংস্কার।

(তৃতীয় প্রবন্ধ)

সংস্কার বা পরিবর্ত্তন-সাধন করিতে হইলে, দুইপ্রকারের কার্য্য করিতে হয়—এক উপযুক্ত-বিধান-প্রণয়ন, অপর প্রণীত-বিধানের প্রয়োগ। দেশের মনস্বী বিদ্বদ্‌বৃন্দ সম্মিলিত হইয়া হিতাহিত-বিচার বিবেচনাপূর্ব্বক বিধান প্রণয়ন করিবেন, পরে রাজশক্তির সাহায্যে সমাজে—দেশে ঐ বিধানের প্রয়োগ বা প্রবর্ত্তন হইবে—ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। রাজানুমোদিত না হইলে কোনও বিধানই প্রতিপালিত হয় না। যেখানে বিধান প্রতিপালন না করিলে দণ্ড-তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকে, সেখানেই বিধান কার্য্যকারী হয়।

প্রাচীনভারতের সংহিতাকার ঋষিরা রাজা ছিলেন না, অথচ তাঁহারা বিধান-প্রণয়ন করিতেন, কিন্তু সেই বিধানসমূহ রাজানুমোদিত হইয়া রাজশক্তির সাহায্যেই সমাজে প্রচারিত হইত। রাজদণ্ডের ভয়েই লোকে সাধারণতঃ বিধান মানিয়া চলে। বর্ত্তমানকালে যাঁহাদের উপর সমাজের নেতৃত্বভার ন্যস্ত আছে, তাঁহারা কেহই রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন—দণ্ডদানে সমর্থ নহেন, কাজেই জনসাধারণ তাঁহাদের আদেশ উপদেশ মানিতে চায়না। বিধান উৎকৃষ্ট হইলেই যে লোকে তাহা মানিবে, আর অপকৃষ্ট হইলেই যে লোকে তাহা

মানিবে না, ইহা সম্ভব নয়। যে বিধান না মানিলে রাজদণ্ডের আশঙ্কা, সেই বিধানই প্রধানতঃ লোকে মানিয়া থাকে।

দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রসঙ্গত। আমরা সাধারণতঃ ভিক্ষা দেই। কিন্তু, অনেক সময় সুস্থ সবল কর্মক্ষম ভিক্ষাব্যবসায়ী লোককেও ভিক্ষা দিয়া থাকি, ইহা অসঙ্গত। ভিক্ষাব্যবসায়ী সুস্থ সবল লোককে ভিক্ষা দেওয়ায় সমাজের ক্ষতি করা হয়—আলস্য ও প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়—পক্ষান্তরে উহাতে অর্থের অপব্যবহার হয়, ফলে প্রকৃত দানের পাত্রও বঞ্চিত হয়। যেখানে এই অনিষ্টের প্রতীকার-জন্য রাজবিধি-প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেখানে এই অসঙ্গত ব্যবহার হইতে পারে না। ইংলণ্ডে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ, ভিক্ষাগ্রহণও অপরাধজনক। কলিকাতার দক্ষিণাংশে সাহেবকোয়ার্টারেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। সেখানে রাজবিধি দ্বারা ভিক্ষাদান ভিক্ষাগ্রহণ উভয়ই বারিত হওয়ায়, প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের চাতুরীজালে কেহ পতিত হয় না। অবশ্য ঐ সকল স্থানেও স্বেচ্ছাদান নিষিদ্ধ নহে। আমাদের দেশে যদি ভিক্ষাব্যবসায়ীকে ভিক্ষা দিলে দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত, তাহাহইলে আমরা অবশ্যই ভিক্ষা দিতাম না। বিবাহে পণগ্রহণ (বরপণই হউক্ আর কন্যাপণই হউক্) অসঙ্গত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এ কুপ্রথা কেহ রহিত করিতে পারেন না; কারণ, পণগ্রহণে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা নাই। দণ্ড দ্বারা সব সময় অপরাধ সমূলে উৎপাটিত হয় না বটে, কিন্তু দণ্ডপ্রয়োগ থাকায় কুকর্ম্ম প্রশ্রয় পায় না, ইহা সত্য।

রাজবিধির সাহায্যে সমাজসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু রাজশক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে সমাজে উহার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। রাজবিধি দ্বিবিধ—এক বহুলোকের সম্মত হিতকর, অপর বহুলোকের মতবিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর। গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ অসঙ্গত মনে করিয়া ইংরেজরাজ ঐ প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ প্রথার নিবারণকল্পে যে বিধান করা হইয়াছে, তাহা জনসাধারণের মতের বহু উর্দ্ধে থাকিয়াই করা হইয়াছে। আবার এমন বিধান থাকিতে পারে, যাহা সমাজের ক্ষতিকর ও লোকমত-বিরুদ্ধ। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, হিতকর বিধান প্রণয়ন করিতে পারে আবার অহিতকর বিধানও করিতে পারে। প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের জনসাধারণের হিতকর বিধান প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। অজ্ঞ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে উহা দ্বারা উপকার না হইয়া প্রভূতমাত্রায় অপকার হইবার সম্ভাবনা; কারণ, অশিক্ষিত

লোকেরা নিজেদের হিত-অহিত নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। বিদেশীয় রাজা, প্রজাবর্গের সমাজসংস্থান প্রথা-পদ্ধতি অভাব অভিযোগ সম্যগ্‌রূপ বুঝিতে পারেন না বলিয়া, প্রজাপুঞ্জের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ নির্ণয় করিতে পারেন না; প্রত্যুত তিনি স্বীয় সমাজের মানদণ্ড দ্বারা প্রজার সমাজকে মাপিতে প্রস্তুত হন। ইহা পূর্ণ মঙ্গলকর হইতে পারেনা। অনেক অভিজ্ঞ-ব্যক্তির মত এই যে, যেদেশ বিদেশীয় রাজশক্তির দ্বারা শাসিত, সেদেশে প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রবর্ত্তনই সঙ্গত। অবশ্য খাঁটী প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা রাজসংস্রবযুক্ত স্বাধীন প্রজাপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনই সমধিক সঙ্গত মনে হয়। সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞান-বৃদ্ধি হইলে, সেই সাধারণের দ্বারাই কল্যাণকর বিধান প্রণীত হইতে পারিবে এবং সেই বিধানের সাহায্যে সমাজ-সংস্কার সম্ভব হইবে।

রাজশক্তি ভিন্ন আর একটী শক্তি দ্বারাও মানুষ পরিচালিত হয়, সে শক্তি ধর্ম্মশক্তি। যেমন ইহলোকে রাজদণ্ডের ভয়ে ও ইহকালে লোকনিন্দার শঙ্কায় অনেকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয় এবং রাজদ্বারে সম্মান ও লোকপ্রশংসার আশায় অনেকে সৎকর্ম্ম করে, তেমনি পারলৌকিক অকল্যাণের ভয়েও অনেক লোকে কুকর্ম্ম করে না, আর পারলৌকিক মঙ্গলের আশায়ও বহুলোকে সৎকর্ম্ম করে। অনেকসময় আমরা ধর্ম্মবিশ্বাসে কর্ম্ম করি, আবার অনেকসময় রাজ-সম্মান ও সামাজিক প্রশংসার প্রত্যাশায় অনেকে কর্ম্ম করেন।

এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসবশতই শূদ্রান্ন-ভক্ষণ করেন না। আবার এমন অনেক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের বড় ধার ধারেন না, শত শত অখাদ্য-ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু "আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র অপেক্ষা উচ্চ" মাত্র এই অভিমানবশতই শূদ্রান্নভক্ষণ করেন না। এই জাত্য-ভিমানের সহিত যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাসের সংস্রব নাই বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের দোহাই আছে। মোটের উপর বলা যায়—মানুষের মনের গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস এক অপূর্ব্ব বস্তু। যাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়, তাঁহারা রাজদণ্ডের বা সামাজিক-নিন্দার ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হন না, রাজকীয়-পুরস্কার বা সামাজিক-প্রশংসার আপ্যায়নেও হৃষ্ট হন না— ধর্ম্মবিশ্বাসেই কার্য্য করেন। যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাতে জাগরূক হয়, তাহার চেষ্টা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিশ্বাসে যিনি কার্য্য করেন, তিনিই যথার্থ

সত্যের সমাদর করিতে পারেন। রাজবিধি অনেকসময় প্রকৃত সত্যের খাঁতির রাখেনা। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মভাব "খুঁটীনাটী-বিচার" নহে। প্রকৃত সত্য ও শ্রেষ্ঠজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তির অনুসরণেই যথার্থ ধর্ম্মভাব নিহিত। এইরূপ যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। ত্যাগেই পরমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়না, যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগরিত হয় না। ত্যাগী পুরুষ চাই।

গৃহস্থাশ্রম সকলের আশ্রয়স্থল। সকলের প্রতিপালক গৃহস্থ। অপর আশ্রমের লোকেরা ক্ষণকাল গৃহস্থাশ্রমরূপ বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় দাঁড়াইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা অবসাদ দূর করিয়া স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারেন; সুতরাং গৃহস্থাশ্রমী মানব প্রশংসনীয়। কিন্তু, গৃহস্থ সম্পূর্ণ "পরের জন্য" নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারেন না। যাঁহার নিজের বলিতে কিছু থাকে, তিনি ষোলআনা পরের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারেন না। গৃহস্থ অনেক-সময় নিজের ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যের ভালমন্দ ভাবিতে বাধ্য হন,—দেশের ভাবনা ভাবিবার অবসর পাননা। দেশের যথার্থ কল্যাণসাধন করিতে হইলে, এমন কতকগুলি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন, যাহাদের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন নাই। বঙ্গের সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই কতকগুলি সংযত কর্ম্মী যুবক লইয়া "বাঙ্গালীসন্ন্যাসী"-সম্প্রদায় গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা দেশে নীতি, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রচার দ্বারা সমাজকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন, এমন একদল সংযত কর্ম্মী চাই। দেশে এমন স্থান অনেক আছে, যে সব স্থানে স্বাস্থ্য নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ের শিক্ষার প্রচুর দারিদ্র্য বিদ্যমান। সেই সকল স্থানে জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয়-জ্ঞান-প্রচারের জন্য একদল নিঃস্বার্থ লোকের একান্ত প্রয়োজন।

এদেশের অনেক লোকের "দেশের ও দশের প্রতি কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। অনেকে মনে করেন, "নিজের গৃহস্থলীর সুখ-সুবিধার অনু-সন্ধান করা ভিন্ন আর আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই। দেশের অভাব অভিযোগের প্রতীকার রাজাই করিবেন। আমাদের সে সমস্ত বিষয়ে কিছুই দায়িত্ব নাই।" এরূপ শোচনীয় ভ্রমের অপনোদন একান্ত কর্ত্তব্য। রাজা টাকা দিয়া পরিষ্কৃত পানীয়জলের ও যোগ্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন না, অতএব আমরা পঙ্কিল দূষিতজল পান করিয়া ও কদন্নসেবন করিয়া পীড়াগ্রস্ত

হইব—রাজা দাতব্যচিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন না, অতএব আমরা অকাতরে মরণকে বরণ করিয়া লইব—রাজা অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন না, অতএব আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে কালযাপন করিতে কৃতসংকল্প হইব—সাধ্যমত সমবেতশক্তির সহায়তায় সুপেয় জল, সুযোগ্য খাদ্য ও সুচিকিৎসার চেষ্টা বা সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিব না—এরূপ ধারণা ঠিক নহে। রাজা যদি প্রজাপুঞ্জের কল্যাণসাধনে উদাসীন হন, তিনি যদি কর্ত্তব্যপালন না করেন, তবে যে আমরা কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইতে বাধ্য হইব—এরূপ বিশ্বাস কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই পোষণ করিতে পারেন না। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা যথাসাধ্য করিব এবং রাজা যাহাতে কর্ত্তব্যপরায়ণ হন—তদ্বিষয়েও প্রচুর যত্নচেষ্টা করিব—ইহাই সঙ্গত কথা। বিদেশীয় রাজা আমাদের সর্ব্ববিধ অসুবিধার সংবাদ রাখেন না। সংবাদ পাইলেও সকল সময় আমাদের সহায়তা ব্যতীত সকল অসুবিধার প্রতীকার করিতে পারেন না। আমরা যদি প্রকৃতপথে চলিতে থাকি, তবে আমরাই আমাদের বহু অনিষ্টের প্রতীকার করিতে পারি। দেশে স্বাস্থ্য, নীতি ও ধর্ম্মউদ্বোধক জ্ঞান প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে পারিলে, অনেক অনিষ্টের প্রশমন হইতে পারে,—মরণসমস্যার কতকাংশে মীমাংসাও হইতে পারে। দেশের মধ্যে জাতীয়ভাব জাগাইয়া তোলা—সকলের হৃদয়ে পবিত্র দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা করা প্রধান কর্ত্তব্য।

এই সার্ব্বজনীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, প্রত্যেক গ্রামে নগরে যাইয়া, যাহাতে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান জাতিসমূহের মধ্যে—জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সংস্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সকলে যাহাতে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, একভাব—এক উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার জন্য কর্ম্মিসম্প্রদায়কে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে যদি অন্যসম্প্রদায়ের লোক আসিতে আগ্রহান্বিত হন, তবে তাঁহাকে স্থানদান করিতে হইবে। অন্যসম্প্রদায়ের লোক হিন্দুসমাজে চিরদিনই গৃহীত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানেও সেই প্রাচীনপ্রথার সমাদর করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার অতিক্রম করিয়া, উদারতার আলোকময়ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যে সমস্ত লোক হিন্দুকুলজাত নহেন, তাঁহারাও যে প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজপুত-ক্ষত্রিয়গণ।

এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইতিহাসাভিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত সন্তোশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত 'প্রতাপসিংহ' গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"খৃষ্টীয় দশমশতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাই যে, গুজরাৎ হইতে বুন্দেলখণ্ড এবং পঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত, এই দুই রেখার দুই পাশেই একজাতীয় লোক সর্ব্বদা রাজা ও সম্ভ্রান্তদের আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহারা অসংখ্য বংশ বা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও নিজদিগকে একবর্ণ মনে করিত, এবং ইহাদের আচার ব্যবহার চরিত্র ও কার্য্যকলাপ প্রায় একরূপই ছিল। এই জাতির নাম রাজপুত এবং ইহারা নিজদিগকে "ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচয় দেয়।

কিন্তু ইহারা কি সেই প্রাচীনভারতের প্রথম ক্ষত্রিয়দের বংশধর? কই 'রাজপুত' শব্দটী বেদ, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণে কোথায়ও পাওয়া যায় না। তাহাদের বংশের নাম যথা—গুহিলোট্, রাঠোর, কাচ্ছোয়া, ধঁধেড়া, গহরবাল প্রভৃতিও আটশত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে কখন শুনা যায় নাই। আর্য্যগণ এদেশে বসতি আরম্ভ করিবার পরই বেদের সময়ে লোকের কর্ম্ম অনুসারে তাঁহাদের সমাজ চারিবর্ণে ভাগ হইয়া গেল। যুদ্ধব্যবসায়ীরা রাজন্য (ক্ষত্রিয়) নাম লইলেন এবং ক্রমে তাঁহারা শুধু নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করিয়া একটী পৃথক্ জাতি হইলেন। সেই প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের সহিত আধুনিক রাজপুতদিগের যে নামের সম্বন্ধ নাই তাহা আমরা দেখিয়াছি।

তবে কি রক্তের সম্বন্ধ ছিল? তাহাও নহে। বর্ত্তমান রাজপুত রাজাদের বংশাবলীতে ঐতিহাসিকপুরুষদের নাম ৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পৌঁছে না। যেন তাহার আগে তাঁহাদের বংশগুলি অজ্ঞাত, অখ্যাত বা পরদেশবাসী ছিল। আবার অতি দূরে দূরে স্থিত ভারতীয় নানাপ্রদেশে (যথা গুজরাৎ বঙ্গ উড়িষ্যা ও কামরূপে) প্রাচীনকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, সমাজে সুজাত ব্রাহ্মণ না থাকায় স্থানীয় রাজা কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সদ্ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদের বংশধরদের দ্বারা পবিত্র নবহিন্দুসমাজ গঠন করেন।

রাজপুতদের মধ্যেও এই ধরণের প্রবাদ আছে। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে পর মানবের শাসনকর্ত্তা নাথাকায় দেশময় পাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। ঋষিদের কাতরপ্রার্থনায় দেবগণ আবুপর্ব্বতের শিখরে গিয়া

তথাকার অগ্নিকুণ্ড হইতে ৪ জন বীর সৃষ্টি করিলেন; তাঁহারা নবক্ষত্রিয় এবং পরিহার, প্রমার, সোলাঙ্কি এবং চৌহান-বংশের আদিপুরুষ।

এই সব প্রবাদ হইতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদেশীয় আক্রমণের অথবা ঘোরতর ও দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে প্রাচীন হিন্দুসমাজ উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। বৈদিককাল হইতে আগত জাতিগুলির পুরুষপরম্পরার সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া অনেক জাতি নির্ব্বংশ, অনেক বংশ মিশ্রিত বর্ণসঙ্কর হইয়া যায়, এবং এই সব বিপ্লবের অবসানে নূতন বংশ লইয়া নূতন করিয়া চারিবর্ণ রচনা করিয়া নবহিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সপ্তমশতাব্দীর লোকবিভাগের সময় ঠিক্ বৈদিকযুগের মতই শুধু ব্যবসায় দেখিয়া জাতিনির্দ্দেশ করা হইত, জন্ম দেখিয়া নহে। রাজপূতেরা এই নব্যক্ষত্রিয়।

তাহারা কোথা হইতে আসিল? রাজপূতবংশগুলির তালিকায় আমরা গুজার, বড়গুজার, হূন প্রভৃতি নাম পাই। গুজারজাতি এখনও পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অনেকস্থানে বাস করে। তাহারা কৃষক, কিন্তু পূর্ব্বে পশু-চারণকারী ছিল, এবং স্পষ্টই বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতি। অথচ এক গুজরবংশ (সংস্কৃত গুর্জ্জর) যোধপুররাজ্যের ভিন্নমল্ল-নামক নগরে রাজধানী করিয়া একটী বড় রাজ্য স্থাপন করে এবং পরে নবমশতাব্দীতে পরিহার (সংস্কৃত প্রতিহার) নামক তাহাদের এক শাখা কান্যকুব্জ জয় করিয়া তথায় রাজ্যবিস্তার করে। তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাজপুত-বংশেরও রক্তের যোগ ছিল। রাজপুতেরা যে শকজাতীয় বিদেশী, তাহা টড্ সাহেব একশতাব্দী পূর্ব্বেই অনুমান করেন। তাহার পরে গত একশত বৎসরের আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক উপকরণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, রাজপুতদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চবংশ অর্থাৎ চিতোরের মহারাণারা রামচন্দ্রের বংশধর বা সূর্য্যবংশীয় নহেন, তাঁহারা পারস্য বা অন্য কোন বিদেশ হইতে ভারতে আগত জাতির সন্ততি।

এই মহারাণার বংশের নাম গুহিলোট্ (সংস্কৃত গুহিলপুত্র গৌহিল্য,) এই বংশের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বাপ্পা অতিপ্রাচীন। আবুপর্ব্বতের ১৩৪২ সংবতে উৎকীর্ণ এবং চিতোরের ১৩৩১ সংবতে খোদা দুইখানি শিলালিপিতে এই বাপ্পাকে "ব্রাহ্মণ" ও "বিপ্র" বলা হইয়াছে। 'একলিঙ্গমাহাত্ম্য'নামক গ্রন্থে গুহদত্ত (গুহিল) কে "নাগর ব্রাহ্মণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। রাণাকুম্ভরচিত

'রসিকপ্রিয়া' গ্রন্থেও বাপ্পাকে "দ্বিজ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আরও একখানি প্রাচীনতর শিলালিপিতে (একাদশশতাব্দী সংবৎ) গুহিলবংশের একশাখার রাজা বালাদিত্যকে পরশুরামের মত "ব্রহ্মক্ষত্রান্বিত" বলা হইয়াছে। এমন কি, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশশতাব্দীতে রচিত একখানি রাজস্থানী 'খ্যাৎ' অর্থাৎ কবিগাথায় মহারাণা-বংশের এইরূপ বর্ণনা আছে—

"আদিমূল উৎপত্তি ব্রহ্ম, পছে ক্ষত্রী জাঁনী, আনন্দপুর সিনগার"—ইত্যাদি; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মূল হইতে যাঁহার উৎপত্তি, পরে আমরা তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানি, তিনি আনন্দপুরের শোভা" ইত্যাদি। আনন্দপুর গুজরাতের 'বড়নগরের' প্রাচীন নাম, এবং নাগর ব্রাহ্মণদিগের আদি কেন্দ্রস্থল।

এখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে, 'গুহিলোট' রাজারা প্রথমে "নাগর ব্রাহ্মণ" ছিলেন। অন্য শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, নাগর-ব্রাহ্মণেরা মৈত্রক-নামক বিদেশী জাতিবিশেষ। ক্রমে গুহিলের পুত্রপৌত্রাদি কোশাকুশি ছাড়িয়া ঢালতলবার ধরিয়া রাজ্যস্থাপন করিলেন এবং ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যেই ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইলেন। সুতরাং তাঁহাদের (এবং বঙ্গের সেনরাজাদের) উপাধি 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থ আগে ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়ঃ অর্থাৎ আধুনিক ক্ষত্রিয়, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ।

এইরূপ ব্যবসায়ভেদে জাতিভেদ অর্থাৎ গীতার কথামত "জ্ঞানকর্ম্মবিভাগতঃ চাতুর্ব্বর্ণ লোক" সাজান ব্যাপার অনেক হিন্দুবংশে ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে, চৌহানবংশও প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিল, পরে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয় মধ্যে গণ্য হয়। কদম্ববংশও সেইরূপ। প্রতিহার-বংশে ব্রাহ্মণ-পিতা ও ক্ষত্রিয়-মাতার সন্তানকে "ক্ষত্রিয়" নাম দেওয়া হইত। ফলতঃ সেই যুগে সমাজপুনর্গঠনের সময় যাহারা যুদ্ধ করিত বা রাজ্যশাসনে লিপ্ত থাকিত, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় উপাধি দেওয়া হইত। লোক যে বংশে জাত, তাহার উপর তাহার জাতি নির্ভর করিত না।

অহিন্দু বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়া বসতি করিতে করিতে কত শীঘ্র ও কত বেমালুম্ হিন্দু হইয়া যাইত, আমাদের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পে লিখিয়াছেন "গয়েশউদ্দিনের পুত্র হরিদাস ঘোষ"—অর্থাৎ মুসলমানের ছেলে টাকার জোরে হিন্দু হইয়াছে। ঊনবিংশশতাব্দীতে এটা কাল্পনিক

হইলেও প্রাচীনভারতে অনেক কাল সত্যই ঘটিয়াছে। যথা—কুশাণনামক শকজাতীয় রাজা কুজুল কদফিস্, তস্য পুত্র (বা গোত্র) বিম কদফিস্, তস্য পুত্র কণিষ্ক, তস্য পুত্র হুবিষ্ক (সব পাকা তুর্কমান্) তস্য পুত্র বসুদেব। গোখাদক মঙ্গোলীয় বর্ব্বর অহোমরাজা সুকেফা; তস্য পুত্র সুতাংফা, তস্য পুত্র সুবিংফা, তস্য পুত্র জয়ধ্বজ, তস্য পুত্র চক্রধ্বজ, তস্য পুত্র রামধ্বজ; আবার পারসিক 'ক্ষত্রপ' উপাধিধারী শকবংশীয় উজ্জয়িনীর রাজারাও এইরূপে হিন্দুসমাজে ঢোকেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ যুসামোতিক, তস্যপুত্র চষ্টন, তস্য পুত্র জয়দামন, তস্য পুত্র রুদ্রদামন।

ফলতঃ সেই প্রাচীনযুগে বিদেশীরা হিন্দু-আচার ও পূজাপা[illegible] মানিয়া লইয়া অতিসহজে হিন্দু হইয়া যাইত। ভারত ও ভারতের [illegible]হিরের জগতের মধ্যে তখনও ধর্ম্মের এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর খাড়া হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম তখন সজীব ছিল, বিশ্ববিজয়ী ছিল, পরাতক একরোখো [illegible]। হিন্দুসমাজের দেহ তখন সুস্থ, পরিপাকশক্তি অতি প্রবল; সে কত বিদেশী জাতি ও বংশ হজম করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, নিজদেহের রক্ত ও শক্তিতে পরিণত করিয়াছে, রাজপুতেরা তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।

গোয়ালিয়ার রাজ্যে বেসনগরের প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ আছে—

"দেবদেবস্য বাসুদেবস্য গরুড়ধ্বজোহয়মংকারিতঃ ইহ হেলিওদোরেণ ভাগবতেন দিয়নপুত্রেণ তক্ষশিলাকেণ যোনদূতেন আগতেন মহারাজস্য অন্তলিকিতস্য উপেত্য সকাশম্ রাজ্ঞঃ কাশীপুত্রস্য ভাগভদ্রস্য" অর্থাৎ মহারাজ আন্তলিকিদের (Antealcidas) নিকট হইতে রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের সকাশে আগত যবনদূত দিয়ন-(Dion) পুত্র হেলিওডোর (Heliodoros) যিনি তক্ষশিলাবাসী এবং ভাগবত অর্থাৎ বিষ্ণুপাসক—এখানে এই গরুড়ধ্বজ দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে স্থাপিত করিলেন। তখন যবন (গ্রীক) ও হিন্দু হইতে পারিত। বিষ্ণুপূজা করিত, 'ভাগবত' উপাধি লইত। কিন্তু মুসলমানযুগে সে পথ বন্ধ হইল। ইহুদীধর্ম্মের এবং তাহার দুই শাখা খৃষ্টান ও ইসলামের উপাস্য দেবতা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তিনি সেবকহৃদয়ে অংশীদার [illegible] সহেন না। তিনি 'A living and a jealaus God', সুতরাং ভারতে আগত মুসলমান ও খৃষ্টানেরা শক, অহোম, ক্ষত্রপ রাজাদের অথবা যবনদূত হেলিওডোরের মত হিন্দু হইতে পারিলনা। তাহারা চিরদিন পৃথক্‌জাতি ও সমাজ রহিয়া

গেল। ক্রমে সময়ের গতিতে হিন্দুসমাজ নিজসীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, ক্রমে চারিদিকে গণ্ডী দিল। + + + + + +

কিন্তু নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ বিদেশীকে নিজের অঙ্গ করিয়া লইত, আর তাহাকে নিজের ধর্ম্মে আনিয়া নৈতিক নবজীবন দান করিত। মধ্য-এসিয়ার মেষচারণকারী লুণ্ঠনব্যবসায়ী যে সব শক হূন প্রভৃতি বর্ব্বর ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরাই রাজপুত। হিন্দু হইবার পূর্ব্বে তাহারা কি ছিল, এটিলা, জেঙ্গিজ খাঁ ও তোড়মন হূনের অনুচরগণের ব্যবহার হইতে তাহা বুঝা যায়। (অথবা মহাভারতে প্রভাসের পর আভীর ও যৌধেয়-জাতির কার্য্য হইতে।) তাহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিত্য অত্যাচার করিত, লুণ্ঠন তাহাদের একমাত্র ব্যবসায় ছিল, তাহারা দয়া মায়া জানিত না। ষোড়শ শতাব্দীতেও অমুসলমান তুর্কম্যানেরা বোখারা লুঠ করিতে আসিয়া, দয়াভিখারী এক সাধু মৌলবী ও তাহার চারিশত বালক ছাত্রকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিয়াছিল। আর সেই জাতিই ভারতে আসিয়া হিন্দু হইয়া রাজপুতে পরিণত হইল, শৌর্য্য বীর্য্য ত্যাগ স্বামিধর্ম্ম (প্রভুভক্তি) এবং উদারতা (Chivartry)র দৃষ্টান্ত হইল। হিন্দু হইয়া তাহারা আদর্শ মানিল কাহাকে? রাজযোগী রামচন্দ্রকে, সিংহাসনত্যাগী ভরতকে, বীর-কুমার সত্যপরায়ণ ভীষ্মকে, সীতা সাবিত্রীকে।

ইহা দেখিয়া একজন ইংরাজ সত্যই বলিয়াছেন "হিন্দু-ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ সত্য হিন্দুসভ্যতার আকর্ষণীশক্তি। ইহার বলে হিন্দুসমাজ মুসলমান ও ইউরোপীয় (না, খৃষ্টান) ব্যতীত আর সমস্ত বিদেশী আক্রমণকারীকে হজম করিয়া নিজের অংশে পরিণত করিয়াছে। যে সব হিন্দুরা বুঝেন না যে, কিরূপে তাঁহাদের দেশ, মধ্য এসিয়ার গৃহহীন বর্ব্বরদিগকে পোষ মানাইয়া সভ্য করিয়াছে, উন্মত্ত তুর্কমান্ জাতিগুলিকে বিখ্যাত রাজপুতরাজবংশে পরিণত করিয়াছে, তাঁহারা ভারতের প্রকৃত গৌরব ও মহত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ।" A. M. T. Jackson I. C. S)"

পূর্ব্বে যে ত্যাগিসম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই সর্ব্ববিধ কার্য্যে নেতৃত্ব করিবার যোগ্য। অবশ্য অসাধারণ-শক্তিমান্ গৃহস্থ দ্বারাও একার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগিসম্প্রদায়ের কর্ম্মঠ সন্ন্যাসীরাই এই কার্য্যের নেতৃত্ব লইবার যথার্থ অধিকারী। ত্যাগী বা সন্ন্যাসী, সমাজের খাতির রাখেন না—সমাজের ভ্রকুটীদর্শনে ভীত হন না—নির্ভয়ে কর্ত্তব্যকর্ম্ম

করিতে পারেন। এই শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসিগণ একত্রে সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাধারণ অভিজ্ঞ গৃহস্থেরা, অজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচার করিতে পারেন। সন্ন্যাসী যথার্থ নেতা হইবেন, অভিজ্ঞ গৃহস্থ, অজ্ঞগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করিয়া সন্ন্যাসীর কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন, এইরূপ হইলে মঙ্গলের আশা করা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের শিক্ষিত গৃহস্থেরা অজ্ঞজনগণের কল্যাণ-সাধনার্থে কিছুই করেন না; স্বীয় স্বীয় পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নেই তাঁহারা বিভোর। সমাজের হিতচিন্তা এবং হিতচেষ্টা করা গৃহস্থমাত্রেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া অন্যায়, সন্দেহ নাই।

যে কোনও সমস্যা উপস্থিত হউক্ না কেন, তাহার একটা মীমাংসা করাই যায়। যত্ন-চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। তবে নিশ্চেষ্টভাবে স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে, কোনও অনিষ্টেরই প্রতীকার করা যায় না। আপদের প্রতীকারার্থে চেষ্টা করায় দোষ নাই। আপাততঃ প্রচুর চেষ্টায়ও ফললাভ না হইতে পারে, হয়ত অনেকবার অকৃতকার্য্য হইতে পারি, কিন্তু অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিলে, কালে যে সুফললাভ ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকিতে পারেনা।

প্রাচীনভারতের সম্মুখে বহু সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালের মনীষিগণ তাহার মীমাংসাও করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে তাহার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে একসময়ে যে উপায় অবলম্বন করায় যে সমস্যার মীমাংসা হয়, অন্য সময়ে সেই উপায় অবলম্বন করিলে সে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারেনা। অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নদীবহুল দেশ বহুকাল পরে যখন নদাহীন হয়, তখন সেখানকার লোককে পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী বা কূপ-খননের ব্যবস্থা করিতে হয়। শৈশবের ব্যবস্থা যৌবনে চলেনা, আবার যৌবনের ব্যবস্থা বার্দ্ধক্যে কার্য্যকরী হয় না। দেশকাল-পাত্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কার্য্য করা চলেনা। সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে সমাজসংস্থান বা ধর্ম্মভাব যেরূপ ছিল, বর্ত্তমানে অবিকল সেরূপ নাই, থাকিতেও পারেনা। প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তনের আয়োজন করিতে হয়। এই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ আবির্ভূত হইয়া সময়োচিত শাস্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্নরূপ "যুগধর্ম্ম" প্রচার করিয়া থাকেন। এই জন্যই বিভিন্ন যুগধর্ম্ম ও যুগাবতারের আবশ্যক হইয়া থাকে। একযুগে এক শাস্ত্র

কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করে, অন্যযুগে অন্যশাস্ত্র দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা নূতন কথা নয়—শাস্ত্রের অক্ষয়ভাণ্ডারে ইহার প্রমাণপরিচয় পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে দেখি—

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাঃ ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ মতাঃ।

সত্যযুগে মনুক্ত-শাস্ত্রবর্ণিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতমীয় ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খলিখিতের ধর্ম্ম এবং কলিযুগে পরাশর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্ম বিশেষভাবে অনুষ্ঠেয়। কলিধর্ম্মপ্রবক্তা মহামুনি পরাশর, কলির জন্য বিশেষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াগিয়াছেন। কি বাহ্যজগতে, কি অন্তর্জ্জগতে, সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনস্রোত চলিতেছে। যেমন জড়জগৎ পরিবর্ত্তনের লীলাক্ষেত্র, ধর্ম্মজগৎও তেমনি। কোনও অবস্থাই চিরস্থির নয়, সুতরাং কোনও ব্যবস্থাই অপরিবর্ত্তনীয় হইতে পারেনা। সমাজের গতিপথ যখন বদলাইয়া যায়, তখন নূতনভাব, নূতন শাস্ত্র ও নূতন শিক্ষার প্রবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হয়। ধর্ম্মাচার্য্যগণ নূতন শাস্ত্র প্রচার করেন—সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ নূতন ব্যাখ্যার অবতারণা করেন, ইহার নিদর্শনের অভাব নাই। সমাজের গতি যেদিকে হয়, শাস্ত্রব্যাখ্যাও তাহারই অনুকূলে যায়। বিভিন্ন আচারের সমর্থনে শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ এ কথার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়াগিয়াছেন। নিবন্ধগ্রণী মাধবাচার্য্য মাতুলকন্যা বিবাহ করিবার অনুকূলে বেদাদিশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মনুবচনের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াগিয়াছেন। বিখ্যাত রঘুনন্দন বঙ্গের সিদ্ধতণ্ডুল-ভক্ষণ (সিদ্ধ চাউল খাওয়া) সমর্থন করিতে গিয়া শাস্ত্রপ্রমাণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখাইয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। মোটের উপর 'যখন যেমন তখন তেমন' এই সাধারণ নিয়ম না মানিলে কল্যাণের পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়—একথা এখন না বুঝিলে চলিবে না, আর এরূপ বুঝাও উচিত।

সকলেরই জীবনরক্ষার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। কি ব্যক্তিগতভাবে, কি জাতিগতভাবে, মরণনিবারণের চেষ্টায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। সকলেরই জীবনরক্ষার প্রযত্ন প্রশংসনীয়, কিন্তু অপরের ধ্বংস-সাধনের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা সমীচীন নহে। আত্মস্বার্থে কাহারও ঔদাসীন্য সঙ্গত নহে, কিন্তু অপরের স্বার্থের অবিরোধে আত্মস্বার্থরক্ষাই শোভন ও সুসঙ্গত। যেভাবে অপরের ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থের সহিত আত্মস্বার্থের

সংঘর্ষ বা বিরোধ না ঘটে, প্রত্যুত সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সংঘটিত হয়, সেইরূপ-ভাবে আত্মস্বার্থের অনুশীলনই সুসঙ্গত। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তিই [illegible]। এত [illegible] সহিত সমাজগত বা ধর্ম্মগত স্বার্থের সামঞ্জস্য [illegible] না, ইহা সুলক্ষণ নহে। সকলপ্রকার স্বার্থের সামঞ্জস্যে দৃষ্টি রাখিয়া পরস্পর স্বার্থের অবিরোধে আত্মস্বার্থসাধনের প্রযত্ন করিতে হইবে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের সমস্যার সুমীমাংসা হইবে। হয়ত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে গেলে, আপাততঃ বহুবার বিফলকাম হইতে হইবে, কিন্তু পরিণামে যে কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সর্ব্বসামঞ্জস্যে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমানসমস্যার সমাধান করিতে হইলে, সমগ্র জগতের মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। আমরা আপাততঃ যে উপায়ে সমস্যার সমাধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, জগতের অন্যান্য জাতি সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কিনা, তাহার আলোচনায়—অনুশীলনে ইষ্টলাভ ভিন্ন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই। মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, হয়ত আমরা দেখিতে পাইব, আমরা বর্ত্তমানে যে সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছি না, অপরজাতি সে সমস্যার সুচারুরূপ সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি এমন হয় যে, তাঁহারা এবং আমরা ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে থাকায় তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় সর্ব্বাংশে আমাদের পক্ষে হিতকর হইতে পারেনা, তাহা হইলেও একথা সত্য যে, আমরা তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ের আলোচনা দ্বারা নিজেদের হিতকর উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় ও চেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্যলাভ করিতে পারিব। এই সাহায্যলাভ কি উপেক্ষণীয়? তুলনামূলক সমালোচনায় আমরা গ্রাহ্য উপায় যদি নাই পাই, ত্যাজ্য স্থির করিতে পারিলেও তাহাই যথেষ্ট লাভ। বিদেশীয় ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণের অবলম্বিত উপায় যদি উত্তম হয়, তবে আমরা তাহার অনুসরণ করিব না কেন? পৈতৃক "গড়াপুকুরের" কদর্য্য জল পান করিব, তথাপি অপরের অবলম্বিত নির্দ্দোষ উপায়ে তাহা শোধন করিয়া পান করিতে প্রস্তুত হইব না, ইহা কখনই সঙ্গত নহে। আমরা দেখিতেছি, একজাতীয় জ্বরের নিবারণে কুইনাইন্ নামক বৈদেশিক তিক্ত ঔষধ অমোঘশক্তিশালী। অস্মদ্দেশে বহুকাল হইতে গুলঞ্চ, নিম, নাটা প্রভৃতি যে সকল জ্বরনাশক তিক্তদ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

তাহাদের কোনওটীই ঐকাহিক জ্বরের নিবারণে কুইনাইনের সমকক্ষ নহে। এরূপ অবস্থায় কি আমরা ঐকাহিক জ্বর হইতে পেরুদেশীয় কুইনাইন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া জ্বরের কবলে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিব? অন্যদেশীয় লোকেরা যেমন তাঁহাদের ভেষজবিজ্ঞানে এদেশের অশোক, কালমেঘ, গুলঞ্চ, চিরতা, নিম প্রভৃতিকে স্থান দিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ পেরুর কুইনাইন্‌কে অস্মদ্দেশীয় ভেষজবিজ্ঞানে স্থানদান করিব না কেন? আমাদের জানা উচিত—

"তাতস্য কূপোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।" অপরের ভালটুকু লইব, মন্দটুকু লইব না—ইহাই সঙ্গত।

অন্ধ অনুকরণ কল্যাণদায়ক নহে। একদল মনে করেন—বিদেশের সবই উত্তম, আবার একদল মনে করেন—এদেশের সবই উৎকৃষ্ট। এই উভয় দলই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী। বিদেশে স্বদেশে সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট আছে। উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কোনও দেশের বা জাতির একচেটীয়া নহে। অপরদেশের সামগ্রী লইবার সময় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয়। বিদেশেও মন্দ আছে।

ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ আমেরিকায় নিজ চণ্ডনীতির সাহায্যে স্বার্থদ্বন্দ্বের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গগণ আমেরিকায় গেলে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রক্তাঙ্গ মানবগণের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ-সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। তখন শ্বেতাঙ্গগণ, শ্বেতাঙ্গ ও রক্তাঙ্গের স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধনে অসমর্থ হইয়া, চণ্ডনীতি বা ধ্বংসনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন—অধিকাংশ রক্তাঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া শ্বেতাঙ্গগণের স্বার্থের বিরোধী রক্তাঙ্গের স্বার্থের উচ্ছেদসাধন করেন। এখনও আমেরিকায় রক্তাঙ্গমানবের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এখন আর মানবসমাজে তাহাদের স্থান নাই—অরণ্যে পর্ব্বতে মানব-সভ্যতার অগোচরে তাহারা অমানুষ বন্যজীবন যাপন করিতেছে। এক্ষেত্রে ধ্বংসনীতি জয়যুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা মানবসভ্যতার সমুজ্জ্বল অংশের অন্তর্নিবিষ্ট নহে, সুতরাং এক্ষেত্রে সমস্যার সুমীমাংসা হইয়াছে বলা যায় না।

সুন্দরবনে গিয়া আমরা যখন কাষ্ঠচ্ছেদন ও শস্যরোপণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন সুন্দরবনের অধিবাসী ব্যাঘ্রাদির সহিত আমাদের স্বার্থ-সংঘর্ষ ঘটে; ফলে আমরা ব্যাঘ্রকুলের বিনাশসাধনে যত্নবান্ হই। ব্যাঘ্রও

বিশ্বরাজ্যের প্রজা। বিশ্বজনীন সত্যে একস্থানে ব্যাঘ্রের স্থানও প্রয়োজনীয়। ব্যাঘ্রজাতির ধ্বংসসাধন কখনই সঙ্গত নহে। বিশ্বের কোনও জীবজাতি বা কোনও দ্রব্যবিশেষ নিরর্থক নহে। সকলেই স্ব স্ব অধিকারে বিদ্যমান থাকিয়া বিশ্বমঙ্গলের এক এক অংশের অভিনয় করে। ব্যাঘ্রজাতির ধ্বংসসাধন অধর্ম্ম। রক্তাঙ্গমানব-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন তদপেক্ষা অধিকতর অন্যায়! ব্যাঘ্র ইতরজীব, কিন্তু রক্তাঙ্গমানব মানবই বটে, তাহারও জীবনরক্ষার প্রয়োজন আছে। অতএব বলা যায়, ধ্বংসনীতির আশ্রয়ে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারেনা। অসভ্যসমাজে ধ্বংসনীতির প্রচলন আছে। অসভ্যসমাজের জনগণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে বিনষ্ট করিয়া সেবা ও জীবিকা-ঘটিত সমস্যার মীমাংসা করিয়া থাকে। অসভ্যসমাজে নিজের জীবিকার জন্যই সকলে শ্রম করিতে বাধ্য হয়, বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য লোকের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে, নিজ জীবিকার্থে সম্পূর্ণশ্রমের নিনিয়োগ ঘটে না—সেবার জন্যও শ্রমের একভাগ ব্যয় করিতে হয়; কাজেই সেবার্থে সময় ব্যয় করিতে অপারগ হইয়া অপত্যেরা সেব্য বৃদ্ধকে বিনাশ করিয়া সহজে সমস্যার মীমাংসা করে। অসভ্যমানবগণের মধ্যে মানবত্বের বিকাশ না হওয়াতেই তাহারা এইরূপ মীমাংসার সমাদর করিতে পারে। মানবত্ব পরিস্ফুট হইলে মানুষ উপলব্ধি করে—সেবার মধ্যেই কর্ত্তব্য ও শান্তির প্রতিষ্ঠা, সংরক্ষণেই সুখের বাস, ধ্বংসের মধ্যে শান্তিসুখের স্থান নাই।

সভ্যমানবসমাজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যেভাবে এই স্বার্থসমস্যার মীমাংসা করিয়াছে, তাহার সকলই এইশ্রেণীর নয়। প্রাচীনভারতের হিন্দুগণ চণ্ড-নীতির আশ্রয় না লইয়া সমন্বয়নীতির সাহায্যেই এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। আর্য্যগণ যখন পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে উপনিবেশস্থাপন করেন, তখন ভারতের অধিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের স্বার্থসংগ্রাম উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা অনার্য্যগণের উচ্ছেদসাধন করিতে চাহেন নাই, অনার্য্যগণকে আর্য্যসমাজে স্থান দিয়া সমস্যার মীমাংসা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখি—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ।

আর্য্যসমাজের তিনবর্ণ দ্বিজাতি, শূদ্র একজাতি এই চারিবর্ণ, পঞ্চম বর্ণ নাই। পরে কিন্তু অনার্য্য নিষাদগণ আর্য্যসমাজে গৃহীত হওয়ায় "নিষাদঃ

পঞ্চমোবর্ণঃ” লেখা হইল। মাদ্রাজে এখনও “পঞ্চম”বর্ণ বিদ্যমান। বেদের ‘পঞ্চজন’ও এই পঞ্চমবর্ণের মত। অনার্য্যজাতির নানাশাখার নানাসম্প্রদায়কে ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজে গ্রহণ করা হইয়াছে, এই সংবাদ শাস্ত্রে নানাস্থানে নানাভাবে বর্ণিত আছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু বহির্ব্যাপারে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের অধীন, তদ্রূপ প্রাচীন অনার্য্যগণ স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে পূর্ণস্বাধীনতা ভোগ করিতেন, আবার আর্য্য-অনার্য্য-সাধারণ কতকগুলি নিয়ম তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইত। প্রথমতঃ এইরূপ ভেদাভেদের মধ্যে তাঁহারা ছিলেন। শেষে দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে অনার্য্যগণের উন্নতি হওয়ায় আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে একেবারেই স্বসমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন; অবস্থানুসারে উচ্চ অধিকারও দিয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যসমাজ সংরক্ষণনীতির সহায়তায় সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যতদিন ভারতীয় সমাজ স্বাধিকারে বিদ্যমান ছিল, ততদিন এই সংরক্ষণনীতি বা সামঞ্জস্য-মত অনুসারে সকল সমস্যার মীমাংসা হইত। পরাধিকারে সমাজের সে শক্তির হ্রাস হওয়ায় বর্ত্তমান দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। সামঞ্জস্যরক্ষার শক্তি হারাইয়াই সমাজ শতদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে শক্তি—সে অব্যাহত সামঞ্জস্য থাকিলে দেশের—সমাজের বর্ত্তমান দোষসমূহ উপস্থিত হইত না। সামঞ্জস্যস্থাপন-শক্তির পরিচালনা করিতে পারিলেই হিন্দুসমাজের ভীষণ সমস্যার সমাধান হইবে। পরায়ত্ত-শাসনের ফলে সমাজ সামঞ্জস্যশক্তি হারাইয়া জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিলেই সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের শক্তি আবার আবির্ভূত হইবে।

শ্রী———

রূপক ও প্রকৃতি উপাসনা।

স্বারূপ্যমূলক উপাসনাই রূপকোপাসনা। রূপকোপাসনায় উপাসকের এই জ্ঞান থাকে যে, পরমাত্মার সহিত প্রাণ, মন, বাক্য বা আকাশ বায়ু তেজঃ প্রভৃতি পদার্থের ভেদই বিদ্যমান, তথাপি সাধর্ম্ম্যবশতঃ ঐক্যচিন্তাই বিহিত।

ভেদসত্ত্বে অভেদের আরোপই রূপক। কোন একটি বা দুই চারিটি সাধর্ম্ম্য দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া "ইহা উহাই" ইত্যাকার সারূপ্যমূলক চিন্তাধারাই রূপকোপাসনা।

ছান্দোগ্য উপনিষদে মনকে ও আকাশকে ব্রহ্মবোধে, প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ-রূপে উপাসনার ব্যবস্থা আছে। "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যাধ্যাত্মং" মনোব্রহ্মের উপাসনা আধ্যাত্মিক-রূপকোপাসনা। মনোব্রহ্মেরই আবার বাক্য, প্রাণ, চক্ষু কর্ণ, চারিটি পাদ কল্পিত। এইরূপ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপকো-পাসনাও আছে। এই আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক রূপকোপাসনা ব্যতীত অন্যবিধ রূপকোপাসনাও অতিপ্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল।

ব্রহ্ম জগদাকারে; জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহারই অধ্যস্ত অংশ মাত্র—ইত্যাকার ধারণা রাখিয়া উপাসনা করাকে রূপকোপাসনা বলে না। কারণ, রূপকে প্রকৃত ভেদই বর্ত্তমান। "যাহা কিছু দৃশ্যমান বস্তু, সমস্তই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র—"ইত্যা-কার ধারণা থাকিলে প্রকৃত ভেদ থাকে না। উপাসকের ধারণায় ভেদ-বোধ না থাকিলে রূপকোপাসনাই হইবে না। অতএব আমাদের "প্রতিমাপূজা" রূপকোপাসনা নহে। কারণ, আমাদের এই ধারণা রাখাই প্রয়োজন যে, প্রতিমারূপ দুর্গাকালী শিব কৃষ্ণ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। সমস্ত বস্তু তাঁহারই ব্যবহারিক প্রকাশ,—এইজন্য আলম্বনরূপে গৃহীত সকল বস্তুকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ করিলে তাহা একপ্রকার ব্রহ্মবিষয়িনী ধারণা হইবে। রূপকো-পাসক জানে যে, "মন ব্রহ্ম নহে, আকাশ ব্রহ্ম নহে, পৃথিবী ব্রহ্ম নহে।" প্রকৃত প্রতিমাপূজকও জানে, প্রতিমা ব্রহ্মেরই প্রতিমা বা প্রতিবিম্ব মাত্র; "প্রতিমা ব্রহ্ম নহে" ইহা জানিয়া প্রতিমার পূজা, আসল প্রকৃতিপূজা নহে। অতিপ্রাচীনকালের রূপকোপাসনা ঠিক্ কি প্রণালীতে প্রচলিত ছিল, তাহার মূলধারাটি ঠিক্ কোন্ পথ দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা এক্ষণে আমাদের জানা নাই। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে যে রূপকোপাসনা পাই, তাহা আমা-দের ভালও লাগেনা, আর ঐ প্রকারের উপাসনা করিতে ভয়ও হয়। মনে হয়, ঐ রূপকোপাসনা উঠিয়াগিয়াছে—ভালই হইয়াছে।

জড়প্রকৃতির উপাসনাই আসল প্রকৃতি-উপাসনা। "অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতির উপাসনা করিলেই আমাদের হইল,—এ ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই" এইরূপ বোধে উপাসনা করাই জড়প্রকৃতি-উপাসনা। পরমাত্মার চৈতন্যে চৈতন্যময়ী প্রকৃতি—প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই—আর ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি বা

স্থজনেচ্ছাই প্রকৃতি—ইত্যাকার ধারণা-পূর্ব্বক প্রকৃতি-উপাসনা, জড়প্রকৃতি-উপাসনা আছে; ইহাও একপ্রকার ব্রহ্মোপাসনারই নামান্তর। জড়প্রকৃতি-উপাসনাই যে প্রকৃতি-উপাসনা, ইহা আমরা বলিয়াছি। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় প্রকৃতি-উপাসনাই সাধারণে করিত। জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে ও মহিমায় বিস্মিত হইয়া মানব প্রথম ঐ প্রকৃতিরই ভক্ত হয়—তাহারই উপাসক হয়। ক্রমে বিশিষ্ট উপাসকেরা ঐ জড়প্রকৃতি-উপাসনার জড়ত্বটুকু ত্যাগ করিতে থাকেন।

উপনিষদে আত্মতত্ত্ব ভূয়োভূয়ঃ উদাহৃত, তথাপি সে পুণ্যময় সময়ে কয়-জনই বা উপনিষদুক্ত আত্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুশীলন করিত, আর তন্মধ্যে কয়জনই বা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইত!

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।

সহস্রের মধ্যে একটি শ্রোতাও পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ; শুনিলে সে তত্ত্ব অধিকৃত করিত—এমন লোক প্রায় মিলিতই না।

রূপক-উপাসনা ও প্রকৃতি-উপাসনা নিকৃষ্ট উপাসনা। উপাসকের প্রাণের ক্ষুধা, মনের তৃষ্ণা তাহাতে মিটিত না। অথচ আত্মোপাসনা সাধারণের নিকট দুরধিগম্য ছিল, শান্তমনে অনন্তের ধারণা এতই সুকঠিন ছিল; তাই উপনিষদের পরেও উপাসনা আরও সহজ সরল করিবার আবশ্যক হইল। তখন শ্রীভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মময়ী গীতার সৃষ্টি করিলেন। "সর্ব্বতোভাবে আমাকে ডাক, আমাকে ভাব, আমারই উপর নির্ভর কর, ফলাফল আমাতে সমর্পণ করিয়া নিমিত্ত-মাত্র হইয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া যাও" এই প্রকার উপদেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন গল্পের আকারে সাধারণ নরনারীর মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্ম্মভাব ফুটাইতে লাগিলেন। নানাবিধ আদর্শ দেখাইয়া অসংখ্যপ্রকার কথা প্রচার করিয়া সর্ব্বধর্ম্মময় পুরাণ সৃষ্টি করিলেন। সে কথা এমনই মধুর, জ্ঞানপ্রদ, ভক্তিভাবময় অথচ কৌতূহলোদ্দীপক যে, সাধারণ নরনারী তাহার কিছু না কিছু না জানিয়া পারে না।

ভক্তিময় ঈশ্বরবাদ প্রচলিত হইল। তাহা অপেক্ষা সরল হৃদয়গ্রাহী অবতারবাদ পরিব্যাপ্ত-ভাবে দেখা দিল। ঈশ্বরবাদ বরাবরই যে আকারে ছিল, তাহা ঠিক ভক্তিময়ই ছিল, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। ভক্তিময় ঈশ্বরবাদ, ব্রহ্মবাদ অপেক্ষা যে সর্ব্বসাধারণের নিকট উপাদেয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ

নাই। আর অবতারবাদে মানবরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব—তাহা আরও মধুর, আরও কোমল। সেই দূরবর্ত্তী জগদতীত তিনি, আমাদের মত হইয়া আমাদের উদ্ধার করিতে আসেন, আসিয়াছিলেন, আবার আবশ্যক হইলে আসিবেন, ইহা ভাবিতে কতই তৃপ্তি। বাস্তবিক প্রতিমা-উপাসনা, অবতারবাদ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ, সহজ এবং খাটিতি হৃদয়মনগ্রাহী। আমার যিনি উপাস্য, তিনি আমারই গৃহে বর্ত্তমান, আমি যাঁহার পূজা করিব, তিনি আমারই সম্মুখে বিদ্যমান।

খাঁটী পরিপূর্ণতার ইয়ত্তা করা অপূর্ণস্বভাব মানবের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব; তাই খণ্ডশঃ বিভক্ত করিয়া সেই পরিপূর্ণতারই উপদেশ করা হইয়াছে। গোলাকার বস্তুর ধারণা করিতে হইলে, এক একটি পার্শ্বের ধারণা অগ্রে প্রয়োজন হয়। অখণ্ড আকাশ, সমগ্র পৃথিবী, বিশাল সমুদ্রের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, অগ্রে খণ্ডশঃ জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক হয়। আংশিক জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞানে উপনীত হইয়া থাকে; প্রতিমা-উপাসনা আপাততঃ কার্য্যোপাসনা বটে, কিন্তু কার্য্য কারণের বহির্বিকাশ,—কারণ হইতে কার্য্যের প্রকৃত পার্থক্য নাই—এই প্রকার ধারণা হইলে, কার্য্যোপাসনাও কারণোপাসনাই হইল। জড়প্রকৃতি-উপাসনা খাঁটি কার্য্যোপাসনা; কারণোপাসনার সহিত এই জড়প্রকৃতি-উপাসনারূপ কার্য্যোপাসনার সম্বন্ধ নাই। আমাদের প্রতিমাপূজাকে যদি প্রকৃত উপাসনাই বলিতে হয়, তবে চিন্ময়-প্রকৃতিউপাসনাই বলিতে হইবে। জড়প্রকৃতি-উপাসনাই বিবর্ত্তিত হইয়া চিন্ময়প্রকৃতিউপাসনা আকার ধরিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। পূর্ব্বকার কোন বিষয়ের দোষটুকু ত্যাগ করিয়া, সেই বিষয়টিকে নির্দ্দোষ সুন্দর করা, ভাল বই মন্দ নহে। সম্পূর্ণ কোন নূতন ধারা আনা অপেক্ষা পুরাতন ধারাটিকে সংস্কার করিয়া লওয়া সহজ। সাগরে যাইতে হইলে নদীমুখ দিয়াই যাইতে হয়; সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতে হইলে, অগ্রে স্থূললক্ষ্যভেদ শিক্ষার অভ্যাস আবশ্যক করে। আমরা যে প্রতিমায় ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাহার নাম ব্রহ্মোপাসনাই হউক বা চিন্ময়প্রকৃতিউপাসনাই হউক, ফলে কোন তারতম্য হইবে না।

আমাদের উপাসনা যে রূপকোপাসনা নহে এবং জড়প্রকৃতিউপাসনা নহে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। রূপক ও জড়প্রকৃতির উপাসনা নিকৃষ্ট, তাহা মানি, আর তাহা বর্ত্তমানকালে প্রচলিত হওয়ার পক্ষপাতী আমরা নহি—ইহাও স্বীকার করি।

তবে একথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারিনা যে. প্রতিমাপূজার সহিত রূপক ও জড়প্রকৃতি-উপাসনার আপাতদৃষ্ট কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছেই। এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রূপক ও প্রকৃতি-উপাসনার আলোচনায় হাত দিলাম। বুঝাইতে পারিলাম কিনা, তাহা পাঠকবর্গই বিচার করিবেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

সান্বয়ব্যাখ্যা। বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্জ্ঞানাবাপ্তিং দর্শয়তি। অহং (পরব্রহ্ম) সর্ব্বস্য প্রভবঃ (মরীচিমন্বাদিবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ) মত্তঃ (এব) সর্ব্বং (সৃষ্টিস্থিতিনাশক্রিয়া-রূপং জগৎ বুদ্ধি-জ্ঞানমিত্যাদি যাবৎ) প্রবর্ত্ততে, ইতি মত্বা বুধাঃ (বিবেকিনঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) সন্তঃ মাং ভজন্তে। ৮

বঙ্গানুবাদ। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে—এইরূপ জ্ঞাত হইয়া, বুদ্ধিমান্‌গণ প্রীতিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকেন। ৮

আলোচনা। ভগবান্‌ই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই পুরাণ-পুরুষ ও স্বয়ং অনাদি। লোকের বুদ্ধি জ্ঞান প্রবৃত্তি সকলই ভগবান্ হইতে প্রবর্ত্তিত; তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা। বিবেকিগণ এইরূপ দৃঢ়ধারণাযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করেন। ৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

সান্বয়ব্যাখ্যা। মচ্চিত্তাঃ (ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ) মদ্গতপ্রাণাঃ (মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণাইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ)

(এবম্ভূতা বুধাঃ) বোধয়ন্তঃ (মাং অবগময়ন্তঃ) পরস্পরং (অন্যোহন্যং) কথয়ন্তঃ (সঙ্কীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তো) নিত্যং তুষ্যন্তি (তুষ্টিং যান্তি) রমন্তি (রতিং প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগাত্তোব) ৯

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের চিত্ত আমাতেই আসক্ত এবং প্রাণ আমাতেই সমর্পিত, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া ও অপরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া, পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ৯

আলোচনা। ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বস্তুতেই যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়না, যাঁহারা তদ্গতজীবন—তাঁহাকে ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ, যাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হয়না—এই প্রকার ভগবন্মনা ব্যক্তিগণ বা গুরু-শিষ্য পরস্পর ভগবৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দ অনুভব করেন। ইহাই সাধুসঙ্গ। পার্থিব জীবনে ভগবদ্ভক্তের ইহা অতুল আনন্দ। ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

সান্বয়ব্যাখ্যা। এবম্ভূতানাং চ সম্যক্ জ্ঞানং অহং দদামি ইতি আহ, তেষা-মিত্যাদি। সততযুক্তানাং (নিত্যাভিযুক্তানাং) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (মত্তত্ত্ববিষয়ং সম্যগ্দর্শনং বুদ্ধিঃ তেন যোগো বুদ্ধিযোগঃ তত্ত্বজ্ঞানং) দদামি (উত্পাদয়ামি) যেন তে (মদ্ভক্তাঃ) মাং উপযান্তি (লভন্তে) ১০

বঙ্গানুবাদ। এবম্ভূত ভক্ত যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক সতত আমারই ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। ১০

আলোচনা। আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনায় বলিয়াছি যে "বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে, ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া "ইহার অভীষ্টসিদ্ধ হউক্" এই প্রকার সঙ্কল্প-সহকারে যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন"। যাঁহাদের চিত্ত উত্তরাভিমুখ দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় ভগবদভিমুখ হইয়া আছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হয়। সেই কৃপাদৃষ্টিই বুদ্ধিযোগদান। বুদ্ধিযোগের অনুশীলনে জ্ঞানের বিকাশ হয়, বিজ্ঞান-সহিত সেই জ্ঞানের ফল ভগবত্প্রাপ্তি। কৃপাদৃষ্টির গুণে ভক্ত সাধকের হৃদয়ে নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হয়। ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য মন প্রাণ ব্যাকুলিত ও লালায়িত হইলে, অন্তর্যামী ভগবান্ স্বয়ং সাধকের বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া দেন। যে বুদ্ধি দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার সাধনা দ্বারাই সাধক সেই বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

সান্বয়ব্যাখ্যা। বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা পরিত্যক্ত-সংসারং নাশয়ামীত্যাহ। তেষাং (মদ্ভজনসক্তানাং ভক্তানাং) অনুকম্পার্থং (অনুগ্রহার্থং, দয়াহেতোঃ) এব অহং আত্মভাবস্থঃ (আত্মনো ভাবোঽন্তঃকরণাশয়ঃ তস্মিন্নেব বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্) জ্ঞান-দীপেন (বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তি-প্রসাদ-স্নেহাভিষিক্তেন) ভাস্বতা (বিস্ফুরতা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানপ্রসূতং অবিদ্যা-কৃতং) তমঃ নাশয়ামি। ১১

বঙ্গানুবাদ। আমি সেই ভক্তগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া, দীপ্তিশালী জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকি। ১১

আলোচনা। ভগবান্ বহুবার বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমারই উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদের সমস্ত ভারই গ্রহণ করিয়া থাকি।" পুনঃও বলিতেছেন "যাঁহারা সতত প্রীতিযুক্ত হইয়া আমারই ভজনা করেন, আমি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া, তাঁহাদের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানালোক জ্বালিয়া দেই।" কেবল পরমাত্মা পরমেশ্বরের অনুকম্পা বলেই যে সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা শ্রুতিতেও অবগত হওয়া যায়। উপনিষদে আছে যথা—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

কঠ-উপনিষৎ ১।২৩

অর্থাৎ কেবল স্তুতি দ্বারা বা কেবল চিন্তা দ্বারা বা বেদাদিপাঠ দ্বারা আত্ম-লাভ হয় না। তিনি যাঁহাকে বরণ অর্থাৎ অনুসন্ধান করেন, তাঁহা দ্বারাই তিনি লভ্য হন। আমাদিগের সাধারণ-বুদ্ধি দ্বারা ভগবৎসত্তা অনুভব করা যায় না। বাহিরের কোন প্রক্রিয়া দ্বারা এ অজ্ঞান-অন্ধকার নষ্ট হয় না; তিনি কৃপা করিয়া সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দিলেই হয়। ১১

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

সান্বয়ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন উবাচ। ভবান্ পরং ব্রহ্ম (পরমাত্মা) পরং ধাম (শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ঃ) পরমং (প্রকৃষ্টং) পবিত্রং (পাবনং) শাশ্বতং পুরুষং (নিত্যং পুরুষং) দিব্যং (স্বয়ংপ্রকাশং) আদিদেবং (সর্ব্ব-দেবানাং আদিভূতং) অজং (অজন্মানং) বিভুম্ (বিভবনশীলং ব্যাপকং) ত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষিঃ নারদঃ অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ আহুঃ স্বয়ং (সাক্ষাৎ) চৈব মে মহ্যং ব্রবীষি। ১২।১৩

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন—তুমি পরমাত্মা পরম আশ্রয়, পরম পবিত্র নিত্য পুরুষ, স্বয়ংপ্রকাশ, অজ, আদিদেব ও সর্ব্বব্যাপক,—দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি সকল ঋষি এইপ্রকার বলিয়াছেন, তুমিও আমাকে তাহাই বলিতেছ। ১২।১৩

আলোচনা। কাহারও নিকট কোন উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, তাহা যদি শাস্ত্রোক্তি ও বিজ্ঞজনের বাক্যের সহিত এক হয়, তাহা হইলে তাহাতে নিঃসন্দেহ দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে। তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন "হে ভগবন্! তুমি যে পরমাত্মা, সমস্ত জগতের আশ্রয়, তুমি যে পরম পবিত্র স্বয়ং-প্রকাশ, অজন্ম সর্ব্বব্যাপী নিত্যপুরুষ,—তাহা দেবতা এবং ঋষিগণ ও ভক্তি-সূত্র প্রণেতা নারদ, বেদ-মন্ত্র-স্রষ্টা ঋষি অসিত, দেবল ও বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণও পূর্ব্বে বলিয়াছেন; তুমিও স্বয়ং তাহাই বলিতেছ; অতএব তোমার বাক্যে আমার কোন সন্দেহ থাকিল না। আমার বুদ্ধি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। ১২।১৩

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে কেশব যৎ মাং বদসি (ভাষসে) এতৎ সর্ব্বং ঋতং (সত্যং) মন্যে হি (যতঃ) হে ভগবন্ দেবা দানবাশ্চ তে (তব) ব্যক্তিং (প্রভবং আবির্ভাবং) ন বিদুঃ (তাং হি অর্ব্বাচীনাঃ মনুষ্যাঃ কুতঃ) ১৪

বঙ্গানুবাদ। হে কেশব, তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে, তাহা সমস্তই আমি সত্য বলিয়া মনে করি। হে ভগবন্! দানবগণ ও দেবতারা তোমার প্রভাব অবগত নহেন। ১৪

আলোচনা। ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হইয়াই জীব তাঁহার প্রভাব জানিতে পারেনা। ভগবান্ দয়া করিয়া না বুঝাইলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারেনা। এ

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেব-দেব জগৎপতে॥

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে পুরুষোত্তম হে ভূতভাবন (ভূতোৎপাদক) হে ভূতেশ (ভূতানামীশ) হে দেবদেব (দেবতানাং আদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক) হে জগৎপতে (বিশ্বপালক) ত্বং (নান্যঃ) স্বয়ং এব আত্মানং বেত্থ (জানাসি) (নতু সাধনান্তরেণ)। ১৫

বঙ্গানুবাদ। হে পুরুষোত্তম, হে যাবতীয় ভূতের সৃষ্টিকারক, হে ভূতগণের অধিপতি, হে দেবতাগণের দেবতা, হে বিশ্বপতি, তুমি অন্যের উপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই আপনাকে আপনার দ্বারা জান। ১৫

আলোচনা। অর্জ্জুন ভগবানের অতুলজ্ঞানবত্তা ও অপার-মহিমৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অত্যাদরে "পুরুষোত্তম ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে" প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, আত্মজ্ঞান সাধনা ব্যতীত জন্মেনা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্যের নিকট উপদেশ না পাইয়াও বা কোন প্রকার সাধনা নাকরিয়াও আপনি আপনাকে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ইনি স্বয়ং পরব্রহ্ম না হইলে, কখন ঈদৃশ স্বতঃসিদ্ধ স্বাত্মানুভূতি ইঁহার জন্মিতে পারে না। ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যাহ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি॥ ১৬

সান্বয়ব্যাখ্যা। ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ (আত্মনো বিবিধৈর্ভাবৈঃ) ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য (পূরয়িত্বা) তিষ্ঠসি (বর্ত্তসে) তাঃ দিব্যাঃ (অত্যদ্ভুতাঃ) আত্ম-বিভূতয়ঃ (বিভূতীঃ) অশেষেণ বক্তুং (কথয়িতুং) অর্হসি (যোগ্যোঽসি) ১৬

বঙ্গানুবাদ। তুমি যে বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই অত্যদ্ভুত বিভূতি সকল বিস্তারিতরূপে বল। ১৬

আলোচনা। অর্জ্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমি তোমার শিষ্য এবং শরণাগত, অতএব যাহা সত্য—তাহা আমাকে শিক্ষা দেও। অর্জ্জুন এযাবৎ ভগবানের যত উপদেশ পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে—সৃষ্টির সমস্তই ভগবানের বিভূতি। ভগবানের বিভূতি ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং সেই ভগবদ্‌বিভূতি ভগবান্ স্বয়ং ভিন্ন অন্য দেবমনুষ্যাদি কেহ অবগত নয়। অন্যে তাহার ব্যাখ্যাও করিতে পারেনা। শ্রুতি বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি
শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি—

বৃহদারণ্যক ৩। ৮। ১১

এজন্য ভগবানের মুখেই তাঁহার বিভূতি অবগত হইতে প্রার্থনা করিলেন। ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭

সান্বয়ব্যাখ্যা। হে যোগিন্ (হে যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবন্) অহং কথং (কেনোপায়েন কৈর্বিভূতিভেদৈঃ) ত্বাং (অবাঙ্‌মনসোগোচরং) সদা পরিচিন্তয়ন্ বিদ্যাং (জানীয়াম্) হে ভগবন্ ময়া ত্বং কেষু কেষু ভাবেষু চ (পদার্থেষু) চিন্ত্যঃ অসি (ধ্যেয়ঃ অসি) ১৭

বঙ্গানুবাদ। হে যোগসম্পন্ন ভগবন্, আমি তোমাকে সর্ব্বদা কিরূপে চিন্তা করিব? তুমি কোন্ পদার্থে কি ভাবে চিন্তনীয়, আমাকে বল। ১৭

আলোচনা। ভগবানের বাক্য-পরম্পরায় অর্জ্জুন বিদিত হইয়াছেন যে ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়, জগতের প্রতি বস্তুতেই তাঁহার বিদ্যমানতা; ভগবানের বিভূতি অনন্ত। তিনি কত ভাবে বিরাজমান, তাহার ইয়ত্তা নাই। সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে ধ্যানায়ত্ত করা অসম্ভব। তাই অর্জ্জুন নিজ ধ্যানোপযোগিরূপে আরাধ্য বিভূতির কথা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাচরণ দাসগুপ্ত।

বুদ্ধদেব।

হিন্দুশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নানা অবতারের বর্ণনা আছে। শ্রীভগবানের নানা অবতার—নানামূর্ত্তি। বহুস্থানে দশাবতারের উল্লেখ দেখা যায়।

বায়ুপুরাণে (একলিঙ্গমাহাত্ম্যম্—পূজাপ্রকরণম্ ১২ অঃ ৪৩ শ্লোক) দেখা যায়—মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।

রামোরামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীচ তে দশ।

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশাবতার। গরুড়পুরাণে (উত্তরার্দ্ধে ৩১ অঃ ৩৫ শ্লোকে) আছে—

মৎস্যং কূর্ম্মঞ্চ বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনম্।
রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ বুদ্ধঞ্চৈব সকল্কিনম্।
এতানি দশনামানি স্মর্ত্তব্যানি সদা বুধৈঃ।

এখানেও ঐ দশাবতার-নাম-স্মরণের ব্যবস্থা পাওয়া গেল।

কল্কিপুরাণ, শ্রীদেবীভাগবত, গরুড়পুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণিক নানাগ্রন্থে শ্রীভগবানের এই দশ অবতারের বর্ণনা আছে।

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে জানা যায়, শ্রীভগবানের নবম অবতার বুদ্ধ। এই বুদ্ধের পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে (প্রথমস্কন্ধে ৩অঃ ২৪ শ্লোক) আছে—
ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্না জিতসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।

তদনন্তর কলিকালে শ্রীভগবান্ অসুর-মোহনার্থে জিন-পুত্র বুদ্ধ নামে কীকটদেশে আবির্ভূত হইবেন। গরুড়পুরাণেও (পূর্ব্বখণ্ড, ২ অঃ ৩২ শ্লোক) দেখা যায়—
ততঃ কলেস্তু সন্ধ্যায়াম্ সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্না জিতসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি। তস্মাৎ সর্গাদয়ো জাতাঃ সংপূজ্যশ্চ ব্রতাদিনা।

তদনন্তর কলির সন্ধ্যায় শ্রীভগবান্ অসুরগণের মোহনার্থে জিতসুত বুদ্ধ-নামে কীকটদেশে আবির্ভূত হইবেন। সেই ভগবান্ হইতেই সৃষ্ট্যাদির উৎপত্তি। সেই শ্রীভগবানের পূজা ও তাঁহার ব্রতাদি পালন করা কর্ত্তব্য। এই প্রমাণ আলোচনা করিলে জানাযায়, শ্রীভগবান্ কীকটদেশে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই কীকটদেশ কোথায়? শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের সপ্তম পটলে আছে,—
চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্রকূটান্তিকং শিবে।
তাবৎ কীকটদেশঃ স্যাৎ তদন্তর্মগধো ভবেৎ।

চরণাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া গৃধ্রকূট পর্য্যন্ত দেশের নাম কীকট, মগধ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। চরণাদ্রি চুনারগড়, এবং গৃধ্রকূট গিধোড় পর্ব্বত। এই কীকটের মধ্যে গয়া, রাজগৃহ প্রভৃতি বিদ্যমান,—একথা আমরা বায়ু-পুরাণে (৪৬ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে) দেখিতে পাই যথা,—
কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা
চ্যবনস্যাশ্রমঃ পুণ্যঃ পুণ্যং রাজগৃহং বনম্

কীকটের মধ্যে পুণ্যস্থান গয়াক্ষেত্র, পুণ্যা নদী পুনঃপুনা (পুনপুনা,) পুণ্যাশ্রম চ্যবনের আশ্রম, এবং রাজগৃহ-বনই পুণ্যবন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠ-ব্যাখ্যাতা আচার্য্য শ্রীধরস্বামীও লিখিয়া গিয়াছেন—"কীকটেষু গয়াপ্রদেশেষু।"

এই অবতারের প্রয়োজন সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে ১৪৯ অধ্যায়ে আছে—বাসুদেবঃ পুনর্বুদ্ধঃ সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। দেবাদিরক্ষণার্থায় অধর্ম্মহরণায়চ॥ অসুরমোহন, দেবতারক্ষণ ও অধর্ম্মহরণের জন্য বাসুদেবের বুদ্ধাবতারগ্রহণ।

শ্রীদেবীভাগবতের দশম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়—

দুষ্টযজ্ঞবিঘাতায় পশুহিংসানিবৃত্তয়ে।
বুদ্ধরূপং দধৌযোহসৌতস্মৈদেবায় তে নমঃ।

অর্থাৎ দোষযুক্ত যজ্ঞের বিঘাতার্থে এবং পশুহিংসা-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যিনি বুদ্ধরূপ-ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দেবতাকে নমস্কার করি।

পদ্মপুরাণে (ক্রিয়াখণ্ডে ৬ অধ্যায়ে) পাঠ করা যায়—

বেদাবিনিন্দিতা যেন বিলোক্য পশুহিংসনম্।
সক্রূপেণ ত্বয়াদেব তস্মৈ বুদ্ধায় তে নমঃ।

যে তুমি কৃপাবান্ বুদ্ধরূপে যজ্ঞাদিগত পশুহিংসা দর্শন করিয়া যজ্ঞাদি-বিষয়ক (কর্ম্মকাণ্ড) বেদের নিন্দা করিয়াছিলে, সেই বুদ্ধরূপী তোমাকে নমস্কার।

মৎস্যপুরাণে (৪৭ অধ্যায়ে) আছে—

কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবস্থানমসুরাণাং প্রণাশনম্।
বুদ্ধো নবমকোবজ্ঞে তপসা পুষ্করেক্ষণঃ।

পদ্মলোচন নারায়ণ অসুরগণের বিনাশার্থ এবং তপঃপ্রভাবে ধর্ম্মরক্ষার্থ নবম অবতারে বুদ্ধ-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গরুড়পুরাণে (২০২ অধ্যায়ে) আছে—বুদ্ধঃ পাষণ্ডসংঘাতাৎ কল্কীচাবতু কল্মষাৎ। বুদ্ধ পাষণ্ডগণ হইতে এবং কল্কী কল্মষ হইতে রক্ষা করুন্।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধের পরিচয়-সূচক কতকগুলি নাম পাওয়া যায় যথা—

বুদ্ধোধ্যানজিতাশেষদেবদেবো জগৎপ্রিয়ঃ।
নিরায়ুধোজগজ্জৈত্রঃ শ্রীমনোদুষ্টমোহনঃ।
দৈত্যদেববহিষ্কর্ত্তা বেদার্থশ্রুতিগোপকঃ।

শৌদ্ধোদনির্নষ্টদিষ্টঃ সুখদঃ সদসৎপতিঃ।
যথাযোগ্যাখিলকৃপঃ সর্ব্বশূন্যোঽখিলেষ্টদঃ।
ক্রতুচ্ছেদী পৃথকৃতত্ত্বপ্রজ্ঞাপারমিতেশ্বরঃ।
পাষণ্ডশ্রুতিমার্গেণ পাষণ্ডশ্রুতিগোপকঃ।

ইহার মধ্যে শৌদ্ধোদনি (শুদ্ধোদন-তনয়) শ্রীঘন, ক্রতুচ্ছেদী, প্রজ্ঞাপারমিতেশ্বর প্রভৃতি নামগুলি "শাক্যসিংহ বুদ্ধে"র নিজস্ব নাম।

"শঙ্করবিজয়"গ্রন্থেও 'প্রায়ঃ ক্রতুদ্বেষ কৃতাদরায় বৌদ্ধৈকধাম্নে স্পৃহয়ামি ভূম্নে' শ্লোকাংশ দ্বারা ক্রতুদ্বেষী শাক্য-বুদ্ধই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

স্তোত্ররত্নাকর গ্রন্থে দশাবতার-স্তোত্রে—

ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রিযষ্টির্নিযম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্ত্তী স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু মচ্চিত্তবর্ত্তী।

শ্লোকে বদ্ধপদ্মাসনস্থ প্রাণায়ামপরায়ণ নাসাগ্রন্যস্তদৃষ্টি ধ্যানী বুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দকার বঙ্গগৌরব জয়দেব গোস্বামীও দশাবতারস্তোত্রে "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং। সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতং কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।"

বলিয়া পশুহত্যাবিরোধী যজ্ঞনিন্দক শাক্য বুদ্ধকে ভগবানের নবমঅবতার বলিয়া স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও কবিপ্রসিদ্ধির আলোচনা করিলে, নিঃসংশয় ধারণা হয় যে, হিংসাদ্বেষী ক্রতুচ্ছেদী যোগরত শাক্য-বুদ্ধই শ্রীভগবানের নবম অবতার। এই অবতারের কার্য্য অসুরমোহন, পাষণ্ডখণ্ডন ও সনাতন-যোগমার্গ-ব্যবস্থাপন প্রভৃতি।

শ্রীভগবানের মীন, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-মূর্ত্তির যেরূপ পূজার ব্যবস্থা আছে, বুদ্ধমূর্ত্তিরও তদ্রূপই পূজার বিধি দেখা যায়।

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরার্দ্ধে আছে—

দশাবতারানভ্যর্চ্চেৎ পুষ্পধূপবিলেপনৈঃ।
মন্ত্রেণানেন মেধাবী হরিমভ্যুক্ষ্য বারিণা।
মৎস্যং কূর্ম্মং বরাহঞ্চ নারসিংহং ত্রিবিক্রমং।
রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ বুদ্ধঞ্চ কল্কিনং তথা।

গতোঽস্মি শরণং দেবং হরিং নারায়ণং প্রভুম্।
প্রণতোঽস্মি জগন্নাথং সমে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।
ছিনত্তু বৈষ্ণবীং মায়াং ভক্ত্যাপ্রীতো জনার্দ্দনঃ।
শ্বেতদ্বীপং নয়ত্বস্মান্ ময়াত্মা সংনিবেশিতঃ।
অত্র হৈমীর্মহার্হাশ্চ দশমূর্ত্তীঃ সুলক্ষণাঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েদ্ বিধিপূর্ব্বকম্।

মেধাবী ভক্ত জল দ্বারা শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্প ধূপ চন্দনাদি দ্বারা দশাবতারের পূজা করিবে। আমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কিরূপ ভগবান্ হরির শরণাগত হইলাম, সেই জগন্নাথকে প্রণাম করি, সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্, সেই জনার্দ্দন ভক্তি দ্বারা প্রীত হইয়া বৈষ্ণবীমায়া চ্ছেদন করুন্, সেই আত্মস্বরূপ ভগবান্ আমা কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়া, আমাদিগকে শ্বেতদ্বীপে লইয়া যাউন্—এই মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা মহার্হ সুলক্ষণ স্বর্ণময় দশাবতার-মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করিবে। ভবিষ্যপুরাণে দেখাযায়, যে ভক্ত এই দশাবতার-মূর্ত্তির পূজা করেন, তিনি বিমানে আরোহণ করিয়া সুরপুরে গমন করেন।

প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ 'নির্ণয়সিন্ধু'তে (২য় পরিচ্ছেদে) দেখাযায়—জ্যৈষ্ঠশুক্ল-দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধজন্ম ভবিষ্যতি। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া বুদ্ধদেবের জন্মতিথি। ঐ গ্রন্থে আরও আছে—

পৌষশুক্লস্যসপ্তম্যাং কুর্য্যাদ্ বুদ্ধস্য পূজনম্—পৌষশুক্লসপ্তমীতে বুদ্ধের পূজা করিতে হইবে।

বুদ্ধদেবের প্রতিমা কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে ৪৯ অধ্যায়ে দেখা যায়—শান্তাত্মা লম্বকর্ণশ্চ গৌরাঙ্গশ্চাম্বরাবৃতঃ।

ঊর্দ্ধপদ্মস্থিতোবুদ্ধঃ বরদোঽভয়দায়কঃ।

শান্তাত্মা, লম্বকর্ণ, গৌরাঙ্গ, বস্ত্রাবৃত, ঊর্দ্ধপদ্মস্থিত, বরাভয়দাতা বুদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে "মৎস্যাকারস্তু মৎস্যঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে মৎস্যাদি অবতারের প্রতিমা কিরূপ হইবে, তাহা বলা হইয়াছে।

মেরুতন্ত্রে বুদ্ধের ধ্যান এইরূপ দেখা যায়—

"বন্দে পদ্মাসনস্থং ঊর্দ্ধোর্দ্ধ্বোর্ম্মস্তিকরদ্বয়ম্।
গৌরমণ্ডিতসর্ব্বাঙ্গং ধ্যান-স্তিমিতলোচনম্।

পুস্তকাসক্তহস্তৈশ্চ নানাশিল্পৈশ্চ শোভিতম্।
ইন্দ্রাদিলোকপালৈশ্চ নতং চেলাম্বরাবৃতম্।
এবং ধ্যাত্বা যজেৎ পদ্মে—"

'চেলাম্বরাবৃতম্' স্থলে "স্বেতাম্বরাবৃতম্" পাঠও দেখা যায়।

এতদ্বিষয়ক আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শাক্যবুদ্ধই শ্রীভগবানের নবম অবতার। অন্যান্য অবতার মূর্ত্তির ন্যায় বুদ্ধমূর্ত্তিরও শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠা-পূজাদি ফলদায়ক ও একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণাদি-মূর্ত্তির শাস্ত্রোক্ত পূজানুষ্ঠান যেমন হিন্দুর কর্ত্তব্য, বুদ্ধমূর্ত্তির শাস্ত্রোপদিষ্ট পূজানুষ্ঠানও তদ্রূপ করণীয়। শ্রীরামোপাসক শ্রীকৃষ্ণোপাসক প্রভৃতি যেমন হিন্দু, শ্রীবুদ্ধোপাসকগণও তেমনই হিন্দু ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। শক্তিপূজা, শিবোপাসনা, রামোপাসনা, কৃষ্ণোপাসনা প্রভৃতি যেমন সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান, তেমনই বুদ্ধপূজাও সনাতন-হিন্দুধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান, ইহা আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণোপাসক যেমন শ্রীরামোপাসককে অহিন্দু মনে করিতে পারেন না, তদ্রূপ অপর অবতারের বা মূর্ত্তির পূজক হিন্দুগণও বুদ্ধাবতারের পূজকগণকে অহিন্দু মনে করিতে পারেন না। অনেক সময় দেখা যায়, শাস্ত্রানুশীলনের অভাবে লোকে সংকীর্ণমত পোষণ করিতে বাধ্য হয়। অনেক-সংশয়চ্ছেদী শাস্ত্রালোচনের সাহায্যে তত্ত্বদর্শনে যত্নবান্ হইলে, অন্ধপরম্পরার অন্ধকার অতিক্রম করিয়া সত্যের বিমলজ্যোতি উপলব্ধি করা যায়। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীপ্রবোধানন্দ শর্ম্মা।

কর্ম্মফল।

যা দিয়েছ তাই পে'য়েছি, পাইনি শুধু
দেওনি যাহা,
জানি আমি, দেবার কারণ তাও র'য়েছে
র'য়ে আহা।

এমন করে' পরের লাগি
জনম-ভরা কে রয় জাগি?
আমরা হচ্ছি ফল-ভাগী
তুমি গণ্‌ছ দিন আর মাহা!
এমনি তুমি জগৎপালক
চোকের পলক্ ভাওনা টুটে,
যার যেটা সে তখনি পায়
সময় যখন হয়ে উঠে!
হউক্ সেটা আঁধার-রাতি
বৃষ্টি তুফান বজ্র সাথী,
থাক্ বা না থাক্ আঁচল পাতি,
দিবেই তুমি দিবেই তাহা!
মূল বিচারের মালিক তুমি,
ভুল কি তোমার হ'তে পারে?
যে জানেনা ঘরের খবর
দোষী বলে সেই তোমারে।
মিথ্যার মাঝে যেটুকু সত্য
পেয়েছি প্রভু, তোমার দত্ত,
তাতেই র'য়েছি আশ্বস্ত
পাব বলে' সে সুরাহা!
যা দিয়েছ তাই পে'য়েছি, পাইনি শুধু
দেওনি যাহা।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

প্রচার-পুস্তিকা।

কলেরা ও ম্যালেরিয়া।

যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান্—

রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ বি এল্,

বেদান্তবাচস্পতি প্রণীত

এবং

বঙ্গদেশীয় স্যানিটারী কমিশনার—

ডাক্তার বেণ্টলে সাহেবের

অনুমোদিত।

ওলাউঠা (বিসূচিকা) (কলেরা)

ওলাউঠারোগ সহজে নিবারণ করা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও ইহা সহজে নিবারণ করা যাইতে পারে।

ভেদ, বমন, মূত্ররোধ, অঙ্গে খিলধরা, পেটের বেদনা ইত্যাদি ওলাউঠা-রোগের সাধারণ লক্ষণ। উহার বীজ চক্ষে দেখা যায়না, কেবল অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়। ইহা একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌বীজাণু এবং দেখিতে "," কমার ন্যায়, এই নিমিত্ত ইহাকে "কমা বেসিলস্" (দণ্ড) বলে।

ওলাউঠা-রোগাক্রান্ত—ব্যক্তির বমি, মূত্র ও মলে এই বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ক্রমে যদি এই বীজ কাহারও পানীয় দুগ্ধ বা জল বা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তৎপরে উহা কেহ খায়, তাহা হইলে, তাহার ওলাউঠা-রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তবে যদি কাহার ঐ বিষ রোধ করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে সে রোগাক্রান্ত না হইলেও না হইতে পারে। অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে অনেকসময় ওলাউঠা-রোগাক্রান্তব্যক্তির কাপড় নদী, পুষ্করিণী ও অন্যান্য পানীয় জলাশয়ে ধৌত করিয়া উহার জল দূষিত করে এবং তৎপরে যদি কেহ ঐ সমস্ত দূষিত জল পান করে, তাহা হইলে সেও ওলাউঠা-রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

যাহারা ওলাউঠা-রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে, তাহারা বমন ও মলাদি স্পর্শ করিয়া উত্তমরূপে হস্তাদি ধৌত না করিলে, তাহারাও ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

ওলাউঠা-রোগীকে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দেওয়া ভাল এবং কখনও জল বন্ধ করা উচিত নহে। রোগাবস্থায় রোগীকে প্রচুরপরিমাণে জল পান করিতে দিলে ঔষধ-ব্যবহারের অর্দ্ধেক ফল পাওয়া যায় এবং বমনোদ্বেগ থাকিলে বরফ-মিশ্রিত জলে উপকার হয়। জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ করা যায়।

যেখানে ঔষধ সহজপ্রাপ্য নহে, সেখানে জলে লেবুর রস ও সামান্য লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে ঔষধ-ব্যবহারের ফল দর্শে।

সহজ চিকিৎসা।

শিরা চিরিয়া কিম্বা মলদ্বার দিয়া লবণ-জলের পিচকারী দেওয়া এবং পোটাসিয়াম্ পারমাঙ্গানেট্ পিল্ (বটীকা) সেবন অধুনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

(বিশেষদ্রষ্টব্য) এইপ্রকার চিকিৎসা বিশেষতঃ লবণ-জলের পিচকারী ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত করা উচিত নহে।

নিবারণোপায়।

পানীয়জল-শোধন।

ফুটন্ত জলের উত্তাপে ওলাউঠার বীজ নষ্ট হয়। সর্ব্বদাই দুগ্ধ ও পানীয় জল সুসিদ্ধ করিয়া পান করিবে, যেহেতু সুসিদ্ধ হইলে রোগবীজ নষ্ট হয়। যে সকল নদী, পুষ্করিণী কিম্বা কূপের জল ব্যবহৃত হয়, উহা দূষিত হইলে অন্ততঃ ১০ দশ দিন উহার জল ব্যবহার করিবে না; উহা পুনরায় দূষিত না হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগবীজ আপনা হইতে নষ্ট হইবে।

পোটাসিয়ম্ পারমাঙ্গানেট্ দ্বারা কূপের জল শোধন করিবে। পুষ্করিণীর কিনারায় ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ ছড়াইয়া দিয়া শোধন করিবে, কিন্তু, সর্ব্বাবস্থায়ই সুসিদ্ধ জল ব্যবহার করিবে, কেননা উহা নিরাপদ।

সতর্কতা।

রোগীর শুশ্রূষায় সতর্কতা।

যখনই রোগীকে ছুঁইবে কিম্বা তাহার মলমূত্র বমনাদি পরিষ্কার করিবে, তখনই পারক্লোরাইড্ অব্ মারকারির জল কিম্বা ফেনাইল্ কিম্বা কার্ব্বলিক্‌সাবান্

নিতান্ত-পক্ষে লবণ-সংযুক্ত মৃত্তিকা দ্বারা হাত পা ইত্যাদি অতিসাবধানে উত্তমরূপে ধৌত করিবে।

মক্ষিকা-নিবারণের জন্য সতর্কতা।

ওলাউঠা-রোগীর মলাদি অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে, ঐ রোগ একবাড়ী হইতে অন্যবাড়ী বা একব্যক্তি হইতে অন্যব্যক্তিতে (মাছি) দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ত মাছি ঐ সমস্ত মলাদিতে বসে, উহারাই আবার খাদ্যাদির উপরে বসে এবং রোগের বীজ বহন করিয়া খাদ্যাদি বিষাক্ত করে। অতএব রোগী মলত্যাগ বা বমন করিলে তৎক্ষণাৎ ছাই দিয়া ঢাকিবে এবং পরে উহা পোড়াইবে বা মাটিতে পুতিয়া ফেলিবে।

ময়লা পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে সতর্কতা।

ওলাউঠা-রোগীর কাপড় এবং বিছানাদি পোড়াইয়া ফেলিবে বা শোধন করিবে। কার্পাস-বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া দিন কয়েক রৌদ্রে শুকাইবে। পশমী-বস্ত্র-শোধন-দ্রব্য, যথা—পারক্লোরাইড্ অব্ মারকারির জল, অথবা পারম্যাঙ্গনেট্ অব্ পটাসিয়াম্ দ্বারা ভিজাইয়া জলে ধৌত করিবে এবং রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

ওলাউঠার সময় স্বগৃহে প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী ব্যতীত বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, অথবা যে দ্রব্য সুসিদ্ধ নহে তাহা ভক্ষণ করা, বা জল বা দুগ্ধ যাহা সুসিদ্ধ নহে তাহা পান করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

ম্যালেরিয়া।

১। ম্যালেরিয়া-জ্বর সহজে নিবারণ করা যায়। মানুষের শরীরে পরশরীরোপজীবী অতি ক্ষুদ্র কোন জীবাণু (১) যথেষ্টপরিমাণে প্রবেশ করিলে এই জ্বর হইতে পারে।

(১) পরগাছা যেমন অন্য বৃক্ষ আশ্রয় না করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারেন এবং সকল সময়ই কোন না কোন গাছের আশ্রয় ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, এই ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্রূপ মনুষ্যশরীর এবং এনোফেলিসনামক একপ্রকার মশক-শরীর ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না বা বর্দ্ধিত হয় না। ইহা জলে, স্থলে, শূন্যে বা বায়ুতে কোথাও দেখা যায় না, কেবল মশক ও মনুষ্য-শরীরে দেখা যায়। এনোফেলিস্ মশক আকারে লম্বা একখানি কাঁটার ন্যায়, কিন্তু ইহাদের গায়ে, পায়ে, শুঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা সাদা দাগ আছে, দেখিলে যেন খাড়া বলিয়া বোধ হয়।

২। এই ক্ষুদ্র জীবাণু, এনোফিলিশ-নামক মশার দ্বারায় এক শরীর হইতে অন্য শরীরে নীত হয়। জীবাণু যথেষ্টপরিমাণে প্রবেশ করিলে পরে জ্বর হয় বটে, কিন্তু অপাক এবং ঠাণ্ডার দ্বারায় ইহা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। যদি শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে এবং অপাক না থাকে, তবে ম্যালেরিয়া-বিষ সহজে কিছু করিতে পারেনা।

৩। রাত্রিতে সাবধানে মশারি ব্যবহার করিলে এবং জ্বরাক্রান্ত হইলে সর্ব্বঋতুতে কুইনাইন্ ঔষধ-স্বরূপ ব্যবহার করিলে এবং ম্যালেরিয়ার সময় অর্থাৎ আষাঢ়ের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় প্রতিরোধক স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুইনাইন্ সেবন করিলে, ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত উপযুক্ত ব্যায়াম অর্থাৎ শরীর-পরিচালন, বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ জল-সেবন, আহার-বিহারে মিতাচার, গৃহাদির পরিচ্ছন্নতা এবং পুষ্টিকরখাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি উপায় দ্বারা ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায়।

৪। দেহে যে সমস্ত ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে, তাহার ধ্বংস-সাধনই ঔষধ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য এবং এই জীবাণু যাহাতে মশক-দংশন দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এবং মশক-দংশন দ্বারা শরীরে বিষ প্রবেশ করিলেও যাহাতে ঐ বিষ শরীরের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, শরীরকে এইরূপভাবে রাখা ইত্যাদি প্রতিরোধক উপায়গুলির তদ্রূপ উদ্দেশ্য। মশারি ব্যবহার করিলে মশায় কামড়াইতে পারিবে না, সুতরাং ম্যালেরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবেনা। এনোফিলিস্ মশক মারিয়া ফেলিলেও উহা দংশন করিতে পারিবে না। বাড়ীর নিকট ডোবা, গর্ত্ত ইত্যাদি বুজাইয়া ফেলিলে, এনোফিলিস্ উহাতে জন্মাইতে পারিবে না। গৃহাদিতে আলোক এবং বায়ু স্বচ্ছন্দভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে, সেখানে মশক থাকিতে পারিবে না। আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত অল্পপরিমাণে কুইনাইন্ খাইতে পারিলে, শরীরের যে অবস্থা হইবে, তাহাতে মশক-দংশনেও কিছু করিতে পারিবে না।

নিবারণোপায়।

(১) অতএব বাড়ীর চারিদিকে খোলা রাখিবে, বাড়ীর নিকট কোন গাছ জন্মাইবে না, যদি জন্মাইয়া থাক, তবে যাহাতে গৃহে আলোক-প্রবেশের এবং বায়ুসঞ্চালনের ব্যাঘাত করে, তাহা কাটিয়া ফেলিবে। বাড়ীর নিকট সমস্ত

জঙ্গল এবং ছায়াওয়ালা গাছ কাটিয়া ফেলিবে। মশকেরা দিনের বেলায় এই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। বাড়ীর হাতার মধ্যে কোন স্থানে জল জমিতে দিওনা, নালি কাটিয়া বাহির করিয়া দিবে।

(২) গৃহমধ্যে বিশেষতঃ শুইবার ঘরে যত অল্প জিনিষ রাখিতে পার তাহা রাখিবে। মাকড়্সা বা অন্যপ্রকার আবর্জ্জনা ঘরে রাখিওনা। সংক্ষেপতঃ গৃহগুলি এরূপভাবে রাখিবে, যেন মশা লুকাইয়া থাকিতে না পারে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবে এবং একটু রাত্রি হইলে খুলিয়া দিতে পার। সন্ধ্যার সময়ই মশারা ঘরে প্রবেশ করে। প্রত্যহ সকালে বৈকালে গৃহের সর্ব্বস্থানে ধূপের ধুমা দিবে।

(৩) বাড়ীর নিকট ডোবা গর্ত্তাদি বুজাইয়া দিবে; যদি বুজাইতে না পার, তাহা হইলে লাঠীর আগায় কেরোছিনে নেক্ড়া ভিজাইয়া বাঁধিয়া সপ্তাহে একবার করিয়া ডোবাগুলির কিনারায় ঘুরাইয়া লইবে, উহাতে মশকের ডিম সব মরিয়া যাইবে। বাড়ীতে পুকুর থাকিলেও তাহাতে ঐরূপ করিবে, তাহাতে জলের কোন ক্ষতি হইবে না। পুকুরে বা ডোবায় যথেষ্ট কই মাছ ছাড়িয়া দিবে, উহারা মশার ডিম্ খাইয়া ফেলিবে।

(৪) মুখ না ঢাকিয়া হাঁড়ি কলস ইত্যাদি বাহিরে রাখিবে না, উহাতে বর্ষার জল জমিলে মশায় ডিম্ পাড়ে। পরিত্যক্ত হাঁড়ি কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। যদি বাহিরে হাঁড়ি কলস রাখিতে হয়, মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

(৫) সকল ঋতুতেই মশারির মধ্যে শুইবে। অতি গরীব লোকেও পুরাতন ধুতি সাড়ির দ্বারায় মশারি তৈয়ার করিতে পারে। যদি একান্তপক্ষে মশারি যোগাড় না করিতে পার, তবে গায়ে সরিষার তৈল বা কেরোছিন্ তৈল মালিস করিয়া শয়ন করিবে। কোনরূপ তীব্র গন্ধের নিকট মশক আসেনা।

(৬) বাড়ীতে কেহ জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহাকে স্বতন্ত্র মশারির ভিতর রাখা উচিত।

(৭) কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ক্যাষ্টর অয়েল্ বা তদ্রূপ কোন রেচক দ্বারায় জোলাপ লইবে: প্রত্যহ বাড়ীর বালক-বালিকাদের জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; যদি জিহ্বায় সাদা আবরণ দেখা যায়, তখনই বুঝিবে যে উদর অপরিষ্কার হইয়াছে, জোলাপ দেওয়া দরকার।

(৮) আষাঢ়মাসের প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে সুস্থাবস্থায়ও ৮ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন্ খাইবে। যেস্থানে অত্যন্ত

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, সেস্থানে ইহাপেক্ষা অধিক খাওয়া দরকার হইবে। যেস্থানে অনেক লোকের পেটে পিলে বড় দেখা যায়, সে স্থানে বুঝিতে হইবে যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী এবং এইরূপ হইলে সপ্তাহে প্রতিদিন ৪ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন্ কিম্বা দুই তিনবারে ২৮ গ্রেণ কুইনাইন্ খাওয়া আবশ্যক। বালক এবং শিশুদের পক্ষে ইহাপেক্ষা অল্প দিবে, কিন্তু এটা সকলের জানা উচিত যে, বয়স্কব্যক্তিদের অপেক্ষা বালকেরা অধিকপরিমাণে কুইনাইন্ সহ্য করিতে পারে। ম্যালেরিয়া ঋতুতে সুস্থাবস্থায় এইরূপ কুইনাইন্ খাইলে, যদি কোন প্রকারে ম্যালেরিয়ার জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে, তাহা হইলেও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

চিকিৎসা।

(৯) যখনই ম্যালেরিয়াজ্বর হয় অর্থাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া শরীরে কম্প দিয়া জ্বর হয় এবং একদিন, বা দুইদিন বা তিনদিন অন্তর বিচ্ছেদ হয়, তখনই কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জোলাপ লওয়া উচিত এবং প্রতিদিন চারিমাত্রায় বিচ্ছেদ অথবা জ্বর কম থাকা সময় ১৬ গ্রেণ কুইনাইন্ খাইবে। জ্বর সারিয়া গেলে পরেও এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ ৮ গ্রেণ করিয়া খাইবে এবং তৎপরে একপক্ষ (১৫ দিন) ধরিয়া ৪ গ্রেণ করিয়া খাইবে। অনেকের জ্বর সারিয়া গেলে যে পুনরায় জ্বর হয়, তাহা কুইনাইন্-সেবনের জন্য নহে, উহা অল্পপরিমাণে এবং অল্পদিনের জন্য কুইনাইন্ খাইবার ফল।

ধর্ম্মশাস্ত্রের উপকারিতা।

মনুষ্যের কাম্যবস্তু কি, কি জন্যই বা মানব সংসার-সাগরের বীচিমালার উপর ভাসমান থাকিয়া ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে এবং কোন্ লক্ষ্যে চিত্তসমাধান করিয়া স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়, আর কোন্ বস্তু লাভ করিলেই বা প্রীতিপ্রাপ্ত হয়—ইহার এককথায় উত্তর—"সুখ"ই মানবের কাম্যবস্তু, সুখ পাইলেই মনুষ্য প্রীত হয়। শ্রুতি বলিতেছেন, "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূৎ" অর্থাৎ আমার সুখ হউক, কখনই যেন আমার দুঃখ না হয়, মনুষ্য ইহাই কামনা করে। এখন প্রশ্ন—এই দ্বন্দ্বসঙ্কুল সংসারে

নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ কিরূপে করা যায়? এ বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে দেখা যায়, ধর্ম্মই একমাত্র সুখের কারণ। নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম্মমতঃ সুখম্॥

ধর্ম্ম হইতেই সুখ হয়। এইক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আমাদের ধর্ম্ম কি? ইহার উত্তরে মনু বলিয়াছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥
বেদপ্রমাণকঃ শ্রেয়ঃসাধনং ধর্ম্মঃ।

অর্থাৎ বেদমূলক শ্রেয়ঃসাধনই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহাদি চিত্তধর্ম্ম হইতে প্রসূত হয় নাই, মূর্খ দুঃশীল পুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অজ্ঞানমূলক ইতরধর্ম্মের ন্যায় যাহা কালে উৎপন্ন হইয়া কালেই লয় পায় না, পরন্তু স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বেদ-প্রবর্ত্তিত বলিয়া যাহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রসংস্কৃতমতি প্রমাণপ্রমেয়স্বরূপকুশল বেদবিদ্ বিদ্বান্ অথচ অনুষ্ঠানপর সাধুগণ চিরদিন যাহার অনুষ্ঠান ও আদর করিয়া আসিতেছেন, যাহার সত্যাসত্যতা সম্বন্ধে হৃদয়ই বিশেষ প্রমাণ, ইতর-ধর্ম্মের ন্যায় যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের আক্রোশন নাই, পরন্তু চিত্ত-প্রসাদ আপনা আপনি উপস্থিত হয়, সেই বেদপ্রমাণিত শ্রেয়ঃ-সাধন ধর্ম্ম আপনারা শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যে বিমল আনন্দলাভ করা যায়, সে বিষয়ে জলদগম্ভীর স্বরে মনু বলিয়াছেন—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্।

শ্রুতি-স্মৃতি বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, মানবের ইহলোকে কীর্ত্তি ও পর-লোকে সুখলাভ হয়। পরলোকে সুখলাভ ঘটিবে—এই কথায় যদি কেহ আপত্তি করেন, তবে সে কথার উত্তর এই যে, কীর্ত্তিলাভও সুখের একটী অবস্থা; বিশেষতঃ ইহলোকেই যে সুখলাভ করা যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত আছে যথা—

ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্।
সতু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ॥
অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গো মোক্ষশ্চ জায়তে
ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্যং অতুলঞ্চ খগাধিপ॥

যাহা হইতে কল্যাণ হয় তাহাই ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম পাঁচ প্রকার। এই ধর্ম্মকর্ম্মের সম্যগনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভ হয় ও ফলকামনাশূন্য হইয়া অনাসক্ত-ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, কার্য্যকারণ মূলক সংসারে সমস্তই কার্য্যকারণভাবাপন্ন। যেমন ধর্ম্মই সুখের কারণ, সেইরূপ ধর্ম্মের সাধ্যাবস্থায় উহা সাধনাপেক্ষ বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞানই ধর্ম্মার্জ্জনের কারণ। এইক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহার উত্তরে মনু বলিতেছেন—

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ॥

বেদকে "শ্রুতি" ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে "স্মৃতি" বলে। সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিচার-বিতর্কের অতীত, যে হেতু শ্রুতি স্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে প্রতিকূলতর্কের আঘাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়, তজ্জন্য মনুসংহিতায় বলিয়াছেন—

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াৎ দ্বিজ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।

যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ দুষ্ট তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া, এই দুই ধর্ম্মমূল শাস্ত্রকে অমান্য করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহার সহিত কেহ একত্র ভোজনাদি করিবে না। কালের কি আশ্চর্য্য লীলা! এইরূপ শাস্ত্রবাক্য ও আপ্তবাক্য আমাদের মস্তকে পুনঃ ২ যষ্টি প্রহার করিয়া বলিতেছেন, "শাস্ত্রের মান অ[illegible]-রাগ, শাস্ত্রবিহিত সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখের অধিকারী হইবে—"কিন্তু আমাদের মনে ঐ সকল ভাব শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় উদয় হইয়াই বিলীন হইতেছে। দেশের যে সম্প্রদায় ধনে, জ্ঞানে, মানে, কৌলীন্যে বরণীয়, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। বলেন, প্রবৃত্ত কর্ম্ম কামনাপূর্ণ বলিয়া বন্ধের হেতু। কাম্য কর্ম্ম যে বন্ধের হেতু, ইহা অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু তাই বলিয়া যখন সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্ম্মের ভিন্ন অধিকারী স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তখন শাস্ত্রের প্রতি আস্থাশূন্য হওয়া উচিত নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও উভয়বিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে,

তাহা হইলে তাহাতে অর্থাৎ ভগবদ্বাক্যেও আস্থাশূন্য হইতে হয়। অবশ্য নিবৃত্তির স্রোত চিরদিন হইতে প্রবহমান, কিন্তু তাই বলিয়া প্রবৃত্তির স্রোত একেবারে রুদ্ধ হইতে পারেনা। যদি কেহ ধনপুত্র কামনা না করেন, গার্হস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী কেহ না হন, তাহা হইলে বর্ণাশ্রমসমাজ রক্ষা হয় না। মাটি হইতে সাধুপুরুষের সৃষ্টি হয় না। গৃহস্থই সাধুদিগের আশ্রয়। এইজন্য মনু বলিয়াছেন—

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তিহি।

এই ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমিচতুষ্টয়ের মধ্যে বেদ এবং স্মৃতি-বিধানানুযায়ী যে গৃহস্থাশ্রমী তাহাকে ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কারণ, তিনি অপর তিন আশ্রমের ধারক পোষক ও পালক। পক্ষান্তরে যিনি ষড়্দর্শন-বিশিষ্ট, তাঁহার দৃশ্যও কিছু চাই, নতুবা "কাণেন চক্ষুষা কিম্বা" হয়। এখন ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে অপবর্গ-লাভ হয়না বরং সাধারণের ভীতিপ্রদ তার্কিক হওয়া যায়। অতএব দার্শনিকের দৃশ্য হওয়া উচিত বেদ-মূলক স্মৃতি। ব্যষ্টি-সমষ্টি জগতে যতই দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, আজকাল শাস্ত্রের শাসন যতই মন্দীভূত হইতেছে, ততই দিন দিন বর্ণাশ্রম-সমাজতন্তু ক্ষীণ হইতেছে। যাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গানুসারী তাঁহারা কি চাহিয়া দেখিবেন না যে, তাঁহারা উন্নতি-সৌধ-শিখরে আরূঢ় হওয়া সত্ত্বেও নিম্নস্তরে কত লোক এই গণ্ডীর মধ্যে আছে? নিবৃত্তিমার্গীও হয়ত এইজন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে আমাদের ন্যায় কামী ছিলেন। 'প্রবৃত্তি' না থাকিলে 'নিবৃত্তি' হইবে কিসের? নিবৃত্ত পুরুষ স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন "বহূনিমে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন" ইহার দ্বারা এইটুকু জানা যায় যে, অনেকজন্মের পর অর্জ্জুনের বাসনা টুটিয়াছিল। আবার বলি, কর্ম্মময় জগতে সকলেই কর্ম্মের অধীন, কর্ম্ম না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়না। যিনি গৃহী, গার্হস্থধর্ম্ম অতিথি-সৎকারাদি তাঁহার কর্ম্ম, যিনি ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার কর্ম্ম, ত্যাগাভ্যাস (বাসনাত্যাগ) বনীর কর্ম্ম; যিনি মুমুক্ষু, মুক্তি-সাধনের অনুশীলনই তাঁহার কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের বিধি স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র ব্যতীত সমস্ত শাস্ত্র পক্ষহীন। এজন্য মনে হয়, বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচার যতই বৃদ্ধি পাইবে, লোকের মনে ততই ধর্ম্মভাব আসিবে,—হিংসা, দ্বেষ, সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে

সত্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ হইবে। অতএব আমাদের বর্ণাশ্রমীর পক্ষে স্মৃতিশাস্ত্র-পাদপের ছায়াই আশ্রয়স্থল। এইজন্যই বোধহয় পূর্ব্ব সূরিগণ বলিয়াছেন—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

অনাদৃত।

গীত।

(ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা)

এস এসহে চিরলাঞ্ছিত, আজি বাঞ্ছিত আমার!
আজি অশ্রু-ধৌত হৃদয়ে উদিত অনুভব তোমার!!
অনাদরে দূরে করে'ছ প্রয়াণ,
হ'বেনা কি মম পাপ-অবসান,
অভিশপ্ত অনুতপ্ত পরাণ বহিতে নারি আর!!
শোক-তাপময় এমরু-মরতে অমৃতের সন্ধানে,
আকুল বক্ষে, বিলোল চক্ষে, লক্ষ্য তোমারি পানে;—
এস অনাদৃত এস এস ফিরে,
তোমারি ত্যক্ত ভগ্ন কুটীরে,
লহগো দীর্ঘ-দিবস-পরে, ভক্তি-অর্ঘ্যভার!!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুভূতি।

(গীত)

(ইমন্—তেওরা)

তোমার অনুভব, যত হতেছে প্রভো,
তত যে আকুলতা আসিছে মনে!
এ আকুলতা কবে তোমাতে কূল পা'বে,
পেয়ে প্রাণযুড়ান আপন-জনে!!
আশা পূরাইতে যাহার কাছে যাই,
খুঁজিয়া তাহাতে পাইনা যাহা চাই,
তবু নিলাজ হিয়া অপরে ধরে গিয়া,
কাঁদিয়া ফিরিগো হতাশ প্রাণে!!
মৌন অনুতাপে পেতেছি বেদনা,
তবুও টানিছে নিঠুর কামনা;—
তুমিও ডাকিতেছ, দেখা তো নাহি পাই,
ব্যর্থ সন্ধানে কূলে কূলে ধাই,
বিপথে ঘুরে' নাথ, এবে শরণাগত,
পথ কি দেখা'বে না পাতকী জনে!!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতায় বেদনিন্দা।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

অন্বয়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে [সতি] উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ অর্থঃ (প্রয়োজনম্) বিজানতঃ (ব্রহ্মজ্ঞস্য) ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ অর্থঃ। (নকিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিতি।)

অনুবাদ। সকলস্থান জলে প্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেমন প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠেরও সমস্তবেদে সেইরূপ প্রয়োজন।

টীকা। বেদবিহিত যাগাদি দ্বারা সামান্য প্রয়োজন সকল সাধন হয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের সকল বাসনার নষ্ট হওয়াতে আর ঐ সকল ক্ষুদ্র সুখের বাসনা থাকেনা। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞের মহান্ আনন্দের নিকট কাম্য ধর্ম্মজাত ক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্র সুখ সকল অতি তুচ্ছ। শ্রীভগবান্ যমিমাং পুষ্পিতাং বাচং ইত্যাদি শ্লোকে এবং এই শ্লোকে বেদবিহিত সকাম কর্ম্ম সকলের নিন্দা করিলেন। ঐ কর্ম্ম সকল সংসারী লোকের জন্য বিহিত হইয়াছে। যাঁহাদের চিত্ত বিষয়াসক্তি-জনিত মোহে আচ্ছন্ন, সেই সকল প্রমত্তব্যক্তির হৃদয় ব্রহ্মাভিব্যক্তির উপযুক্ত নহে। তাহাদের কৃত উপাসনা প্রকৃত উপাসনা-পদবাচ্য নহে; কারণ তাহারা ভগবান্‌কে চায়না, তাহারা চায় কামনার চরিতার্থতা; কামনার তৃপ্তি হইলেই ভগবানের সহিত তাহাদের আর তত দূর সম্পর্ক থাকেনা। শিশুগণ যেমন খেলনা লইয়া মাতাকে ভুলিয়া থাকে, ইহারাও তদ্রূপ সামান্য সুখে মত্ত হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকে, কিন্তু শিশু যখন খেলনা সকল পরিত্যাগ করিয়া "মা, মা," বলিয়া কাঁদিতে থাকে, তখন যেমন মাতা আর তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, সেইরূপ সাধক যখন সাংসারিক সুখ সকলের অসারত্ব, অস্থায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া, উহাদিগকে সুখরূপ মোহিনীবেশ-ধারিণী দুঃখরাক্ষসী জানিয়া,—তাহাতে আর না ভুলিয়া সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবান্‌কেই চান, তখন ভগবান্ ঐ সাধককে পাদপদ্মে স্থান দেন। তখন ঐ সাধক বেদের সকাম ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া বেদান্তের নিষ্কাম ধর্ম্মে উপনীত হন। সকামধর্ম্মের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই কঠিন; ভক্তরাজ ধ্রুবও প্রথমে উহাতে মোহিত হইয়াছিলেন, পরে ভগবৎসাক্ষাৎকারজনিত সুকৃতি-বলে উহাকে অতিক্রম করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বেদবিহিত সকাম কর্ম্ম সকল নিকৃষ্টাধিকারীর জন্য। ঐ সকল কর্ম্ম করিতে করিতে সুকৃতি-বশে সাধকের হৃদয় যদি ক্রমশঃ ভগবৎ-সান্নিধ্যহেতু বাসনারূপ-মলমুক্ত হয়, তাহা হইলে সাধকের ক্রমশঃ সকামকর্ম্মে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া নিষ্কামকর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী মুমুক্ষু সাধক প্রথম হইতেই বেদের সকামধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বেদান্তের নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন; কারণ তাঁহার মোক্ষেচ্ছা সমুৎপন্ন হওয়াতেই প্রমাণিত হয় যে তিনি

পূর্ব্বসুকৃতিবলে নিষ্কামধর্ম্মেরই অধিকারী। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এখানে অর্জ্জুনকে বেদ অতিক্রম করিয়া বেদান্ত আশ্রয় করিতে উপদেশ দিলেন।

কোন কোন আধুনিক ব্যাখ্যাতৃগণের মুখে শুনা যায় যে, বেদের সকাম ধর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কামধর্ম্মের প্রচার শ্রীকৃষ্ণের নূতন আবিষ্কার; তাঁহাদের মত সমীচীন নহে। কারণ, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসকলেও সকাম-ধর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কামধর্ম্মের সুখ্যাতি রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই এখানে অর্জ্জুনের পক্ষে শ্রেয়ঃ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"নসাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালম্
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকোনাস্তি পর ইতিমানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥"

"অবিবেকী, প্রমত্ত ও বিত্তমোহে মূঢ় এবং 'ক্ষয়িষ্ণু ইহলোক ব্যতীত অক্ষয় অপরলোক নাই' এইরূপ মননকারী ব্যক্তির নিকট পরলোক-সাধনোপায় প্রতিভাত হয় না, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।"

পুনশ্চ,—"অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভেনানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়োবৃণীতে ॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত—
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তিধীরঃ।
শ্রেয়োহিধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে—
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥"

"শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) এবং প্রেয়ঃ (সুখ) ইহারা পরস্পর ভিন্ন। ইহারা পুরুষকে বিভিন্ন প্রকারে বদ্ধ করে। এই দুইএর মধ্যে শ্রেয়োগ্রহণকারীর মঙ্গল হয়, এবং প্রেয়োগ্রহণকারী মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হয়।"

"শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ ইহারা মনুষ্যকে আশ্রয় করে। ধীরব্যক্তি এই উভয়কে আলোচনা করিয়া উহাদিগকে পৃথক্ জানেন। ধীরব্যক্তি প্রেয়ঃ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন এবং মন্দ ব্যক্তি যোগক্ষেমহেতু প্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন।"

পুনশ্চ,—"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা—
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।"

"অবিবেকীব্যক্তি বাহ্যিক কামনার অনুগমন করিয়া মৃত্যুর বিস্তৃত পাশে বদ্ধ হয়।"

পুনশ্চ,—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেঽস্যহৃদিশ্রিতাঃ।
অথমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

"যে সকল কামনা হৃদয়ে আশ্রয় করিয়া আছে, মর্ত্ত্যজীব যখন সেই সকল কামনাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তখন অমর হয় এবং ইহলোকেই ব্রহ্মলাভ করে।"

পুনশ্চ,—"প্লবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষুকর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়োযেঽভিনন্দন্তিমূঢ়াঃ
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥"

"প্রমূঢ় ব্যক্তিগণ ইষ্ট (যাগাদিকর্ম্ম) ও পূর্ত্ত-(বাপীকূপখননাদিকর্ম্ম) নামক সকাম কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, এবং ইহা হইতে অন্য কিছুই শ্রেয়ঃ জানেনা। তাহারা সুকৃতলব্ধ স্বর্গে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এই লোকে বা ইহা অপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে।"

পুনশ্চ,—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়া-
ন্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন্।"

"কর্ম্মলব্ধ লোক সকল পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের ক্ষয়িষ্ণু পরিণাম জানিয়া, ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে। কর্ম্ম (যাগাদি) দ্বারা নিত্য-পদার্থ-লাভ হয় না।"

পুনশ্চ,—"কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
সকর্ম্মভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥"

"যে ব্যক্তি কামনা সকল চিন্তা করিয়া আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ব্যক্তি সেই সকল কামনাসহ সেই সেই কামনালব্ধ লোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পর্য্যাপ্তকাম ও আত্মতত্ত্বজ্ঞব্যক্তির সমুদায় কামনা এই লোকেই বিলীন হইয়া থাকে।"

ইত্যাদি বহুশ্রুতিতে দেখা যায় যে, বেদান্তের অনেকস্থলেই বেদের সকামকর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কোনও নূতন মত উদ্ভাবন করেন নাই। সকামকর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিষ্কাম কর্ম্মাত্মক নিবৃত্তি-মার্গ ইহা চিরপ্রসিদ্ধ দুইপথ। শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীঃ-

সংবাদ ও মন্তব্য।

বৃত্তিলাভ।

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ গুহ প্রেসিডেন্সিকলেজে রসায়নশাস্ত্রের গবেষণা পরিচালনার্থে একশত মুদ্রা বৃত্তি পাইয়াছেন। কার্য্যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইলে সুখের ও আশার কথা।

নব দ্বীপ।

সংবাদপত্রে প্রকাশ—স্যাডারদ্বীপের দুই মাইল পশ্চিমে অর্ণবপোতের পথের নিকটে একটী নূতন দ্বীপ আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতির কৃপা!

ক্রিয়াবানের তনুত্যাগ।

পত্রান্তরে প্রকাশ—বর্দ্ধমানজেলার বেলুনগ্রামের নিষ্ঠাবান্ সাধক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৬৮ বর্ষ বয়সে সমাধিমগ্নদশায় তনুত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সাধন-শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা ছিলেন। ইঁহার কৃত শান্তিকর্ম্ম স্বস্ত্যয়নাদি নিশ্চিতফলপ্রদ হইত। যোগ্য ক্রিয়াবান্ লোকের অভাবে শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে অনেক সময় ফল পাওয়া যায় না। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর নিকট "যস্তুক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্"। এইশ্রেণীর সাধুলোক ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছেন,। দুঃখের কথা!

হত্যা-নিষেধ।

মিশরের সুলতান্ মহোদয় আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, আগামী দুই বৎসরের মধ্যে মিশররাজ্যে কেহ গোহত্যা বা মহিষহত্যা করিতে পারিবে না। মিশরে গোমহিষের সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়ই ঐরূপ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের অসুবিধা ও দুগ্ধাদির দুষ্প্রাপ্যতা, গোমহিষের সংখ্যাহ্রাসের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, সকলে ইহা বুঝিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে।

হরিসভা।

গত ১৩ ফাল্গুন ও ১৪ ফাল্গুন মলডাঙ্গায় ভাগবত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবরায় মহাশয়দিগের ভবনে শ্রীশ্রীরাধাকান্তদেব-বিগ্রহের দোলোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে মহতী হরিসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহুভক্ত-সমাগম হইয়াছিল। পূজা, হোম, ভোগ-রাগ প্রসাদ-বিতরণ, নামকীর্ত্তন পদকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীভগবৎকথা, ধর্ম্মবক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠান পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ মহাশয় ও মলডাঙ্গার রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত গিরিধারী গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তালখড়ীর প্রসিদ্ধ পুরাণকথক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি মহাশয় শ্রীভগবৎ-কথা বলেন। গিলাপোলের নিত্যানন্দবংশ্য শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যরূপ গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় সাধারণের যত্নে, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবরায় মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টায় অনুষ্ঠানটী সফল হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি, এই হরিসভা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কলিকলুষ-নাশের সহায়তা করিতে থাকুন।

বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলন।

আগামী ৩০ চৈত্র, ও ১লা বৈশাখ (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সম্মিলনের সাফল্য কামনা করি।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ন্যায়দর্শন। (গৌতমসূত্র) বাৎস্যায়নভাষ্য। বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত। প্রথমখণ্ড। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের সদস্যের পক্ষে ১৷০, শাখাসভার

সদস্যের পক্ষে ২৲, সাধারণের পক্ষে ২৷৷০ মাত্র। আকার রয়েল ৮ পেজী ৪২৪ পৃষ্ঠা। এই পুস্তকে প্রথমে বাৎস্যায়ন-কৃত (সংস্কৃত) ভাষ্য, পরে বঙ্গভাষায় তাহার বিশদ অনুবাদ, বিবৃতি ও সুবিস্তৃত টিপ্পনী আছে। বাৎস্যায়নভাষ্য নিতান্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য সন্দর্ভ। প্রথিতনামা নৈয়ায়িকগণও বাৎস্যায়নভাষ্যের দিকে সশঙ্কচিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হন। এহেন দুরূহ গ্রন্থ বুঝাইতে হইলে বহুভাষণের প্রয়োজন হয়। ন্যায়শাস্ত্রের এই দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে এপর্য্যন্ত কেহই সাহসী হন নাই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তীব্রতাপসের ন্যায় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা-সহকারে এই দুঃসাধ্য প্রবৃত্ত হইয়া যে সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই প্রথমখণ্ডেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবৃতি এবং টিপ্পনীতে তিনি দার্শনিক তথ্য সমূহের আলোচনায় এবং প্রাচীন নব্য সর্ব্বশ্রেণীর নৈয়ায়িক মণ্ডলীর মত ও ব্যাখ্যা-কৌশলাদির-বিচার বিশ্লেষণে যে প্রচুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে হৃদয় স্বতই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করিতে বাধ্য হয়। ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বগুলি সাধারণের বোধগম্য-ভাবে ব্যাখ্যা করা বিশেষ কষ্টকর, কিন্তু সুপণ্ডিত তর্কবাগীশ মহাশয় সে কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যদি প্রধান প্রধান ন্যায়াচার্য্যগণের চিন্তারত্নরাজীর একত্র সমাবেশ দর্শন করিয়া কেহ প্রীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে এ গ্রন্থ-পাঠ অপরিহার্য্য। এই প্রথমখণ্ডে ন্যায়-দর্শনের মাত্র প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। এইভাবে সমগ্র ন্যায়দর্শন-ভাষ্য বিবৃত হইলে বৃহদায়তন গ্রন্থ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবেচনা করিলে বলাযায়, দুরূহ গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিবৃতি বিস্তৃত না হইলে গ্রন্থরচনার মুখ্য লক্ষ্যই ব্যর্থ হয়। এই পুস্তকে কঠিন বিষয়কে 'জলবৎ তরল' করা হইয়াছে, ইহাই প্রধান প্রশংসা। পণ্ডিত তর্কবাগীশ মহাশয় ভূমিকায় ভাষ্য-কার বাৎস্যায়নের পরিচয় ও কাল-নির্ণয়াদির এবং গ্রন্থ-প্রয়োজনের আলোচনা করিয়াছেন। বাৎস্যায়নভাষ্যের বঙ্গানুবাদ (এরূপ সরল ও সম্পূর্ণভাবে) প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গভাষার যে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। দর্শনানুরাগী সুধীজন এই গ্রন্থের দ্বারা প্রচুর উপকার লাভ করিবেন। দেশে এই পুস্তকের আদর না হইলে দেশের দুর্ভাগ্য মনে করিব। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ এই গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষাভাষী জনগণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ।

(গোপালতাপনী উপনিষৎ)

হিন্দু-পত্রিকা-সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্ এ বি এল্ বেদান্তবাচস্পতি বাহাদুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। গোপালতাপনী উপনিষৎ ভক্তিমার্গের অমূল্য সম্পদ্। সাধারণতঃ সদুপদেশ ও সাধনার অভাবে জ্ঞানমার্গী ও ভক্তিমার্গের সেবকগণ পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে বিরোধ নাই। গোপালতাপনী উপনিষদের ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বিরোধ-ভঞ্জন—সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। এ গ্রন্থে গ্রন্থকার উপনিষৎশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য লইয়া যে এক বিপুল জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে সকলেই মুগ্ধ হইবেন। গোপালতাপনী উপনিষদের সংস্কৃত-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও সুবিস্তৃত সমালোচনায় গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়া গ্রন্থকার হিন্দু সমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থ সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য, মূল্য আট আনা মাত্র। হিন্দুপত্রিকা-কার্য্যালয়ে [যশোহরে] এই গ্রন্থ পাওয়া যায়।

সমালোচনায় সুপণ্ডিত "সাহিত্য-সংবাদ" বলেন "মজুমদার মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কিবা রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কিবা সমাজনীতি-ক্ষেত্রে, কিবা ধর্ম্মনীতি-ক্ষেত্রে, আর কিবা সাহিত্য-ক্ষেত্রে—সকল দিকেই তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাই। সাহিত্যের আলোচনা সম্পর্কে যদুনাথ এখন সকলেরই মুকুটস্থানীয়। তিনি সাময়িক দিয়া আমাদের সাহিত্যের যে উপকার করিতেছেন, তাহা কখনই উপেক্ষণীয় নহে। অন্য দশের অন্য সকল কীর্তি লোপ পাইতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি যে কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতেছেন, তাহা চিরস্থায়ী হইবে।" অথর্ববেদের অন্তর্গত গোপালতাপনী উপনিষৎ গদ্য ও ছন্দে সংবাদাত্মক বাক্যে সম্পূর্ণ। সেই মূল বাক্যাংশ অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মূলের বঙ্গানুবাদ এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে মূলের সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গার্থ উভয়ই প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় সাধারণভাবে উপনিষদের এবং একটু বিশেষভাবে গোপালতাপনী উপনিষদের পরিচয় আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের অনুযায়ী হইলেও রায় বাহাদুরের পাণ্ডিত্য ও গবেষণা প্রশংসনীয়।